বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

সম্পর্ক

উৎসর্গ

একাত্তরের শহীদ

- **এ্যাডভোকেট আবদুল জব্বার**
  কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি
  ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)
- **সায়ীদুল হাসান**
  প্রকাশক, সাপ্তাহিক গণশক্তি ও কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ
  ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)
- **শহীদুল্লাহ কায়সার**
  প্রখ্যাত লেখক ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক
- **নিজামুদ্দিন আজাদ**
  সি,পি,বি, ন্যাপ (মোজাফফর) ও ছাত্র ইউনিয়নের
  সমন্বিত গেরিলা বাহিনীর ঢাকা গ্রুপের নেতা
- **অধ্যাপক খালেদ রশীদ**
  সম্পাদক, খুলনা জেলা কমিটি
  পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল)
- **প্রানগোপাল ভট্টাচার্য**
  বাঁশখালী, চট্টগ্রামের গেরিলা ইউনিটের কমান্ডার
  পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল)
- **আবদুর রাজ্জাক**
  সম্পাদক, কুষ্টিয়া জেলা কমিটি
  পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল)
- **আলম (পার্টি নাম শাহীন)**
  গৌরনদী, বরিশাল-এর প্রতিরোধ সংগঠক
  পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি
- **কামেল বখ্‌ত**
  সাতক্ষীরা- সুন্দরবন অঞ্চলের মুখ্য সংগঠক
  কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি
- **স্বপন কুমার বণিক**
  কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক
  বাংলাদেশ ছাত্রলীগ

সূচি

শব্দ - সংক্ষেপ

ইউ. ও. টি. সি.	ইউনির্ভাসিটি অফিসার্স ট্রেনিং ক্যরপস্
ই পি. ইউ. জে	ইস্ট পাকিস্তান ইউনিয়ন অভ্ জার্নালিস্টস
ই পি. আর	ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস
ই. পি. আর. টি. সি	ইস্ট পাকিস্তান রোড ট্র্যান্সপোর্ট কর্পোরেশন
ইপিসিপি (এম. এল)	ইস্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)
ইউপিপি	ইউনাইটেড পিপলস পার্টি
এ. এফ. পি	এজেন্স ফ্রান্স প্রেফি
এ. পি. পি.	এ্যাসেসিয়েটেড প্রেস অভ্ পাকিস্তান
এন. এস. এফ	ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন
এফ. এফ	ফ্রিডম ফাইটার্স
এম. এন. এ	মেম্বার অভ্ দ্যা ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি
এম. এফ	মুক্তি ফৌজ
এস. ডি. ও	সাব-ডিভিশনাল অফিসার
ও. সি	অফিসার ইনচার্জ
ওয়াপদা	ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি
জি. ও. সি	জেনারেল অফিসার কমান্ডিং
টি. এন্ড. টি	টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন (বোর্ড)
টি. এল	ট্যাকটিক্যাল লাইন
টি. এস. সি	টিচার্স-স্টুডেন্টস্ সেন্টার
ডাক	ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি
ডাকসু	ঢাকা ইউনির্ভাসিটি সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন
ডিআইজি	ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল

ডিসি	ডেপুটি কমিশনার
ন্যাপ	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
ন্যাপ (ভাসানী)	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন পিকিংপন্থী অংশ
ন্যাপ (মোজাফফর)	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন মস্কোপন্থী অংশ
পি. আই. ডি. সি	পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
পি. এফ. ইউ. জে	পাকিস্তান ফেডারেল ইউনিয়ন অভ্ জার্নালিস্টস্
পি. ডি. এম	পিপলস ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট
বি. ডি	বেসিক ডেমোক্র্যাট
বি. এন. আর	ব্যুরো অভ্ ন্যাশনাল রিকনষ্ট্রাকশন
বি. এল. এফ	বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সেস
সি. আই. এ	সেন্ট্রাল ইন্‌টেলিজেন্স এজেন্সি
সিপিআই	কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ ইন্ডিয়া
সিপিআই(এম)	কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)
সিপিবি	কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ বাংলাদেশ
সিয়াটো	সাউথ ইস্ট এশিয়ান ট্রিটি অর্গানাইজেশন
সেন্টো	সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন

ভূমিকা

এক

বাঙালি জাতির এযাবৎকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো বেদনা ও গৌরবের সময়কাল হচ্ছে ১৯৭১ – আমাদের স্বাধীনতার জন্য যে পরিমাণ অশ্রু ও রক্তের ক্ষরণ হয়েছে তা যেমন নিরবধিকাল আমাদের চক্ষুকে বাষ্পাকুল করবে, তেমনি মাঠ-ঘাটের কিষাণ–কুলি তথা খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের অমিত তেজ ও অজেয় প্রতিরোধের যেসব কাহিনী বাংলার পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে তা নিরন্তর আমাদের শোনাবে গণশক্তির বিক্রমের বিবরণ।[১] শ্রেণীবিভক্ত জনসমাজের প্রতিটি অংশকে যেভাবে নাড়া দিয়েছিল একাত্তর, যেভাবে উথাল-পাথাল করেছিল আশা-নিরাশার দোলাচলে- তেমনটি বাংলার ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ তাই বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য মাইলফলক।[২]

স্বাধীনতার তিন দশক অতিক্রান্ত হতে চললো, অথচ একাত্তর সম্পার্কিত বিবিধ প্রশ্নের এখনো নিষ্পত্তি হলোনা। বাংলাদেশের বুর্জোয়া দলগুলোর প্রধান দুই শরীক এখনো স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর একক স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মত্ত। অন্যদিকে তারাই আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অর্থাৎ স্বাধীনতা ও শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের সাথে আঁতাত ক'রে, যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় থাকার বা স্থায়ীভাবে টিকে যাবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

১। এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণের জন্য দেখুন মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া, জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা. জুন ২০০০ (তৃতীয় মুদ্রণ). পৃষ্ঠা ১৭-৫৫, ৬১-৮৮।
স্বাধীনতা যুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপকতা ও তাদের আকাঙ্খা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন আতিউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৬০-৮০।

২। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র. খন্ড ১–১৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার. ঢাকা ১৯৮২। মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড. ঢাকা ১৯৯৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ. তৃতীয় মুদ্রণ)।
Talukdar Maniruzzaman, The Bangladesh Revolution and Its Aftermath, University Press Limited, Dhaka 1988 (Second Edition).
মেসবাহ কামাল. শ্রেণীদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, কপোতাক্ষী. ঢাকা ১৯৮৪।
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা, ডানা প্রকাশনী. ঢাকা ১৯৮২।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরোভাগে ছিল আওয়ামী লীগ এবং সে যুদ্ধে অনুপস্থিত থেকেও একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনেব প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।[৩] এ কথাগুলো যেমন ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি এ কথাটিও সত্য যে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি বিশেষতঃ কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্বাধীনতা ও মুক্তির লড়াইকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মণি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, সিরাজ সিকদার, কর্ণেল আবু তাহেবসহ অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দ পালন করেছিলেন বিশিষ্ট ভূমিকা – যা আজ অস্বীকার করার অপচেষ্টা চলছে জোরেসোরে। রাজনীতি ও উন্নয়ন বিষয়ক পত্রিকা 'সমাজ চেতনা'র 'মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী'র বিশেষ সংখ্যায়[৪] আমবা চেষ্টা কবেছিলাম একাত্তরের বামপন্থী শক্তির ভূমিকাকে তুলে ধরতে। পববর্তীতেও এ সংক্রান্ত আরো লেখা ও সাক্ষাৎকার 'সমাজ চেতনা'য় প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি সেসব লেখারই নির্বাচিত অংশসহ আরো কিছু উপাদানের সমাহাব। দেশের ভেতরে থেকে দীর্ঘ ৯ মাস প্রতিরোধ অব্যাহত রাখার কাজ জনগণের সাথে থেকে করেছিলেন বামপন্থীরাই, কাজেই তাদের সেই তৎপরতা ছিল সুবিস্তৃত ও ব্যাপক। তার সব কথা আমরা জানিনা। যেসব প্রতিরোধ সুবিখ্যাত তার সবগুলোও আমরা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করতে পারলামনা এ দফায়। ভবিষ্যতে কাজটা আমরা ধারাবাহিকভাবে করার প্রত্যাশা রাখি। তবে এই খন্ডে বিশিষ্ট রাজনীতিক ও গবেষকবৃন্দের যে রচনা-সম্ভার আমরা উপস্থিত করেছি, তা আপনাদের সমাদর পাবে বলে আশা করছি। গোটা আলোচনাটাকে একটা প্রেক্ষাপট দেবার প্রয়োজনে সাতচল্লিশে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে স্বাধীনতার নামে 'পূর্ব বাংলার পাকিস্তান প্রাপ্তি'র সময়ে স্বাধীনতার কাছে জনগণের আকাঙ্ক্ষা কি ছিল, সে বিষয়ে ড. আহমেদ কামালের একটি গবেষণা দিয়ে আমরা লেখা শুরু করেছি ; একাত্তরে বা তার অব্যবহিত পূর্বে বামপন্থীদের ভূমিকা তুলে ধরে এমন কয়েকটি ঐতিহাসিক দলিল আমরা ছেপেছি ; আর একাত্তর-উত্তর পঁচিশ বছরে আমাদের চাওয়া-পাওয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই খণ্ড শেষ হয়েছে।

আজকের বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলনের মূল যে শক্তি তা সমাবেশিত হয়েছে দু'টি ধারা থেকে – উনিশ'শ বিশের দশক থেকে শুরু হওয়া কমিউনিস্ট রাজনীতির ধারাবাহিকতায় বিকশিত একটি ধারা এবং ডানপন্থী আওয়ামী লীগের মধ্যে ষাট দশক থেকে বেড়ে ওঠা র‍্যাডিক্যাল অংশের বাম রাজনীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিকশিত আরেকটি ধারা। ইতিহাস ও ঐতিহ্যে পৃথক এবং সাংগঠনিক রীতিতে ভিন্নতা সম্পন্ন দু'টি ধারার পরস্পরকে স্বীকৃতি দিতে ও accomodate করতে সময়

৩। আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'বাঙালী জাতীয়তাবাদেব রাজনৈতিক ভিত্তি', ডঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশেব ইতিহাস (১৭০৪–১৯৭১), ১ম খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৫৫৮।
আহমেদ ᐧᐧফা, 'শেখ মুজিবুর রহমান ঃ রাজনীতিবিদ ও ব্যক্তি', সম্ভাবনা, ঢাক, ১৩' ᐧ, পৃষ্ঠা ৪-৫।
Md Abdul Wadud Bhuiyan, Emergence of Bangladesh and Role of Awami league, Vikas Publishing House, New Delhi, 1982, PP 198–199

৪ মেসবাহ কামাল (সম্পাদিত), সমাজ চেতনা, সংখ্যা ৩৯ মার্চ-এপ্রিল ১৯৯৬।

লেগেছে ঐতিহাসিক নিয়মেই। একান্তরে এদের ভূমিকা ছিল ভিন্ন মেরুতে। তবুও নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাঁরা কিভাবে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিকে দেখেছেন এবং রণনীতি- রণকৌশল ও শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করেছেন– তা আমরা তাদের উভয় তরফের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছি। আশা করি বিভিন্ন দল-সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দসহ মুক্তিযুদ্ধের গবেষক ও আগ্রহী পাঠকরা এ থেকে উপকৃত হবেন।

দুই

স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের একাংশের মধ্যে এক ধরনের স্ববিরোধিতা আছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চাব কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দাবির প্রশ্নে দিলেন অগ্রণী। কিন্তু ১৯৪২-এ তারাই আবার জার্মান ফ্যাসিবাদকে বিরোধিতা করতে যেয়ে 'জনযুদ্ধের তত্ত্বায়ন করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে ছিটকে পড়েন।[৫] সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশ্বযুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করে ১৯৩৯ সালে তারা ডাক দিয়েছিলেন 'না এক ভাই না এক পাই'।[৬] তারাই আবার মিত্রপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদানকে উপলক্ষ্য ক'রে যখন বৃটিশ শাসকবর্গের সাথে সহায়তার পথ ধরলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই জনতার কাছে প্রতিভাত হল "রোটিকে লিয়ে কমিউনিস্ট, আওর আজাদী কী লিয়ে কংগ্রেস",–কেননা কংগ্রেস তখন পরিচালনা করছে 'ভারত

৫। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত নীতি নিয়ে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে বেশ কয়েকটি নথি রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল- 'Secret Letter from R. Tottenham, Assistant Secretary to the Government of India to All Provincial Governments ; ২১ এপ্রিল, ১৯৪২ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, (L/PJ/ 8/ 681); Secret Letter from E. Conron Smith.
Secretary to the Government of India to All Provincial Governments and Chief Commissioners', ৮ জুন ১৯৪২ (L /PJ/8 681) ; 'Telegram from the Secretary of State for India to the Government of India', ৭ জুলাই, ১৯৪২, (L/PJ/ 8/ 681); and 'Telegram from the Home Department Government of India to the Secretary of State for India', ১৮ জুলাই, ১৯৪২ (L /I/1/1116) and on 11 & 25 August (L /PJ/8/ 681) ;
'জনযুদ্ধে'র সময়কালে উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র ও সিপিআই-এর মধ্যকার সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে চমৎকার আলোচনার জন্য দেখুন S...joy Bhattacharya, 'The Colonial State and the Communist Party of India, 1942-45 : A Reapраisal', South Asia Research, Volume 15, Number 1, Spring 1995, PP 48-77.

৬। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট, যার কপি সম্পাদকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে।

ছাড়' আন্দোলন।[৭] পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনকালে আমরা দেখেছি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। যে কমিউনিস্ট বামপন্থী কর্মীরা নেতৃত্ব দিলেন স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, তাদের একটা বড়' অংশই আবার ষাট দশকে চীনের সাথে পাকিস্তানের সুসম্পর্কের জের ধরে গ্রহণ করলেন Do not hit Ayub regime. ধরণের পলিসি।[৮] পরবর্তীতে যদিওবা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা বেরিয়ে এলেন এ অবস্থান থেকে এবং গড়ে তুললেন '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের অগ্নিস্রোত[৯] কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে এবং '৪২-এর কংগ্রেসের মত সে সময়ে জন মানসে নেতৃত্বে সমাসীন হয়েছে আওয়ামী লীগ। '৭০-এর নির্বাচনী অনুমোদন আওয়ামী লীগের সে নেতৃত্বকে কেবলমাত্র সংহত করেছে। উল্টোদিকে, শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগের মত অধিকাংশ কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতাই তখনো ভাবছেন অখণ্ড পাকিস্তানের কথা। তারা তখনো ভাবছেন 'পাকিস্তানেব দুই অংশেব' শ্রমজীবী মানুষের একযোগে মুক্তির কথা। "জাতীয় সমস্যার উৎসমূল হচ্ছে উৎপাদনের উপায় গুলোর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শোষণমূলক ধ্যবস্থা"[১০] – মাও সেতুং -এর এই উদ্ধৃতির আলোকে, "জাতীয় সংগ্রাম হচ্ছে, শেষ বিশ্লেষণে, শ্রেণী-সংগ্রামেরই সমস্যা"[১১] এ ধরণের তত্ত্বায়নকে যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করে, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সিনিয়র অংশটি ১৯৬০ দশকের শেষভাগ এমনকি সত্তরের গোড়াতেও পর্যন্ত ভেবেছেন 'পাকিস্তানের দুই অংশে' একযোগে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনার কথা। বারশো মাইলের ব্যবধান, ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুস্তর পার্থক্য এবং পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণকে তারা জাতীয়তা পর্যালোচনায় হিসেবের মধ্যে নেননি। মাও সেতুঙ-এর মূল্যায়নকে নিজ পরিস্থিতির বাস্তবতার আলোকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন তারা অনুভব করেননি। ফলে, পাকিস্তানের অবিভাজ্যতার ভাবনা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। 'সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে জাতিসমূহের ঐক্য সাধন এবং সমস্ত জনগণকে এক পরিবারে মিলিত করা, কিন্তু এটা ততক্ষণ বাস্তবায়িত হবে না যতক্ষণ না জাতিসমূহের প্রত্যেকে তাদের নিজ পদ বেছে নেয়ার সুযোগ পায়' লেনিনীয় এ শিক্ষাকে তারা ভুলে গেলেন।[১২] এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল

৭। R. C. Majumdar, History of the Freedom Movement in India, Vol. 3. Calcutta 1963, PP 688-90,

৮। মেসবাহ কামাল, আসাদ ও উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, বিবর্তন, ঢাকা ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৯৯।

৯। ঐ। আরো দেখুন লেনিন আজাদ, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৫৪৭-৬৫৯।

১০। মাও সেতুঙ, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে মার্কিন নিগ্রোদের সংগ্রামকে সমর্থন জানাতে বিশ্ব জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি, বিদেশী ভাষার প্রকাশনালয়, পিকিং ১৯৬৪, পৃষ্ঠা-৫।

১১। ঐ।

১২। V. I. Lenin, 'The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self Determination', Selected Works, Progress Publishers, Moscow 1971. P. 160 আরো দেখুন V.G. Kiernan. 'Nationalism' published in Tom Bottomore (Ed) A Dictionary of Marxist Thought. (Second Edition) Blackwell. Oxford. 1991, P- 396

আবদুল মতিন- আলাউদ্দীন- আবুল বাসার - দেবেন শিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন (পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি) এবং কাজী জাফর আহমেদ-হায়দার আকবর খান রনো ও রাশেদ খান মেনন-এর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি।[১৩] তারা ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকেই স্বাধীন ও জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার শ্লোগান তুলে স্বাধীনতা আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রামকে সমন্বিত ভাবে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিলেন। মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন মস্কোপন্থী পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি তখন শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যকে অনুসরণ করে বাঙালী উঠতি ধনিক ও মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্বকারী আওয়ামী লীগকে অনুসরণ করছে এবং দুই অংশের পাকিস্তানের ফ্রেম-ওয়ার্কের মধ্যেই শ্রমজীবী বাঙ্গালীর মুক্তি খুঁজছে। তবে অনিচ্ছুক পায়ে হলেও আওয়ামী লীগ যেভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে ক্রমশঃ এগিয়েছে, সেভাগে সেইসাথে এগিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। অন্যদিকে সুখেন্দু দস্তিদার-মোহাম্মদ তোয়াহা-আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পিকিংপন্থী পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি(এম.এল) সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে যেয়ে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের প্রশ্নে বাঙালীর সংগ্রাম যেভাবে ক্রমশঃ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে পরিণত হচ্ছিল তাকে অবমূল্যায়ন করে। এভাবে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সিনিয়র নেতৃত্বের সমন্বয়ে গড়া পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মস্কো ও পিকিংপন্থী উভয় ধারাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের তুলনায় ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ে।[১৪] জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রশ্নে বরং মওলানা ভাসানীর ভূমিকা ছিল ভিন্নতর। দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষের সাথে, বিশেষতঃ কৃষক সমাজের সাথে, তার যে নাড়ীর যোগসূত্র ছিল তা দিয়ে মওলানা ভাসানী ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন সমাগত জন জাগরণের কথা। তিনি সচেষ্ট হয়ে উঠেন সেই জন জাগরণের পথকে প্রশস্ত করতে–উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া, আইয়ুব- পরবর্তী সময়ে দেশের ব্যাপক কৃষককে সমাগত স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তৈরী করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি পালন করেন এক অনন্যসাধারণ ও প্রায়-একক ভূমিকা। সত্তরের গোর্কীর পরে বিধ্বস্ত উপকূল অঞ্চল থেকে ফিরে এসে তার কণ্ঠে আমরা তাই শুনি স্বাধীকার অর্জনের বাণী। সেই ধারাতেই তিনি ১৯৭১ সালের পহেলা জানুয়ারী টাঙ্গাইলে আয়োজন করেন 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলন'।[১৫] চল্লিশের দশকে মওলানা ভাসানী ছিলেন 'পাকিস্তান' আন্দোলনের একজন বড় যোদ্ধা, দেশ বিভাজনকালে তার সংগ্রামের পথ ধরেই সিলেট

১৩। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির দলিল ' স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রের কর্মসূচী', পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের (পরবর্তীতে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি) থিসিস 'পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব' এবং হায়দার আকবর খান রনোর লেখা 'স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বামপন্থীদের ভূমিকা' দেখুন, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৪৮ এবং ১৭৭-২০১।

১৪। আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, পূর্বে উল্লেখিত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ৫৫৮।

১৫। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দলিল 'ভাসানীর এক দফা, স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দেখুন, পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৮।

অন্তর্ভুক্ত হয় 'পাকিস্তানে'। বাংলা-বিভাগোত্তরকালে তার সাধের 'পাকিস্তানে' শাসক মুসলিম লীগের কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি গঠন করেছিলেন জনতার (আওয়ামী) মুসলিম লীগ। 'পাকিস্তানের' মোহভঙ্গ হতে তাই তার সময় লেগেছে – পঞ্চাশের দশকে দৃপ্তকণ্ঠে 'আসসালামু আলাইকুম'[১৬] জানানোর হুঙ্কার দিলেও অন্তরে বোধহয় তখনো তা চাননি। তাই ১৯৭০-এর জলোচ্ছ্বাসের পরেও তার কণ্ঠে শুনি 'পূর্ব-পাকিস্তানে'র কথা, সত্তরে স্বাধীনতা চেয়েছেন 'পূর্ব-পাকিস্তানে'র, তারপরে অবশ্য দ্রুত এগিয়েছেন স্বাধীন 'পূর্ব বাংলা' হয়ে সার্বভৌম 'বাংলাদেশে'। খেয়াল রাখা দরকার তখনো শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী নেতৃত্ব অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের স্বপ্নে বিভোর। তবে ভাসানী যতদিনে 'বাংলাদেশে' পৌঁছেছেন তাঁর বহু আগেই জন-চেতনায় শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে গেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে সমাসীন হয়েছেন। তবে একাত্তরের পঁচিশে মার্চে পূর্ব বাংলার নিরীহ জনগণের উপর পাকিস্তানী বাহিনীর সর্বাত্মক আক্রমণ ও নির্বিচার গণহত্যা কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতৃত্ব ও কর্মীদের তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধে সামিল করেছে। যারা ১৯৬৭-৬৮ থেকে স্বাধীন ও জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার জন্য লড়াই শুরু করেছিলেন তারাতো প্রস্তুতই ছিলেন, অপরাপর কমিউনিস্ট ও বামপন্থী ধারাগুলোও হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে তৎক্ষণাৎ সামিল হয়েছেন।[১৭] পরবর্তীতে আওয়ামী নেতৃত্বের মতো মওলানা ভাসানী, মণি সিংহসহ বামপন্থীদের একাংশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে গেছেন সাহায্য ও সহায়তার আশায়, কিন্তু তাদের বড় অংশটিই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ার কাজে সক্রিয় থেকেছেন।[১৮] তার প্রমাণ এই গ্রন্থে সংকলিত রচনাসমূহ।

তিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং নিম্নবর্ণের ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী ডঃ আহমেদ কামালের প্রথম নিবন্ধটির সূচনা হয়েছে বৃটিশ রাজত্বের অবসানে জনগণের আনন্দোল্লাসের বিবরণ দিয়ে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের বেড়াজাল হতে মুক্তি এবং পাকিস্তানের সৃষ্টিকে পূর্ব বাংলার জনগণ 'প্রতিশ্রুতি'র, 'আশা'র এবং 'ইতিহাসের এক নতুন প্রভাত' হিসেবে গ্রহণ করেছিল। যদিও 'ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসনিক অপারেশন' নামের এই দেশবিভাজনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল সুস্পষ্ট রূপরেখাবিহীন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের। সাধারণ মানুষের দুর্দশা ও ধর্মীয় অনুভূতিকে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করে 'মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বাসভূমি' সম্পর্কে এক স্বপ্ন তৈরি করেছিল। কিন্তু দেশভাগ পূর্ববাংলার জনসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'অমুসলিম'দের হতাশ ও অসহায় করে। অন্যদিকে জমিদারী শোষণে নিপীড়িত দরিদ্র মুসলমান কৃষকেরা একে গ্রহণ করে শ্রেণী ও ধর্মীয় পীড়ন থেকে মুক্তি হিসেবে, যা ছিল অভিজাত সমাজের চিন্তা চেতনা থেকে ভিন্নতর। '৪৭ পরবর্তী বাস্তবতাব রূঢ় কষাঘাত জনসাধারণের সে প্রত্যাশাকে

১৬। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দলিল 'জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর ডাক' দেখুন পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৫।

১৭। বামপন্থী নেতৃবৃন্দের গ্রন্থভুক্ত স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধগুলো। এ সংক্রান্ত প্রচুর তথ্যাবলী রয়েছে। আরও দেখুন মুসা আনসারী, 'বামপন্থী রাজনীতি', ডঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫৩২-৫৩৮।

১৮। ঐ

গুড়িয়ে দেয়। পূর্ববাংলার কমিউনিস্টদের কাছে 'এই স্বাধীনতা মিথ্যা' বলে পরিগণিত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ডঃ আহমেদ কামাল লিখিত 'পূর্ববাংলার পাকিস্তান প্রাপ্তিঃ 'স্বাধীনতা'র প্রাথমিক উপলব্ধি ও জনগণের প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক নিবন্ধটিতে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার সাথে তার সঙ্গতিহীনতার প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।

"ভাষা-মতিন"-নামে খ্যাত, ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক জনাব আবদুল মতিন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নাম। দেশের প্রথম সারির বামপন্থীনেতা ও কৃষক সংগঠক জনাব মতিন ভাষা আন্দোলন নিয়ে তার স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধটি সূচনা করেছেন ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে ভারতবর্ষে পুঁজির অনগ্রসরতা ও জাতিসত্ত্বাব বিকাশ রুদ্ধ হবার প্রসঙ্গ দিয়ে। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলায় শুরু হয় বাঙালী জাতির ভাষাকে মুছে দেয়ার চেষ্টা। তিনি দেখিয়েছেন, পাকিস্তান অর্জনে নেতৃত্বকারী দল কিভাবে বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করেছিলো এবং তারই প্রেক্ষিতে ভাষা রক্ষার তাগিদে বাঙালী সচেতন ছাত্রসমাজ, জনগণকে সম্পৃক্ত করে আন্দোলনের সূচনা করে, যা পূর্ণতা লাভ করেছিলো ১৯৫২ সালে। জনগণের এই সচেতনতার আরো বহিঃপ্রকাশ ঘটে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে। সুতরাং জনাব মতিনের স্মৃতিচারণ বাঙালীর স্বাধীনতার ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

জনাব আবুল বাসার প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এদেশের গণ-আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে তিনি '৬-দফা বনাম পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেন। তার এ লেখা থেকে তৎকালীন পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ ও জাতিগত নিপীড়নের বিপরীতে ৬-দফাভিত্তিক স্বাধীকারের বিমূর্ত চিত্র নয়, বরং স্বাধীনতা অর্জনের তাগিদে সংগঠিত হবার প্রত্যয় ধ্বনিত হয়। তিনি লিখেছেন '১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ৬-দফা কর্মসূচী উপস্থাপনের পর রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়। ৬-দফার আয়নায় পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ স্বাধীকারের একটা বিমূর্ত ছবি দেখতে পায়। কার্যতঃ ৬-দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৬-দফা হুবহু কার্যকরী করলেও পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের শোষণের কোনও হেরফের ঘটেনা। পাক উপনিবেশবাদের শোষণ থেকে মুক্ত হবার একমাত্র পথ স্বাধীনতা অর্জন। এজন্যই '৬-দফা বনাম পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। লেখাটি সেই সময় মুক্তি আকাঙ্ক্ষী জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের মধ্যেও ৬-দফার বিপরীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষে মেরুকরণ জোরদার হয়। লেখকের ভাষায় "দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে পাক উপনিবেশবাদের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের রাজনৈতিক আপোষের লাইনও ব্যর্থ হয়ে যায়'। জনাব আবুল বাসার তাঁর লেখায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী, শোষণ ইত্যাদিকে তথ্যসমৃদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে '৬-দফা হুবহু কার্যকরী করলেও পূর্ব বাংলার উপরে পাকিস্তান উপনিবেশবাদের শোষণের কোন হেরফের ঘটে না। পাক উপনিবেশবাদের শোষণ হতে মুক্ত হবার একমাত্র পথই

হলো স্বাধীনতা অর্জন' এবং এই স্বাধীনতা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নয় বরং সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই অর্জন করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মেসবাহ কামাল রচিত 'উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও মওলানা ভাসানী' নিবন্ধটি গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট, গতি- প্রবাহ, ও ফলাফল এবং ভাসানীর রাজনৈতিক অবস্থানকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। ছাত্র, পেশাজীবী, শ্রমিক ও কৃষকের অংশগ্রহণে গণআন্দোলন রূপ নিয়েছিলো 'জালেম ও মজলুমের' সংঘাতে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে অস্বীকার ,পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে অস্বীকৃতি, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে ক্ষমতাচ্যুতকরণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতি পাকিস্তানী শোষণের চিত্রকেই প্রকাশ করে। অন্যদিকে, শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা পরিচালিত করে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ জনগণকে গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করতে। এক্ষেত্রে প্রথম থেকেই সক্রিয় ভূমিকা রাখেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁর জুলুম প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচী, গভর্ণর হাউস ঘেরাও এবং পরবর্তী কয়েকটি উপর্যুপরি হরতালের ফলে আন্দোলন শহর -গঞ্জসহ বিভিন্ন কলকারখানা এবং অফিস আদালতে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ শ্রেণীরাজনীতির উপাদানকে প্রভাবিত করে। মওলানা ভাসানীর ন্যাপ, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে ছাত্র জনতার অবস্থান প্রশাসনকে অচল করে দেয়। যদিও শীঘ্রই সামরিক বাহিনী ঘটনাবলীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলো, তথাপি এই গণঅভ্যুত্থান শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার চেতনা ছড়িয়ে দিয়েছিলো সারাদেশে। উনসত্তরে গণঅভ্যুত্থানের সূত্রপাত ঘটানোর কৃতিত্ব মওলানার ভাসানীরই প্রাপ্য।

ড. আহমেদ কামাল তাঁর দ্বিতীয় নিবন্ধে কৃষক আন্দোলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৭০-৭১) সম্পর্কে 'সাপ্তাহিক গণশক্তি'র দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'তৎকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশের (মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও-সেতুঙ চিন্তাধারা) প্রভাবে জন্ম হয়েছিলো গণশক্তির। তাই পূর্ব বাংলার কৃষক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যকার সর্ম্পককে গণশক্তি শ্রেণী সংগ্রামের আলোকে গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ সময়ের জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাদের দৃষ্টি যথেষ্টভাবে আর্কষণ করেনি। সর্বোপরি, এই নিবন্ধে একটি বিপ্লবী সাপ্তাহিকীকে প্রতীকী করে পূর্ব বাংলার মার্কসীয় মতাদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চার

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বেশ কিছু আ াই যে বামপন্থীরা সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতার জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন তার প্রমাণ সে সময়ের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলে রয়েছে। এরকম ছয়টি দলিল প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হলো।

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত প্রথম দলিলটি 'স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রের কর্মসূচী' নামে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত রণনীতি ও কর্মসূচী সংক্রান্ত দলিল। রাষ্ট্রের নাম ও মূলনীতি প্রসঙ্গে দলিলটির প্রথমেই বলা হয় ঃ-

- রাষ্ট্রের নাম হবে পূর্ব বাংলা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।
- এ রাষ্ট্র হ'বে পিণ্ডি ও ওয়াশিংটনের আওতামুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ববাংলা।
- এ রাষ্ট্র হবে সকল জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত বিপ্লবী একনায়কত্বমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
- এ রাষ্ট্রে শত্রু শিবিরে অন্তর্ভুক্ত কারও প্রথম দিকে কোন ভোটাধিকার থাকবে না। এ রাষ্ট্রের একনায়কত্ব খাটবে তিন শত্রুর উপর, অন্যদিকে জনগণের থাকবে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার।

এছাড়াও বৈদেশিক সম্পর্ক, কৃষক ও কৃষিক্ষেত্র, আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসা, শিল্প-মালিকানা ও শ্রমিকের ক্ষেত্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার এবং সামাজিক অনাচার দূরীকরণ, দেশরক্ষা —বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬৮ সালের মধ্যে জনগণের অন্ততঃ একাংশের মনে শুধু স্বাধীনতার চেতনাই পল্লবিত হয়ে উঠেনি, বরং তার পাশাপাশি শ্রেণী-শোষণ থেকে মুক্ত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাও বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় দলিলটি সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন' কর্তৃক ১৯৬৮ সালে গৃহীত থিসিসের অংশবিশেষ। বিপ্লবী পরিষদের এই থিসিসে ৪টি দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে –

- পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।
- পূর্ব বাংলার বিশাল কৃষক জনতার সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব
- পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব
- পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের সাথে শ্রমিক শ্রেনীর দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বসমূহের মধ্যে –'পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদে'র দ্বন্দ্বকে জাতীয় দ্বন্দ্ব' ও "প্রধান দ্বন্দ্ব" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও এই দলিলে সামাজিক-রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক শোষণ ইত্যাদি বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবং এই প্রধান দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে ঐক্য ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে মুক্তির সংগ্রামে পরিচালিত করার কথা বলা হয়েছে।

১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী প্রচারিত তৃতীয় দলিলটি 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর এগার দফা কর্মসূচি তুলে ধরেছে। এই কর্মসূচিতে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দী পুঁজির বিরোধিতা করা হয়েছে এবং জনতার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়াও, আঠারো বা তদোর্ধ্ব সকল নর-নারীর ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, বাক-ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। 'কৃষকদের হাতে জমি' এই নীতির ভিত্তিতে বৈপ্লবিক কৃষি সংস্কার, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্ক-বীমাসহ অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসাসমূহ জাতীয়করণ করার পাশাপাশি ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরি, বাসস্থান, চিকিৎসা ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলেন করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও, ছাত্র ইউনিয়নের এ কর্মসূচীতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির বিপরীতে গণসংস্কৃতিকে লালন করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা

হয়েছে। ছাত্র ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তনের ধারা প্রতিভাত হয় এই বৈপরীত্য থেকে যে, তারা যখন 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' প্রতিষ্ঠার দাবী তুলছেন তখনো কিন্তু তাদের সংগঠনেব নাম পরিবর্তিত হয়নি–তখনো তারা 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' নামেই কাজ করছেন। অবশ্য শীঘ্রই, ঐ বছরেই, স্বাধীনতা দাবীব ক্ষেত্রে অগ্রণী বামপন্থী ছাত্ররা সংগঠনের নাম পাল্টে পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন করেন এরপরও অবশ্য 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' নামে অপর দুটি অংশ সক্রিয় থাকে (একটি পিকিং ও অন্যটি মস্কো সমর্থক)।

চতুর্থ ঐতিহাসিক দলিলটি মূলতঃ ১৯৭০ সালেব ৩ নভেম্বর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক প্রদত্ত একটি ভাষণ। 'পূর্ব পাকিস্তানেব আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন'–এটি ছিল তার ভাষণের মূল দর্শন। অত্যাচার, শোষণ ও বিশ্বাসঘাতকতার বেড়াজাল থেকে মুক্তির জন্য, বহু পূর্বেই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে পাকিস্তানের প্রতি আচ্ছালামু আলাইকুম' জানিয়েছিলেন, সেকথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন, দুই যুগ ধরে বাঙালীর প্রতি বর্ণবৈষম্য, বঞ্চনা ও নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ১৯৭০ সালে দু-দফা বন্যা এবং দুটি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব বাংলায় ধ্বংসলীলা ও প্রাণহানির প্রেক্ষিতে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা তিনি বাঙালীকে দাবিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানী অপচেষ্টার প্রকাশ ব'লে অভিহিত করেন। মানবতা বর্জিত এই কর্মকান্ড পূর্ব বাংলার সাত কোটি বাঙালীর জীবন-মরণ সমস্যাকেই তুলে ধরে। ভাসানী ঐ দুর্দিনে বাঙালীর প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার আহ্বান জানিয়েছেন, 'আজাদী' রক্ষার জন্য অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন এই ব'লে যে—'আমাদের দুর্যোগ ও দুর্দিনকে সম্বল করে যারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোন চাল চালাইতে চায়, তাহাদিগকে আমরা বরদাস্ত করবো না। আমাদের প্রয়োজনে যাহারা সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিতেছেন তাহাদিগকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই, কিন্তু সেবার নামে কেহ যদি ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আমাদিগকে আটকাইতে চায়, তবে তাহাকেও তল্পী-তল্পাসহ আমরা তাড়াইতে বাধ্য হইব। বাঙালী কোনদিন শিকলের বন্ধনকে মানিয়া লয় নাই আর লইবেও না'। তাঁব ভাষণ তৎকালীন পূর্ব বাংলার দুরবস্থা চিত্রায়নের পাশাপাশি স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরুর প্রয়োজনীয়তাকেই তুলে ধরে। স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে জনগণেব মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে তার এই ভাষণ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

'ভাসানীর ১-দফা ঃ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক পঞ্চম দলিলটি ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারী প্রকাশিত একটি প্রচারপত্র। পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত এই প্রচারপত্রে সমিতির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র" গড়ার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার আহ্বান জানান। ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাবে' ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য দুটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল সেকথা উল্লেখ করে মওলানা ভাসানী বলেন যে, ১৯৪৬ সালে গণভোটের মাধ্যমে জনগণ তার পক্ষে রায় দিলেও দুটি রাষ্ট্র জন্ম নেয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টেব ২১-দফার ঐতিহাসিক নির্বাচন এবং ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে "পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদী স্বৈরাচারী শাসক, আমলাতন্ত্রের শাসন, শোষণ ও চক্রান্ত থেকে মুক্ত হয়ে "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান"

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাঙালীর আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। "আপোস আলোচনার মাধ্যমে কেবলমাত্র গদি দখল করিয়া মন্ত্রী বানাইবার জন্য নয় বরং পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি বাঙালী জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতার একক দাবীই এবারকার নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে"– এই কথা উল্লেখ ক'রে প্রচারপত্রে আরো বলা হয়, '৬-দফা ৯-দফার প্রশ্ন নহে – এই দেশের বাঙালী জনগণ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান চায় কিনা ভোটের মাধ্যমে সেই প্রশ্নেরই মীমাংসা কবিয়া দিয়াছে'। এরই পরবর্তী কর্মসূচী হিসেবে "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রাম পরিষদ" গঠনের জন্য প্রচারপত্রটিতে ৯ জানুয়ারী ১৯৭১ টাঙ্গাইলের সন্তোষে "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলন" আহ্বান করা হয়। ১০ জানুয়ারী পল্টন ময়দানের জনসভায় সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে এতে উল্লেখ করা হয় 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়াজ হিসেবে প্রচারপত্রে মওলানা ভাসানী বলেন ঃ

- স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান –জিন্দাবাদ।
- ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ রিলিফের ব্যবস্থা কব।
- দুর্গতদের অবিলম্বে পুর্নবাসনের জন্য গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা কর।
- গোটা পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা কর।
- ইংগ মার্কিন বিদেশী সৈন্য –বাংলা ছাড়।
- রাজবন্দীদের মুক্ত কর।
- গণসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়–পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন কর।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ষষ্ঠ দলিলটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড থেকে নেয়া। "মওলানা ভাসানীর ১৪-দফা" শীর্ষক ঐতিহাসিক দলিলটিতে ১৯৭১ সালের ৯ জানুয়ারী সন্তোষে অনুষ্ঠিত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচী তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে, ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ কর্মসূচীটি ঢাকার পল্টন ময়দানের সমাবেশে মওলানা ভাসানী পুনর্বার উপস্থাপন করেন। এই দলিলে ভাসানী "পূর্ব পাকিস্তান" শব্দটিব পরিবর্তে "পূর্ব বাংলা" ব্যবহার করেন। স্বাধীন পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী তোলেন। এতে বর্ণিত সর্বস্তরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন, গণসংগ্রামকে বিপথে চালিত করার ষড়যন্ত্র রোধ এবং বাংলার মাটিতে গণবিরোধী শাসকদের খেতাব বর্জন, বিদেশী সৈন্য আগমনের সুযোগ না দেয়া প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিরোধ কর্মসূচী জনগণকে স্বাধীনতার সংগ্রামে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। শেখ মুজিবুর রহমান সকল প্রকার খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করার যে ডাক দিয়েছিল তা প্রতিপালন, নিরস্ত্র জনগণকে হত্যার সাথে জড়িত—সামরিক প্রশাসনের নিকট দ্রব্য -সামগ্রী বিক্রয় বন্ধ, কালোবাজারীদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুত করতে না দেয়া, পূর্ব বাংলায় অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংকে টাকা জমা না রাখা, সীমান্তের অপর পারে দ্রব্য সামগ্রী চোরাচালান না হতে দেয়া–এই বক্তব্যসমূহ অর্থনীতিতে দেশীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ ছিল। কৃষক-শ্রমিক রাজ ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পতিত জমি বিতরণ প্রভৃতি সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা স্বরূপ ছিল বলা চলে। সেদিক থেকে শোষণমুক্ত, স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পূর্ব শর্ত হিসেবে, মওলানা ভাসানীর ১৪- দফা প্রতিনিধিত্ব করেছে।

পাঁচ

প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা মণি সিং-এর নিবন্ধে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অবদান তুলে ধরা হয়েছে, যা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৯৭০-এর নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, স্বাধীনতা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির ধ্যান-ধারণা, জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য মানসিকভাবে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা—মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেকার এই ভূমিকাগুলো তাঁর আলোচনায় উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক, প্রথম বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান, তরুণদের গেরিলা ট্রেনিং দান, স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহের ব্যাপক সমর্থন ও সহযোগিতা লাভে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন লড়াইয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সুতবাং বর্ষীয়ান নেতা মনি সিং-এর বর্ণনা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রায় অনালোচিত কিছু দিককে সামনে নিয়ে এসেছে। একাত্তরে যদিও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে প্রত্যক্ষভাবে ও একযোগে কাজ করেছে, তবুও স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধের দলীয়করণের যাঁতাকলে তাদের ভূমিকাও আড়াল পড়ে গেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর বেশ কিছু অপ্রিয় সত্য কথা ব্যক্ত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, এদেশে ক্ষমতাসীন শ্রেণী গড়ে তুলেছে সত্যকে অস্বীকার ও বিকৃত করার সংস্কৃতি। যথার্থ স্বীকৃতি দানে অনীহা, সংকীর্ণ মানসিকতা, স্বার্থ দ্বারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিচার, অন্যের অবদানকে খাটো করার প্রবণতা—এসব সত্যের মুখোমুখি, তিনি পাঠককে দাঁড় করিয়েছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। এছাড়াও, গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর এই নিবন্ধে তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু ঘটনাপ্রবাহ এবং মুক্তিযুদ্ধের অজানা তথ্য বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য জনাব হায়দার আকবর খান রনো তাঁর নিবন্ধে তুলে ধরেছেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার পরিচয় এতে পাওয়া যায়। '৪৭ পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ রাজনীতির দ্বিমুখী নীতি, কমিউনিস্ট দলগুলোর ভাঙন এবং মত ও পথের দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন দলের যুদ্ধ- প্রস্তুতি, তাঁদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন লড়াইয়ের ঘটনাবলী, জনগণের সহযোগিতা এবং ভারতে অবস্থানকালে কমিউনিস্টদের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি তাঁর দীর্ঘ নিবন্ধটিতে প্রতিফলিত হয়েছে । এছাড়াও, তিনি যেসব কমিউনিস্ট শক্তির নাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হিসেবে তাঁর নিবন্ধে তুলে ধরেছেন, তাঁর মধ্যে রয়েছে– কাজী জাফর আহমেদ, হায়দার আকবর খান রনো ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি', দেবেন সিকদার–আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন 'বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি', নাসিম আলীর নেতৃত্বাধীন 'হাতিয়ার গ্রুপ' নামে

পরিচিত মণি সিং-এর নেতৃত্বাধীন পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা একটি ছোট গ্রুপ প্রভৃতি। একাত্তরে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির অন্যতম নেতা এবং ঢাকার নিকটবর্তী নরসিংদী-শিবপুর এলাকায় প্রতিরোধের নায়ক জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া (বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক)-এর ভূমিকার কথাও, অন্যান্যের মধ্যে, তার নিবন্ধে উঠে এসেছে।

মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) পাবনা শাখার ভূমিকা সম্পর্কে একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক ড. লেনিন আজাদ। মাও-সেতুঙ-এর সামরিক প্রবন্ধের আলোকে, জনগণকে সংগঠিত করে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো এই পাবনা শাখা। কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বিদ্বেষমূলক মনোভাবের কারণে জাতীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিবর্তে কমিউনিস্টরা বহুস্থানেই বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। এধরনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সত্যিকার ইতিহাস জানা সম্ভব এবং পাঠক এতে বহুলভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়।

একসময়ের বাম রাজনৈতিক সংগঠক, গবেষক মুনীর মোরশেদ 'একাত্তরের গেরিলা যুদ্ধ ও পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি' নিবন্ধে সর্বহারা পার্টির গঠন প্রক্রিয়ার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ একাত্তরে এই পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছে তার জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। একই সাথে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক কাজের মধ্য দিয়ে এই পার্টি গঠন, একাত্তরে বামপন্থীদের মধ্যে আলোচিত সমাজে বিরাজিত দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে সঠিকভাবে প্রধান দ্বন্দ্বকে নির্ধারণ, প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য নিজের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ, সর্বোপরি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি' পালন করেছে সে সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্য ও চিত্র মুনীর মোরশেদ তুলে ধরেছেন।

প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা হেমন্ত সরকারের নিবন্ধটি মূলতঃ একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইপিসিপি(এম.এল)-এর যশোর জেলা শাখার সশস্ত্র লড়াই-এর উপর পর্যালোচনামূলক রিপোর্ট। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে 'মুক্ত অঞ্চল' সৃষ্টি এবং 'জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' ও 'জয় বাংলা'র মধ্যকার পার্থক্য বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরে, উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আঘাত করাই তাদের লক্ষ্য ছিলো। একাত্তরে বামপন্থীদের একাংশ যে জনগণের সহযোগিতায় পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং শ্রেণীশত্রু খতম একযোগে চালাতে থাকে তার বিবরণ বিধৃত হয়েছে এই নিবন্ধে। মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টির বক্তব্য জনগণের নিকট প্রচার, জনগণের বিক্ষোভকে রাজনীতি সচেতনভাবে বিপ্লবী কর্মকান্ডে রূপ দেয়া, বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গঠন, সেনাবাহিনী গঠন প্রভৃতির মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা — এই বিষয়গুলো সহ মুক্তিযুদ্ধে ইপিসিপি (এম.এল)-এর যশোর জেলা শাখার অবদান প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক জনাব খালেকুজ্জামান তাঁর 'স্বাধীনতা আন্দোলনের

প্রশ্নে' নিবন্ধটিতে স্বল্পপরিসরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনভাগে বিভক্ত, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সশস্ত্র বাহিনীগুলোর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন–বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য, বিডিআর, পুলিশ ইত্যাদি কনভেনশনাল বাহিনীর সদস্যদের সমবায়ে গঠিত বাহিনীকে বলা হতো এম.এফ (মুক্তিফৌজ); আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন, মূলতঃ ছাত্রলীগ থেকে আগত ক্যাডারদের নিয়ে গঠিত গেরিলা বাহিনীর নাম দেয়া হয়েছিল বি.এল.এফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট); আর সর্বস্তরের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি মিলে যে গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছিলো, তাঁর নাম ছিল এফ.এফ (ফ্রিডম ফাইটার)। এছাড়াও ছিল সিপিবি'র ক্যাডাব বাহিনী। এদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে জনাব খালেকুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বপ্ন তথা গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াব আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।

বাঙালী উঠতি বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তের স্বার্থ সংরক্ষণকারী দল হিসেবেই আওয়ামী লীগের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছিলো। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-এর আহ্বায়ক জনাব আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক আওয়ামী লীগে যে অংশ স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের পক্ষপাতি ছিলেন, তাদের চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ছিলো বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স বা বি.এল.এফ ব'লে উল্লেখ করেছেন; যদিও তারা– রাজনৈতিক, আদর্শিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হতে পারেননি। তথাপি, বি.এল.এফ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে সকল জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের শারীরিক, সামরিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক-আদর্শিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণের মুক্তি অর্জনের যে আকাঙ্খা এদের ছিল, তা ব্যর্থ হয় এর ক্ষুদ্র অংশ প্রতিক্রিয়াশীল লুটেরাদের মধ্যে, ক্ষমতায় ও ক্ষমতার বাইরে থেকে ভূমিকা রাখার কারণে। তারপরেও বি.এল. এফ-এর মূল অংশ বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃত্বাধীনে এখনো জনগণের সঙ্গে একাত্ম। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক জনাব আ. ফ. ম মাহবুবুল হক তাঁর নিবন্ধে এভাবেই বি. এল.এফ-এর জন্ম, বিকাশ, অবদান এবং বর্তমান অবস্থান চিহ্নিত করেছেন।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা এবং বাস্তবতার মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনটি দাগের মাধ্যমে। সংগ্রামী মানুষগুলো ভাষার জন্য লড়েছে '৫২ সালে, স্বাধীনতার জন্য '৭১ সালে এবং গণতন্ত্রের জন্য '৯০-এ। অথচ বীর শহীদদের স্বপ্নকে সত্যে রূপ দেয়ার জন্য তারা এখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধকে রাজনীতিকরণ, দলীয়করণ; ক্ষমতার জন্য সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে রাজাকারদের সঙ্গে, সামরিক শাসনের সঙ্গে, অপ-আইনের সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ– তিন দাগে ঘেরা বাংলাদেশের মর্মবস্তুকে করে তুলছে অপরিচিত। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের চেতনা রক্ষার জন্য প্রয়োজন নতুন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের। কারো কাছে নত হওয়া নয়, অন্যায় প্রস্তাব মেনে নেয়া নয়, বরং দেশের প্রয়োজনে ঐকমত্যের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব তিনটি রেখার মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখার– এই বক্তব্য জনাব হাসানুল হক ইনুর। এছাড়া তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে।

ছয়

একাত্তরে বাংলাদেশের বামপন্থীদের একটা বড় অংশই জাতীয় মুক্তিব লড়াই ও শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক নিরূপণ ও করণীয় নির্বাচনে সংকটে নিপতিত হয়েছিলেন– বিশেষত বাংলাদেশেব কমিউনিস্টদের একাংশ নক্সালবাড়ী পথের[১৯] বাম-বিচ্যুতিতে পড়ে জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়ার কাজটিকে কিছুটা হলেও উপেক্ষা করেছেন, এবং চীন-এর প্রতি অন্ধ ভক্তি তাদেব প্রতারিত করেছে।[২০] অন্যদিকে কমিউনিস্টদেব আরেক অংশ মুৎসুদ্দী-বুর্জোয়াব প্রতিনিধিদেব জাতীয় বুর্জোয়া ভেবে তাদের সাথে সম্পর্ক নিরুপণে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তবে জনগণের জন্য এদের নিখাদ ভালোবাসা এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিব নিষ্ঠুব বাস্তবতা – প্যাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নির্বিকার হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়ন– সারা দেশের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতা-কর্মীদেবকে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে সামিল করেছে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধেব শেষ দিন পর্যন্ত তারা সে লড়াই সর্বাত্মকভাবে অব্যাহত রেখেছেন। যুদ্ধের শেষভাগে পাকিস্তানী বাহিনীর পাশাপাশি, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, এদের একাংশকে কোন কোন সময়ে মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর সাথেও লড়তে হয়েছে।[২১] কেন তা হলো, কেন আওয়ামী লীগের সাথে বামপন্থীদের যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠলোনা, এই যুক্তফ্রন্ট গড়ে না ওঠার ক্ষেত্রে ভারতের শাসকগোষ্ঠীর কোন ভূমিকা ছিল কিনা ইত্যাকার প্রশ্নের সদুত্তরসহ সংশ্লিষ্ট বহুবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে আগামীতে কমপক্ষে আরো দুটি খন্ড প্রকাশের ইচ্ছে রইল।

এই খণ্ডভুক্ত কয়েকটি লেখা মৌলিক গবেষণা কর্ম – যেমন ডঃ আহমেদ কামালের 'পূর্ব বাংলার পাকিস্তান প্রাপ্তি ঃ 'স্বাধীনতা'র প্রাথমিক উপলব্ধি ও জনগণের প্রতিক্রিয়া' এবং 'সাপ্তাহিক গণশক্তির দৃষ্টিতে কৃষক আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম' ১৯৭০-৭১' ; মেসবাহ কামালের উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান ও মওলানা ভাসানী ইত্যাদি। এছাড়া মুনীর মোরশেদের 'একাত্তরের গেরিলা যুদ্ধ ও পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি' প্রবন্ধটিও ইতিহাস-সম্মত গবেষণা রীতি অনুসরণ করে লিখিত হয়েছে। ডঃ লেনিন আজাদের 'মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) ঃ পাবনা জেলা শাখার ভূমিকা' শীর্ষক নিবন্ধটি মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা জনাব আবুল বাসারের 'ছয় দফা বনাম পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' শীর্ষক লেখাটি এক অর্থে একটি ঐতিহাসিক দলিল, কেননা ১৯৬৮-৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের

১৯। নক্সালবাড়ী পথের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট বেশকিছু দলিলের জন্য দেখুন প্রদীপ বসু, 'নকশাল বাড়ীর পূবক্ষণে ঃ কিছু পোস্ট মর্ডান ভাবনা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স কলকাতা, ১৯৯৮।

২০। বাংলাদেশেব স্বাধীনতা যুদ্ধে চীনেব ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন Mizanur Rahman Shelly, Emergence of a New Nation in a Multipolar World : Bangladesh, University Press Litmited, Dhaka 1979, PP 97-108.

২১। দেখুন, মেসবাহ কামাল (সম্পাদিত), সমাজ চেতনা, সংখ্যা ৪১, জুন ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ২৫, আরো দেখুন এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দলিল 'একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) যশোর জেলা শাখাব ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২৩০-২৪৬

সময়ে লেখা এই নিবন্ধটি শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের ছয় দফা সম্পর্কে তখনকার বামপন্থীদের একটি বড় অংশের দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরে। একইভাবে নড়াইলের তেভাগা আন্দোলনের খ্যাতিমান সংগঠক ও পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট নেতা হেমন্ত সরকারের 'একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) যশোর জেলা শাখার ভূমিকা' শীর্ষক লেখাটিও একটি ঐতিহাসিক দলিল, কেননা একটি জেলায় একাত্তরে তার পার্টির ভূমিকা সম্পর্কিত পর্যালোচনামূলক এই রিপোর্টটি তিনি ১৯৭২ সালের ১২ এপ্রিল তার পার্টির নিকট পেশ করেছিলেন এবং সেই পার্টির গোপন মুখপত্রে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারীতে তা প্রকাশিত হয়। এছাড়া আরো ছয়টি মৌলিক দলিল এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। বাদবাকি সমস্ত লেখাই স্মৃতি-উৎসারিত. তবে বাহান্নোর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের রূপকার জনাব আবদুল মতিন থেকে শুরু করে যাদের স্মৃতিচারণ এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা সবাই ছিলেন আলোচ্য ঘটনাক্রমের কেন্দ্রস্থলে – কাজেই ইতিহাসের উপাত্ত হিসেবে তাদের স্মৃতিচারণের গুরুত্ব অপরিসীম।

সবশেষে, স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। একই সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং বরাক উপত্যকাসহ আসামের জনগণ যে ঐকান্তিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়াছিলেন – কৃতজ্ঞতার সাথে তা স্মরণ করছি।

সাত

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা সম্পর্কিত এই পুস্তকের প্রথম খন্ড প্রকাশের সর্বস্তরে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি 'সমাজ চেতনা'র সংগঠক **জেবুন্নেসা জেবু, সামীম আরা শারমিন মৃধা** ও **মফিজুর রহমান লালটুকে** এবং শেষ পর্যায়ের কাজে সহায়তার জন্য মেঘবার্তা'র সংগঠক **জাহিদুল ইসলাম** ও আমার গবেষক সহকারী **শেখ তাহমিনা আকতার বীথিকে** আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া এই গ্রন্থ আলোর মুখ দেখতোনা। একাত্তরের গুরত্বপূর্ণ দুটি দলিল ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রদান করার জন্য **সৈয়দ আবুল মকসুদের** প্রতি রইলো অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে **প্রকাশ চন্দ্র বর্মন, ইমানুয়েল সন্তোষ চৌধুরী** এবং **মাসুদুর রহমান মাসুদ** নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন; তাদেরকেও ধন্যবাদ।

আগামী দিনের গবেষকগণ মুক্তিযুদ্ধের একপেশে ইতিহাসকে অতিক্রম করে জনগণ ও তাদের যথাযথ প্রতিনিধিদের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করার কাজে এ গ্রন্থকে সহায়ক মনে করলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করবো।

মেসবাহ কামাল
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
প্রকাশক ও সম্পাদক, সমাজ চেতনা

১ আগস্ট, ২০০০

পূর্ব বাংলার পাকিস্তান প্রাপ্তি
'স্বাধীনতা'র প্রাথমিক উপলব্ধি ও জনগণের প্রতিক্রিয়া

ড. আহমেদ কামাল

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে পাকিস্তানের জন্ম হয় এবং একই সঙ্গে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বাংলা প্রদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। এই দ্বিখণ্ডিত প্রদেশটির পূর্বাংশ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত হয়। বলা হয়ে থাকে, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র মুসলমানেরা আজানের ধ্বনি দিয়ে এই নতুন জাতি ও রাষ্ট্রের জন্মকে স্বাগত জানিয়েছিল।[১] চল্লিশের দশকের একজন তরুণ মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ তাঁর দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন যে, ঢাকা শহরের সকল মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার অধিবাসীরা সারা দিনরাত স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য তোরণ নির্মাণ এবং সাজসজ্জা প্রভৃতির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল।[২] সরকারি ও বেসরকারি ভবনসমূহ আলোকসজ্জিত করা হয়েছিল এবং জ্বালানো হয়েছিল আতশবাজি।[৩] জনগণের আনন্দোল্লাসে মুখরিত ছিল পথঘাট এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ট্রাকে, কেউ বা হাতিতে চড়ে আনন্দমিছিলে যোগ দিয়েছিল। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী, এ দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে ছিল হিন্দু-মুসলমানদের একটি সম্মিলিত মিছিল, যা ভিক্টোরিয়া পার্কে এসে জমায়েত হয়েছিল এবং সেখানে প্রধান প্রধান দলের নেতৃবৃন্দ ভাষণ দিয়েছিলেন।[৪]

যদিও পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পর্কে, বিশেষকরে এর পটভূমি ও অর্জন সম্পর্কে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তথাপি কোনো গ্রন্থে জন্মলগ্নে এবং জন্মের অব্যবহিত পরে এই রাষ্ট্রের স্বরূপের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ প্রদান করা হয় নি। বর্তমান গ্রন্থের এই অধ্যায়ে এমন কিছু বিষয় উত্থাপন করা হবে, যেগুলোতে জন্মলাভের পরে এই রাষ্ট্রের যে স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছিল তা তুলে ধরা হয়েছে এবং এ নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল প্রধানত তার মধ্যেই আলোচনা কেন্দ্রীভূত থাকবে।

ড. আহমেদ কামাল : অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কেবলমাত্র ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরিশাল শহরে বিজয় তোরণ নির্মাণের সাথে সাথে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।[৫] সিলেটে দিবসটি উদযাপিত হয় জনসমাবেশের মধ্য দিয়ে। ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে সাইরেন বেজে উঠার সাথে সাথে এই জেলাটি আর ভারতের আসাম প্রদেশের অংশ রইল না। মুসলমানরা দলে দলে বেরিয়ে এসে মিছিল সহকারে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।[৬] একজন প্রখ্যাত জেলা পর্যায়ের কংগ্রেস নেতা প্রভাষ চন্দ্র লাহিড়ী, তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন, উত্তর বাংলার শহর রাজশাহীতে সমবেত বিরাট জনতার প্রত্যেকের মুখমণ্ডল স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।[৭] এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীও বাহ্যত বৃটিশ রাজের অধীনতা থেকে রাজনৈতিক মুক্তি লাভের দরুন নবপ্রেরণা ও আনন্দে মেতে উঠেছিল। একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট কর্মী এবং লেখকের মতে, অন্যদের মতো কমিউনিস্টরাও স্বাধীনতা লাভের আনন্দে অভিভূত হয়েছিল।[৮]

১৫ আগস্ট ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী এবং ভাটপুর অঞ্চলে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ সভা, সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করেন এবং এসবের মধ্যদিয়ে তারা নতুন রাষ্ট্রের সাথে তাদের সংহতি প্রকাশ করেন।[৯]

স্বাধীনতা দিবসে সৌহার্দ্য ও মিলনের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায় ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য স্থানে।[১০] তাজউদ্দীনের দিনলিপির আকর্ষণীয় বর্ণনায় উঠে এসেছে স্বাধীনতা ও মুক্তির সীমাহীন আনন্দ ও উদ্দীপনায় মুখরিত সেদিনকার উৎসবমুখর প্রাদেশিক শহর-গ্রামের ছবি।[১১] স্পষ্টতই বিজয়োৎসবের দর্শকদের কাছে এই 'আনন্দোন্মাদনা' ছিল একমাত্রিক ও শর্তহীন। অবশ্য এই আনন্দোৎসবের হিড়িক দেখে ভাববার কোন কারণ নেই যে, স্বাধীনতা অর্জনের আনন্দোন্মাদনায় সকল মানুষ এক অভিন্ন অনুভূতির অংশীদার ছিল। 'আনন্দোন্মাদনা' শব্দটি পাকিস্তানের ধারণাকে ঘিরে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী প্রত্যাশাকে প্রকাশ করে এবং আড়ালও করে।

পাকিস্তানের জন্মের দিনটি পর্যন্ত পাকিস্তান কনসেপ্টের একটি সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব হয় নি। পূর্ববাংলার মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের একটি রূপরেখা নির্মাণে নিযুক্ত মুসলিম লীগের সক্রিয় কর্মীরা যখন এই সদ্যজাত রাষ্ট্রের সংবিধানের নতুন নীতিমালা নির্ধারণে নিয়োজিত ছিলেন, তখনও তারা এই রাষ্টের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে ব্যর্থ হন, যদিও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ছিল।[১২] স্বাধীনতার লগ্নে জিন্নাহ জাতির উদ্দেশ্যে বলেন:

> আমরা এই মৌলিক নীতি থেকে শুরু করছি যে আমরা সকলেই একই রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সমান নাগরিক....একে আমাদের সামনে আমাদের আদর্শ হিসেবে

রাখা প্রয়োজন এবং আপনারা দেখবেন যে হিন্দুরা আর হিন্দু থাকবে না এবং মুসলিমরা আর মুসলিম থাকবে না, তবে ধর্মীয় অর্থে নয়, কারণ ধর্ম হলো প্রতিটি মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস, তবে রাজনৈতিক অর্থে সকলেই রাষ্ট্রের নাগরিক।

সেই একই ভাষণে জিন্নাহ পাকিস্তানের আইন-প্রণয়নকারী পরিষদ হিসেবে গণপরিষদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।[১৩] ঢাকায় প্রখ্যাত মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা মওলানা ভাসানীও বিধান সভার অধিবেশনে একই ধরনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন :

আজ দেশ একটি মুক্ত স্বাধীন দেশ এবং তা জনগণের মহামতের ভিত্তিতেই পরিচালিত হওয়া উচিত।[১৪] এ ধরনের স্থানীয় নেতাদের জন্য 'পাকিস্তান' -এর প্রকৃত অর্থ ছিল ঔপনিবেশিক আমলের অভিজ্ঞতালব্ধ অংশীদারিত্ব বর্জিত, অগণতান্ত্রিক, অপ্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে বিপরীত রাজনীতির অবতারণা।[১৫]

'আজকের রাত বারটা হলো বৃটিশ শাসনের অবসানমুহূর্ত এবং ভারতের নিজস্ব স্বাধীন সরকারের সূচনালগ্ন।' ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তাজউদ্দীন তাঁর দিনলিপিতে রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এভাবেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর ডায়েরীর পাতার শীর্ষে বড় অক্ষরে 'স্বাধীনতা' শব্দটি লিখেছেন, যা তাঁর অনুভূতিরই ঘনীভূত অভিব্যক্তির সূচক।[১৬] রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকে উদযাপন করতে গিয়ে এক কবি পাকিস্তানকে 'এক অনন্ত ঈদের দেশ' হিসেবে কল্পনা করেছেন।[১৭] বহু জাতীয়তাবাদীর কাছে স্বাধীনতা ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠতম সময়।[১৮] একজন জাতীয়তাবাদী নেতা একে 'পাকিস্তান বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন।[১৯] তাদের বহুজনের কাছেই এটা ছিল নিদেনপক্ষে 'বর্বর শাসনের অবসান, যে শাসন সব ধরনের মানবিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছিল এবং উদ্যমী মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে বিপর্যস্ত করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী রচনা এবং বক্তৃতাসমূহ স্বাধীনতার দিনটিকে ১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পরাজয়ের পর থেকে সংঘটিত সব আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি বলে গণ্য করেছে। আবার অন্য কেউ কেউ একে ১৮৫৭-এর ব্যর্থ অভ্যুত্থান থেকে সূচিত কালক্রমে স্থাপন করেন। 'পাকিস্তান--প্রতিশ্রুতির দেশ, আশার দেশ, সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত দেশ' এমনিতরো বাণী প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হতো জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের পাতায়।[২০]

আর এসব আশার বাণী মুসলিম লীগের চারপাশে সমবেত হাজার হাজার মানুষকে শ্রেণী নৃতাত্ত্বিক বৈষম্যবর্জিত একটি মুসলিম 'জাতি' রূপে প্রতিপন্ন করেছিল। দরিদ্র

মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রায়শ ছিল অভিজাত মুসলমানদের চেয়ে ভিন্ন। এ ছাড়াও জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগ কখনো পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ চারিত্র্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন নি বলে একটা ভাবাদর্শগত শূন্যতা রয়েই গেল, অথচ মুসলিম লীগ সম্পর্কে নানাবিধ পরস্পরবিরোধী মূল্যায়ন বিদ্যমান ছিল।[২১]

'ইতিহাসের এক নতুন যুগ' এবং প্রভাতের উপমা প্রায়শ ব্যবহৃত হতো একটি নবসূচনার ধারণাকে প্রকাশ করার জন্য।[২২] অ্যান্ডারসন সঠিকভাবেই প্রভাত, আলো ও সূর্যকে পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেছেন।

জাতীয়তাবাদীদের জীবন 'পৃথিবীর অগ্রযাত্রার সাথে যুক্ত হয়।'[২৩] সেটি এমন এক সময় যখন গণমানুষের আশা ছিল বহু বিস্তৃত। জাতীয়তাবাদীরা এই জটিল প্রপঞ্চের প্রায়শ সরলীকরণ করেছেন।

দুই

পাকিস্তানের অভিনবত্ব ছিল এর এলাকাগত অবস্থান, যা এযাবৎকালের জানা সব রাষ্ট্রের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তান 'জাতিত্বের প্রায় সকল মানদণ্ডকেই অস্বীকার করেছিল।'[২৪] এই নতুন রাষ্ট্রের দুই অংশ হাজার মাইলের ভারত দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল এবং ক্ষুদ্রতম পূর্বাঞ্চল (মাত্র ৫৪,০৯১ বর্গমাইল এলাকাসম্পন্ন) ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ছয় গুণেরও বেশি।

যদিও এটা ছিল একটা 'দ্রুত উদ্ভাবিত' সর্বভারতীয় সমাধান[২৫], কতিপয় জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিতে এটা ছিল রাষ্ট্র নির্মাণের নব্য পরীক্ষানিরীক্ষা।[২৬] অন্য বহু জনের কাছেই এটা ছিল একটা অন্যায্য বিভাজন[২৭], ক্ষেত্রবিশেষে 'অস্বাভাবিক' বিভাজন। হয়তো অনেকেই এটাকে একটা উদ্ভট রাষ্ট্র ভেবেছিলেন।[২৮] এ ধরনের চিন্তাধারার পেছনে অসংখ্য কারণ ছিল। যেভাবে বৃটিশ ভারত এবং বিশেষত বঙ্গ প্রদেশ বিভক্ত হয়েছিল, তা ছিল অনেকের কাছেই অগ্রহণযোগ্য। কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান নেতা চেষ্টা করেছিলেন আর একটি তৃতীয় রাষ্ট্রের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করতে এই পরিকল্পনাই পরে প্রস্তাবিত হয়েছিল বৃহৎ বঙ্গ নামে।[২৯] কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যাহত হয়েছিল দলীয় বিরোধিতা দ্বারা এবং প্রতিযোগী ভারতীয় ও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদীদের নিষ্ক্রিয় ক্ষমতার কারণে।[৩০] বাংলাকে বিভক্ত করা হলো এবং কলকাতা ছাড়া পূর্ববঙ্গকে মনে হয়েছিল এক বিশাল জনসংখ্যা অধ্যুষিত বৃহৎ দরিদ্র বস্তি।[৩১] এই বিভাজন সংঘটিত হলো বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে।[৩২] বিভাজন নাটকের একজন মূল নায়ক এ বিভাজনকে বর্ণনা করেছিলেন 'ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসনিক অপারেশন' হিসেবে।[৩৩] পাকিস্তানের জন্মলগ্ন অব্দি তার ভাবমূর্তি ছিল অস্বচ্ছ এবং অনিশ্চিত,

সেই সাথে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের অভিমুখী।[৩৪]

ধর্মীয়, জাতিগত, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বিবেচনা এই নতুন রাষ্ট্রের নিয়ামক ছিল না, যার বিশেষ রাজনৈতিক ভূসংস্থান নির্ধারিত হয়েছিল বিদায়ী ঔপনিবেশিক শক্তি এবং প্রতিযোগী জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির স্বেচ্ছাচারী কার্যাবলী দ্বারা। জাইরিং যথার্থই মন্তব্য করেন যে, 'জনগণের মধ্যকার ঐতিহ্যগত গতিশীলতাকে মন্তর ও সীমাবদ্ধ করে আন্তর্জাতিক সীমানাসমূহ টানা হয়েছে।'[৩৫] কিছু মুসলিম লীগ নেতা অভিযোগ করেন যে, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রদেশকে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। নদীপথসমূহকে কৃত্রিমভাবে বিভাজন করা হয়েছে এবং একমাত্র কর্ণফুলী ছাড়া সকল বাঁধের এলাকাই পশ্চিম বাংলায় পড়েছে।[৩৬] বাউন্ডারি কমিশনের রোয়েদাদ সম্পর্কে বহু মুসলিম লীগ সদস্যের অভিমত এই যে, তা শিল্পায়নের বিকাশকে অনিশ্চিত করেছে।[৩৭] এ ছাড়া প্রদেশের এ ধরনের বিভাজন আসামের পার্বত্য ত্রিপুরা স্টেট এবং কাছাড় থেকে সিলেটের বহু থানায় চিরাচরিত নিয়মে চাল ও ধান সরবরাহ কঠিন করে তোলে।[৩৮] সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চলের উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত কানাইঘাট, জয়ন্তিয়াপুর ও গোয়াইনঘাট থানাসহ জয়ন্তিয়া পরগনার জনগণ সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। আসামের সাথে তাদের স্বাভাবিক বাণিজ্যপথগুলি চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবার ফলে তাদের জীবনে দুঃখকষ্ট ও অভাব নেমে আসে।[৩৯]

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কলমের এক আঁচড়ের মাধ্যমে সৃষ্ট দেশটির অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে যখন নানা সমস্যা 'বিস্ময়কর গতিতে ভিড় করতে থাকে' এই ভূখণ্ডে, যেখানকার জনসংখ্যা ৪ কোটি ২০ লক্ষ, যাদের মধ্যে ২৯,৪৮১,০০৯ জন মুসলমান, ১১,৭৩৬,০২৯ জন হিন্দু, ৫৬,৮৮২ জন খৃস্টান এবং ১,১৭৯ জন শিখ। ঐ সময়ে মাইলপ্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৭৭৫ জন, যা ছিল বিশ্বে সর্বোচ্চ ঘনবসতি। কেবলমাত্র ৫০০ মাইল পাকা রাস্তা এবং অসংখ্য আঁকাবাঁকা নদ-নদী ও খাল এই ভূখণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ তৈরি করেছিল।[৪০]

পূর্ববাংলা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল ভারতের ৪০০ সুতাকলের মধ্যে মাত্র ১০টি, ১০৬টি পাটকলের একটিও না, লোহা ও ইস্পাত কারখানা, কাগজ কল, রাসায়নিক শিল্প, কয়লা খনি কিংবা পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প একটিও না। কেবল ছিল ৪৯টি অস্থায়ী (ঋতুভিত্তিক) পাটের গাঁইট বাঁধার কারখানা (সমগ্র দেশের এতদসংক্রান্তকর্মকাণ্ডের ২০ শতাংশ মাত্র), ৫৮ টি ক্ষুদ্র চাউলকল, ৩টি চিনির কল ও ১টি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী।[৪১]

এতদ্‌সত্ত্বেও সমসাময়িক সরকারি বিবরণীতে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব সম্পর্কে একটি আশাবাদী চিত্র তুলে ধরা হয়। স্বাধীনতার পরপরই প্রকাশিত একটি সরকারি দলিলে উল্লেখ করা হয়

যে, 'এসব উপেক্ষিত অঞ্চলের প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা সংক্রান্ত আশা, যা নিয়ে নতুন রাষ্ট্র তার যাত্রা শুরু করে, তা কোন মূল্যহীন বিশ্বাস নয়' এবং ঐ দলিলে চা, তামাক, চামড়া, কাগজ ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং রপ্তানির সম্ভাবনা এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, এতে জনগণের আস্থা ও মনোবল অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, দশকের পর দশক ধরে পাট উৎপাদনকারী এই প্রদেশটির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল 'কলকাতার সমৃদ্ধির পশ্চাদ্‌ভূমি হিসাবে'।[৪২]

পূর্ব বাংলায় কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও ঘাটতি ছিল, যেমন ভোজ্যতেল, চিনি এবং বস্ত্র। এখানকার ৪টি চিনির কলে বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২৫,০০০টন, যা প্রয়োজনের অর্ধেক।[৪৩] পূর্ববাংলার ভাগে পড়ে অবিভক্ত বাংলার মোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মাত্র ১২ শতাংশ। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০০।[৪৪]

স্বাধীনতার সময়কালকে সরকারি প্রতিবেদনসমূহে সাধারণত 'সমস্যা জর্জরিত' অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যেই 'প্রথমে বড় ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় যখন চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের প্রায় ৫০০ বর্গমাইল এলাকা ও পাঁচ লক্ষের অধিক জনগোষ্ঠী প্রবল বন্যায় আক্রান্ত হয়।[৪৫] শত শত ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়, অসংখ্য গবাদি পশু ভেসে যায় বন্যার পানিতে, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় শস্যসম্পদ ফলে নতুন দেশে সৃষ্টি হয় খাদ্য সংকটের সমস্যা। বন্যার পানি নেমে না যেতেই 'নজিরবিহীন এক ঘূণিঝড়' পূর্ববঙ্গের সর্বদক্ষিণের অঞ্চল কক্সবাজারের উপর দিয়ে বয়ে যায়, যাতে প্রায় এক লক্ষ মানুষ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় বার্ষিক পলিজ বৃদ্ধি ছাড়াও নদীসমূহে অব্যাহত ক্ষয়প্রক্রিয়ার কারণে পূর্ববাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।[৪৬]

তবে দেশের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠে খাদ্যসংকট। ৭.৮ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদনকারী এবং ৮ মিলিয়ন টন ধানের চাহিদাসম্পন্ন এই অঞ্চল দুর্ভিক্ষের হুমকির সম্মুখীন হলো, অথচ তখনো জনগণের স্মৃতি থেকে ১৯৪৩ -এর ভয়াল দুর্ভিক্ষের ছবি মুছে যায়নি। বিভাজনের পর পূর্ববঙ্গ বরাদ্দ হিসেবে পায় মাত্র ১৮,০০০ টন ধান। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কোন মজুদ ময়দার অস্তিত্বই ছিল না এই প্রদেশে। এমনকি এই তারিখের চার মাস আগে থেকেই ঢাকায় কোন রুটির সংস্থান করা সম্ভব ছিল না।[৪৭] তদানীন্তন ধানের মজুদ আর মাত্র দুই সপ্তাহ শহরের চাহিদা পূরণে সক্ষম ছিল, এবং তাও শহরের রেশনিং সিস্টেমের অধীন ছিল। প্রদেশের মোট ৩৯,০০০ টন খাদ্যের চাহিদায় ঘাটতি ছিল ৯,০০০টন। যেহেতু সম্পূর্ণ পরিবহনব্যবস্থাই হিন্দু কর্মীরা দেশান্তরী হওয়ার ফলে অচল হয়ে পড়েছিল, তাই ঘাটতি এলাকাগুলি খাদ্য বিতরণকারী সংস্থার আয়ত্তের বাইরেই চলে যায়। অথচ একটি বাস্তব সত্য এই যে, সেই সময় খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয়ই

প্রাদেশিক সরকারকে দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে সচল রেখেছিল।[৪৮]

অবশ্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, একটি দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। পাকিস্তান সরকার ও পশ্চিম বাংলার প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার খোলা চিঠিতে তা এভাবেই বিবৃত হয়েছে:

> 'খাদ্যের মূল্য মণপ্রতি ৩০ টাকা বেড়ে গেছে। রেশনিং চাল কেবলমাত্র ৬ লাখ লোকের জন্য। এর ফলে হিন্দু-মুসলমানরা পাইকারি হারে অভুক্ত রয়েছে। অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়ছে। পূর্ববঙ্গের বিশাল অঞ্চল সত্যিকার অর্থেই ভয়াল দুর্ভিক্ষের কবলে।[৪৯]

তিন

Greenoush সমগ্র স্বাধীনতাপূর্ব সময়কে 'অনিয়ম' ও 'দুর্দশার কাল' বলে অভিহিত করেছেন।[৫০] প্রকৃত প্রস্তাবে খাদ্যঘাটতি, বন্যা এবং সরকার পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক মানুষের কাছে স্বাধীনতা নতুন সূচনা না হয়ে নতুন সংকট হয়ে দাঁড়ালো।

যখন ঔপনিবেশিক শক্তি দেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন জনগণের পরিবর্তে অনেকাংশে নবজাত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাগণই সরকারের শাসনভার গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া ভারাক্রান্ত ও দুর্বহ হয়ে উঠেছিল অসংখ্য প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমস্যার দ্বারা। এক সরকারি প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, বিভাগীয় জটিলতা ও অস্পষ্টতার কারণে '১৫ আগস্ট' প্রাদেশিক রাজস্ব দফতরের তহবিল একদম শূন্য হয়ে পড়ায় একজন বিশেষ গুপ্তচরকে করাচীতে পাঠানো হয়েছিল ত্রাণসাহায্য চাওয়ার জন্য।'[৫১] কর্মকর্তার অভাব নিয়েও সমস্যা ছিল। কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রের সূচনা ছিল এই রকম :

> 'আগস্ট ১৪, ১৯৪৭। কলকাতার কাছাকাছি দমদম এয়ারপোর্ট থেকে একটি ডাকোটা বিমান অনিচ্ছুকভাবে রওয়ানা দিল ঢাকার উদ্দেশে... বিমানটি ভূমি স্পর্শ করার পর দুই ডজন কর্মকর্তা তা থেকে নেমে এলেন। এঁরা ছিলেন পাকিস্তানে চলে আসতে ইচ্ছুক কিছু সিনিয়র কর্মকর্তা যাঁরা পূর্ব বাংলার কিছু অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ পূরণ ও কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন।... এ রকম একটি ঢাকাগামী ডাকোটা ফ্লাইটই যথেষ্ট ছিল ঐ পর্যায়ের যোগ্যতার অধিকারী কর্মকর্তাদের অভাব পূরণের জন্য।'[৫২]

এমনকি কিছুদিন পর পূর্ববঙ্গে সরকারি প্রশাসন প্র অস্তিত্বহীন এবং ভয়ানকভাবে অদক্ষ

হয়ে পড়লো।[৫৩] ৯ মার্চ, ১৯৪৮-এর 'Statesman' পত্রিকা (কলকাতা) এক সমালোচনায় লিখেছিল, 'কিছু রাষ্ট্র শূন্য তহবিল নিয়ে কাজ শুরু করে, যেমন পূর্ববঙ্গ কাজ শুরু করেছে একটি ভেঙ্গে পড়া প্রশাসনযন্ত্র নিয়ে।'[৫৪] প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়ায় অসহায়ত্ব প্রতিভাত হয়েছে, কেননা তাদেরকে হঠাৎ নিজেদের রক্ষার দায়িত্ব নিজেদেরই গ্রহণ করতে হয়েছিল।

প্রাদেশিক সরকারের পদেব ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি এর চেয়ে বেশি ভিন্ন ছিল না :

> 'ঢাকা একটি ছোট্ট বিভাগীয় শহর ...হঠাং করেই সেখানে কেবল প্রাদেশিক সরকার নয়, এর বিশাল কর্মচারীবাহিনী, আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম এবং এমনকি কতিপয় কেন্দ্রীয় সরকারি বিভাগের জন্য স্থান সংকুলানের প্রয়োজন হলো... নতুন সরকার নিজের দেশেই ছিল পলায়নপর... আদেশ কখনো ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় লিখিত হতো, তথ্যবিনিময় হতো ছেঁড়া সিগারেটের প্যাকেটে, টাইপরাইটার মাঝে মাঝে মিলতো, টেলিফোন ছিল এক দুর্লভ সামগ্রী... প্রশাসনের সুবিধাদায়ক যন্ত্র না হয়ে তা পরিণত হয়েছিল বিলাসসামগ্রীতে...কর্মকর্তারা নিজেরাই প্রায়শ নিজেদের বার্তাবাহকের ভূমিকা পালন করতেন। আসবাবপত্র বলতে বস্তুত কিছুই ছিলনা।[৫৫]

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিও সি) স্মরণ করেন, 'স্বাধীনতার অল্পকাল পরেই সেখানে কেবল দুই ব্যাটালিয়ন পদাতিক বাহিনী ছিল। এদের একটিতে ছিল তিনটি কোম্পানি, যাদের সৈনিক হওয়ার মত যোগ্যতার যথেষ্ট অভাব ছিল। সদর দফতরে কোন টেবিল, চেয়ার, সাজসরঞ্জামাদি, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র কোন কিছুই ছিল না। কর্মকর্তারা কুঁড়ে বাস করতো, মুষলধারে বৃষ্টি হলে তাতে ক্রমাগত পানি পড়তো, কখনো ত্রিপলঢাকা ছাদ উড়ে যেত।[৫৬] ১৯৪৭-এর আগস্টে ঢাকায় চাকুরিরত একজন সামরিক কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী : '১৯৪৭ সালের আগস্টে মনে হচ্ছিল, প্রদেশটি অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার কবলে পড়েছে। তিনি আরো মন্তব্য করেন: 'সেই অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ সাফল্যের জন্য যা পাওয়া গিয়েছিল, তাও ছিল তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল, এক কথায় একেবারেই অপর্যাপ্ত।'[৫৭]

পুলিশবাহিনী তাদের নিজেদের মূল্যায়নে অত্যন্ত হীন অবস্থায় ছিল। আইনের প্রয়োগ এবং শৃঙ্খল. ্ক্ষা উভয় দায়িত্বই বৃটিশ আমলের মত তখনো পুলিশ বাহিনী ..লন করতো। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ প্রশাসনের প্রতিবেদনে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল স্বাধীনতার প্রথম বছর সম্পর্কে বলেন, 'এটি নজিরবিহীন প্রবল চাপ ও সংকটের বছর। মজার ব্যাপার এই যে প্রারম্ভিক অনিশ্চয়তার এ: সময়ে সরকারি প্রতিবেদনসমূহ স. .ভাবে নতুন দেশকে অভিহিত করেছে 'শিশুরাষ্ট্র' বলে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য অবধারিতভাবে এক অনিশ্চয়তার জন্ম দিল, এবং এই পরিস্থিতিতে কখনো কখনো জনগণের উদ্যম ছিল অত্যন্ত প্রবল। কর্মকর্তাদের বিবেচনায় রাষ্ট্র ছিল সরকারি কার্যাবলীর সমষ্টিমাত্র। পক্ষান্তরে সরকারের জনপ্রিয় ধ্যানধারণা ও প্রত্যাশা প্রায়শ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ধাঁধায় ফেলে দিত। একদিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং কাম্য ছিল জনগণের আনুগত্য, নতুন রাষ্ট্রের কাছে যাদের প্রত্যাশা মাঝে মাঝে ছিল একেবারে অবাস্তব। অন্যদিকে রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্রকে সুসংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল; কেননা রাষ্ট্রে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ছিল অগণতান্ত্রিক, দমনপন্থী ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রেরই অবদান।

চার

স্বাধীনতাপূর্ব দিনগুলিতে মুসলিম লীগ তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ও ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেছিল এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক জাতীয় পরিচয় নির্মাণের উদ্দেশ্যে। ১৯৪০-এর ২৩ মার্চের লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতো মুসলিগ লীগ। কিন্তু তারা ঔপনিবেশক শাসনের কঠোর সমালোচনা যেমন করেনি, তেমনি সম্ভাব্য রাষ্ট্রের চারিত্র্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্যও রাখেনি। মূলত এ রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল নেতিবাচকভাবে।[৫৮] পাকিস্তানবাদ হয়ে দাঁড়ায় উপনিবেশবাদবিরোধিতা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতার নামান্তর।[৫৯] যে ইতিবাচক বক্তব্য লীগের ছিল তাকে বৃহৎ পরিসরে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কখনো পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্য এবং সময় ও বৌদ্ধিক সম্পদের অভাবের দোহাই দিয়ে একে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতিপাদন করা হয়েছে।[৬০] তার ফলে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত সব ধরনের আলোচনাকে এড়িয়ে গেছেন।

লীগের কিছু সদস্যের একমাত্র ভয় ছিল এই যে স্বাধীন অখণ্ড ভারতে হিন্দুরা প্রধান্য বিস্তার করবে। অন্যরা আশা করেছিল যে অতীত ঐতিহ্যবাহী মুসলিম শক্তির গৌরবের পুনর্জন্ম হবে। কিন্তু কোন পক্ষেরই পরিষ্কার ধারণা ছিল না কিভাবে রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে সংগঠিত করা হবে।[৬১] আসলে তাদের চিন্তাভাবনা ছিল মূলত এলিটবাদী। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর লোকের স্বার্থকে সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ হিসেবে দেখানো। এ ছিল তাদের আভিজাত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। এভাবে তারা ইসলামী ঐক্যের ধারণাটিকে ইসলামী সাম্রাজ্যের গৌরবময় অতীতের কল্পলোকে স্থাপন করলেন।[৬২] বহু মুসলিম লীগ কর্মীর বক্তৃতা ও লেখায় এই উদ্দেশ্য সচেতনভাবে ক্রমাগত প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাধীনতার ঠিক ঊষালগ্নে পূর্ব পাকিস্তানের এক জেলায় জনৈক মুসলিম লীগ কর্মীর উচ্ছ্বাস ছিল, 'মুসলিম ভারত তার হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে যাচ্ছে।'[৬৩] অতীত কালের ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে লীগ চেষ্টা করতে লাগলো মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও

নৈতিক মানসপ্রবণতাকে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত করতে।

একটি পৃথক রাষ্ট্র যখন প্রকৃত অর্থেই জন্ম নিল, তখন তা অনেকটা বৃটিশপ্রদত্ত উপহার হয়ে দাঁড়ালো। স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত স্টেটসম্যান পত্রিকায় একে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে জাতির অর্জনের পরিবর্তে বৃটিশের অমূল্য উপহার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার এই সম্মতিভিত্তিক পরিবর্তন পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম বয়ে নিয়ে এলো। ১৫ আগস্টে পাকিস্তান বৃটিশ ভাইসরীয় (Vice-regal) পদ্ধতি অবলম্বন করলো। জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল উপাধি ধারণ করে গণপরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন এবং একই সাথে মুসলিম লীগের সভাপতির পদেও বহাল থাকলেন। যুক্তপ্রদেশ মুসলিম লীগের একজন নেতা লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করলেন।

বাংলার বেশ কিছু স্বনামধন্য মুসলিম লীগ নেতা দেশবিভাগ এবং স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহের পরিণামে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে উৎখাত হয়ে যান। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, যিনি একবার মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের নেতৃত্বচ্যুত হয়েছিলেন, তিনি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন ইতিমধ্যে অবনতিশীল বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ককে উন্নত করার জন্য। যখন দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা শহরকে স্বাধীনতাপরবর্তী বিজয়োৎসবের আনন্দ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তখন তিনি এক দরিদ্র মুসলমানের জীর্ণগৃহে অনশনরত গান্ধীজীর অনশন ভাঙানোর চেষ্টা করছিলেন। ফজলুল হক, যিনি যুগ যুগ ধরে বাঙালি মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন, তিন জিন্নাহর কূটকৌশলের দরুন বাংলার মুসলিম লীগের রাজনীতিতে প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে কলকাতায় নিজের বাসভবনে পরাজয়ের মর্মবেদনা নিয়ে কালাতিপাত করছিলেন। মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম, যিনি মৃতপ্রায় এই সংগঠনটিকে একটি কর্মপরিকল্পনা ও প্রাদেশিক কর্মসূচির ঘোষণাপত্র দিয়ে এর উদ্যমী তরুণ ছাত্র-সদস্যদের উজ্জীবিত করেছিলেন, তিনিও দেশবিভাগের সময়কার গোলযোগ ও বিভ্রান্তির শিকার হন। তিনি তখন সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একটি সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ার জন্য তাঁর সমস্ত কর্মোদ্যোগ নিয়োগ করেন। অবশ্য এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে তিনি অবশেষে বর্ধমানে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন। আসামের মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মওলা[illegible] ভাসানী, যিনি পূর্ববঙ্গ থেকে আসামে এসে বসবাসকারী [illegible]লমান কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন. পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসেবে আসামের জেলা সিলেটকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, তিনিও দেখতে পেলেন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে নতুন মুসলিম লীগের দলীয় বিন্যাসে তাঁব কোন স্থান নেই এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আসাম সরকারের কারাগারে বন্দি হলেন। শেখ মুজিবর রহ[illegible]ন ও আবুল মনসুর আহমদ

বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পর কলকাতায় থেকে যান। আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দিন আহমেদ, শামসুল হক প্রমুখ ঢাকাভিত্তিক বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা তখন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের নতুন কেন্দ্র ঢাকার নবাববাড়ী 'আহসান মঞ্জিল' পর্যন্ত তাঁদের দূরত্ব পরিমাপ করে চলেছেন।[৬৪] তাঁদের প্রত্যেকেই স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিরোধী দলীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূকিকা পালন করেন।

খাজা নাজিমুদ্দিন এবং মওলানা আকরাম খাঁ যথাক্রমে প্রাদেশিক সরকার ও মুসলিম লীগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন। মূলত মুসলিম লীগ তিনটি কেন্দ্রের কাছে বাঁধা পড়ে। এগুলো হচ্ছে নেতৃত্বের জন্য আহসান মঞ্জিল, প্রচারের জন্য দৈনিক আজাদ, অর্থের জন্য ইস্পাহানির বাণিজ্যিক সংস্থা।[৬৫] সংক্ষেপে এই ছিল তদানীন্তন মুসলিম লীগের চেহারা। ভারতের মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বৃটিশ রাজ এই সংগঠনের কাছেই তার রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

পাঁচ

মার্ক্সীয় চিন্তাধারা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে এক নাজুক অবস্থায় পড়ে যায়। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে সমর্থন করতো এবং মুসলিম লীগের স্বজাতির প্রতিনিধিত্ব করার দাবিকেও স্বীকার করতো।[৬৬] কিন্তু পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের সাথে সাথেই কমিউনিস্টদের মোহমুক্তি ঘটে। জাতীয়তাবাদীদের সাথে তাদের সম্পর্ক ক্রমেই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠে এবং পরিণামে তাদের যাত্রাপথ ভিন্ন হয়ে যায়। তারা কেবল পৃথক পথ বেছে নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে পরস্পরকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। এ পর্যায়ে কমিউনিস্টদের উচ্চকিত শ্লোগানে বলা হয়. 'এ স্বাধীনতা মিথ্যা'। পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতার মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় প্রাথমিক মুহূর্তগুলির তিক্ততার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

এমনকি বেশ কয় বছর পর কেউ কেউ স্বাধীনতার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে একে তুলনা করেছে 'সাদা হাতীর কালো মাহুত' অথবা 'নতুন বোতলে পুরানো মদ'-এর সঙ্গে।[৬৭] স্বাধীনতার মোহভঙ্গ আমূল সংস্কারকামীদের কাছে এত গভীরপ্রসারী হয়েছিল যে, তারা একে অন্ধ যুগের আবির্ভাবের সাথে তুলনা করেছেন।[৬৮] প্রায় দুই যুগ পরে ১৯৭১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খুলনা শাখার প্রাক্তন সদস্য ধনঞ্জয় দাস ১৯৪৭ সালের আগস্টে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে অংশ নিয়েছিলেন বলে খেদ প্রকাশ করেছেন।[৬৯] সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বরিশালের এক মুসলমান কমিউনিস্টের আত্মজীবনীতে বৃটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভে তার অনুভূতির কথা কিছুই লেখা হয় নি।[৭০] বহু সংস্কারবাদীর কাছেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ আর কিছুই নয়, শাসন কাঠামোর বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন এবং বৃটিশ,

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমন্বিত যোগসাজশের ফলশ্রুতি মাত্র। যেমন একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট বিদ্রূপের সাথে লিখেছেন : 'কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে, বৃটিশ পুলিশের স্থলে ক্যাম্প স্থাপন করেছে পাকিস্তানী পুলিশের।'[৭১]

কমিউনিস্ট আন্দোলনের অপর এক সক্রিয় কর্মী পাকিস্তানের প্রতি বাঙালি মুসলমানের সমর্থনকে সনাক্ত করেছেন এইভাবে : 'পাকিস্তান দাবির প্রতি পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের জোরালো ও সক্রিয় সমর্থন রয়েছে।' সেই সাথে তিনি যুক্ত করেছেন: 'যদিও এ দাবি ভুল ছিল কিংবা এতে সচেতনতার অভাব ছিল, তথাপি পূর্ববাংলার খেটে খাওয়া মুসলমান জনগোষ্ঠী পাকিস্তানকে তাদের নিজস্ব ভূমি হিসেবেই গ্রহণ করেছে।'[৭২] পাকিস্তান সম্পর্কে কমিউনিস্ট সাহিত্যের রায় এই যে এটি হচ্ছে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গণসচেতনতা'কে ভ্রান্ত হলেও সত্য বলে মেনে নেয়া।

পূর্ববাংলার সমাজের অপর গুরত্বপূর্ণ অংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় সংগঠিত ছিল। তাদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যাশাও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক জটিলতায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। প্রথমেই ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট অর্জিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি লাহিড়ীর প্রতিক্রিয়া দিয়ে শুরু করা যাক :

> 'বলা যায়, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট অনেকটা ফাঁদে পড়েই মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টের সাথে সম্মিলিতভাবে (পাকিস্তানী) পতাকা উত্তোলনে বাধ্য হলেন। মনে হয়, এই সংস্থাকে কেবল অপমানিত করার উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছিল, যে সংস্থার অবিচল দাবি ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা...এতে বাঙালি বিপ্লবীদের... পক্ষে আনন্দিত হওয়া ছিল কঠিন ব্যাপার।[৭৩]

পাকিস্তানের সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে এক আকস্মিক পরাজয়, হতাশা ও বিশ্বাসভঙ্গের অনুভূতি পূর্ববঙ্গের উচ্চ সম্প্রদায়ের হিন্দু গোষ্ঠীর মনকে ভারাক্রান্ত করলো। একজন হিন্দু নেতা তাঁর মোহভঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : হিন্দুরা কখনো পাকিস্তান চায়নি। পাকিস্তানকে তাদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।[৭৪] ঢাকার একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট কর্মী জ্ঞান চক্রবর্তী উল্লেখ করেন যে, হিন্দুদের কাছে গোড়া থেকেই পাকিস্তান অগ্রহণযোগ্য ছিল এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরপরই বিপুল সংখ্যক হিন্দু দেশত্যাগ করে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, এই সম্প্রদায়ের প্রায় সকল সরকারি কর্মচারিই সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে।[৭৫] কিছু স্থানে হিন্দু পেশাজীবীদের প্রতিক্রিয়া এত বেশি তিক্ত ছিল যে, দেশত্যাগের পূর্বে তাঁরা সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর পর্যন্ত করেছিল। অজয় ভট্টাচার্যের ভাষ্য অনুযায়ী, সিলেট হাসপাতালের হিন্দু কর্মচারীরা হাসপাতালের সম্পদ ভাঙচুরের পর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায়।[৭৬] খবর পাওয়া যায় যে মুন্সিগঞ্জ সাব-জেলের

হিন্দু কেরানী ও বন্দিরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন বরাদ্দ 'বাড়তি রেশন'-এর কোটা বর্জন করে।[৭৭] সমাজের 'নেতৃস্থানীয় শ্রেণী'[৭৮] উচ্চতর বর্ণের হিন্দুরা রাতারাতি তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারালো এবং বঙ্গবিভাগ তথা ১৯৪৭ সালের ভয়ানক দিনগুলোর মর্মান্তিক অনুভূতিসঞ্জাত হতাশা, তিক্ততা ও মোহভঙ্গ এই নিবন্ধের আওতার বাইরে এক লক্ষণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করলো।[৭৯]

লাহিড়ীর অভিমানসূচক অভিব্যক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দুর ব্যর্থতাবোধ, যা পূর্ববাংলায় সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও অধিক সংখ্যক হিন্দুর মনে জাগ্রত হয়েছিল। এমনকি হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের নির্যাতিত শ্রেণী সাংবিধানিক রাজনীতির পরিমণ্ডলে তাদের ভাগ্যকে বাংলার মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল।[৮০]

তবুও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সংস্কারবাদী রাজনীতিতে যুক্ত বহু হিন্দু এখানেই থেকে যাওয়ার এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে অবদান রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এঁদের অন্যতম ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী লিখেছেন :

> আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি দেশত্যাগ করবো না। আমি পাকিস্তানেই থেকে যাব। পাকিস্তানের জনগণের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে এখানেই আমি থেকে যাব। এই দেশ পূর্ব বাংলা আমার দেশ... কেন আমি এই দেশ ত্যাগ করবো?[৮১]

তাঁর মতো মনোভাবসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমিউনিস্টও এদেশে থেকে যান পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের কারাগারসমূহে দীর্ঘ বছর গুলোর দুর্ভোগপূর্ণ বন্দিত্ব বরণ করে নেয়ার জন্য।

উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহেও অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত গারোরা মনে করে যে নতুন রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। অতএব, একমাস শেষ না হতেই ময়মনসিংহের পার্শ্ববতী এলাকার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর একটি স্মারকলিপি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়।[৮২] এই স্মারকলিপি উত্থাপিত হয় ১৯৪৭ সালের ২৪ আগস্ট-উত্তর ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের রাংরাপাড়ায় আয়োজিত উপজাতীয়দের সমাবেশে। সেখানে উপস্থিত প্রায় ৪০০০ লোক তাদের বসতি অঞ্চলের একত্রীকরণ দাবি করে। এর মধ্যে ছিল ময়মনসিংহের অধীন ৫টি থানা এবং ঐ এলাকা সন্নিহিত ভারতের আসাম প্রদেশ।[৮৩] বৃটিশ রাজ কর্তৃক গৃহীত জাতিভিত্তিক নতুন রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার দাবি জানানোর সুযোগ করে দিল। বৃটিশরাজের এই দেশবিভক্তি গারো সম্প্রদায়ের উপ..তীয় নেতা ও জনগণকে অনুপ্রাণিত করলো উপজাতি

সম্প্রদায়গুলিকে সংগঠিত করে এই দাবি জানাতে। সাধারণ গারোরা যে কারণে অস্থিরতার শিকার হয় তা এই যে স্বেচ্ছাচারী রেডক্লিফ রোয়েদাদ মোতাবেক জোরপূর্বক দেশবিভাগের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে তাদের একাংশ ভারতীয় ভূখণ্ডের আওতাভুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে দেশবিভাগের দ্বারা গারোদের দু'টি অংশের ঐতিহাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, অথচ এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোন আলোচনাই করা হয়নি। স্বাধীনতার সময়ে উপজাতীয়দের আশা ও ভীতি যে বিতর্কিত বিষয়গুলির জন্ম দিয়েছিল, তা আজও বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়।

ছয়

স্বাধীনতার বড় বড় বুলি ভিন্নতর হয়ে যায় যখন আমরা স্বাধীনতা দিবসে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করি। তাজউদ্দিন আহমেদ মন্তব্য করেন : 'যখন রাত নেমে এলো এবং আনন্দোৎসব শেষ হলো, তখনো ঢাকার রাজপথের বহুলোক রয়ে গেল, যাদের অধিকাংশই বিজয়োৎসবে অংশ নেয়ার জন্য প্রতিবেশী জেলাসমূহের গ্রামগুলি থেকে ঢাকায় এসেছিল।'[৮৪] রাজশাহী থেকে লাহিড়ী লিখেছেন : 'দিনের আলো বাড়ার সাথে সাথে শত শত, হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ শহরে প্রবেশ করতে লাগলো।'[৮৫] সমান সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান মিলে প্রায় ১ লক্ষ লোক ঢাকায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য উপস্থিত হয়। তাজউদ্দিন ১৫ আগস্ট লক্ষ্য করেন, অধিকাংশ লোকই জেলার বাইরের গ্রামবাসী। তারা এসেছিল সুদূর কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ থেকে 'পাকিস্তান'-এর বাস্তব রূপায়ণ দেখার জন্য। তাদের অবস্থান গ্রামে, যেখানে ভৌগোলিক গতিশীলতা স্বাভাবিকভাবেই ছিল যথেষ্ট সীমাবদ্ধ।[৮৬] শুধুমাত্র মুক্তির অনুভূতিই তাদের টেনে এনেছিল ঢাকায়, নতুন ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই রাতে ঢাকার পথে 'আগত জনগণ' সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই দিবসের অনুষ্ঠানসমূহে অংশ নিয়েছে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ছাড়াই। সারাদেশে তাদের সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ মৈত্রী ছিল অন্তত ব্যাহ্যিকভাবে সুস্পষ্ট।

ঢাকায় তাজউদ্দিন ও লাহিড়ী উভয়েই বিচলিত হয়ে ছিলেন জনগণের অত্যধিক উচ্ছ্বাসের প্রকৃতি লক্ষ্য করে। তাজউদ্দিন নেতাদের বক্তৃতা শুনার জন্য আগত জনগণের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। ত. . এসেছিল নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনতে এবং কোথাও আসন গ্রহণ না করে তারা ভিড় করছিল।[৮৭] লাহিড়ী জানান যে এদের কেউ ট্রেনে অগ্রিম টিকিট করার প্রয়োজন বোধ করেনি।[৮৮] তাজউদ্দিন আরো লক্ষ্য করেন যে যারা ঢাকায় এসেছিল 'তাদেরকে ট্রেনের ভাড়া দিতে হয়নি।' এসব উচ্ছৃঙ্খল আচরণ মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে ছিল অ .ন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

এছাড়া আরো বহু উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। একটি সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৪৭-এর ১১ সেপ্টেম্বর মুন্সিগঞ্জ সাব-জেল থেকে ৮৩ জন বন্দি পালিয়ে যায়। এরা সকলেই স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিলাভ করবে বলে আশা করেছিল।[৮৯] স্বাধীনতা অর্জনকে আরো কতিপয় বন্দি মুক্তিলাভের এবং পরবর্তীতে আত্মউন্নয়নের সুযোগ বলে মনে করেছিল। ১৯৪৭-এর ১৪ সেপ্টেম্বর আজাদ পত্রিকার রিপোর্ট বলা হয়:

> ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রায় সব বন্দিই এই মুহূর্তে অনশন ধর্মঘট পালন করছে। এই বন্দিরা স্বাধীনতা উপলক্ষে মুক্তি প্রার্থনা করেছিল। তারা কায়েদ-ই-আজম এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে মুক্তির জন্য আবেদন জানায় যাতে তাদের নিজেদের চরিত্র সংশোধনের সুযোগ তারা পায়।[৯০]

স্বাধীনতাকে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল বৃটিশ শাসন সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির উপলক্ষ হিসাবে। জেলা পর্যায়ের একজন মুসলিম লীগ কর্মী আতাউর রহমান খানকে একজন প্রবীণ গ্রামবাসী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এখন যখন পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে, এরপরও কি দেশে পুলিশ, কোর্ট-কাছারি, সৈন্য-সেন্ট্রি, জেল এবং লকআপের অস্তিত্ব থাকবে?' খান উত্তর দিয়েছিলেন, 'কেন নয়? এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করবেন কিভাবে?' হতভম্ব সেই বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, 'তাহলে কোন ধরনের পাকিস্তান আমরা পেলাম? দয়া করে এর নামটি পাল্টে ফেলুন। আপনারা এর নাম দেবেন পাকিস্তান অথচ অনাচার আর দূর্নীতিকেও প্রশ্রয় দেবেন!'[৯১]

উক্ত বৃদ্ধের কাছে রাষ্ট্রীয় ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষকরে পুলিশ এবং আদালত স্বাধীনতার মূল্যবোধের অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অবশ্য এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার পেছনে বহু যৌক্তিক কারণও ছিল। পালিত লিখেছেন, 'নালিশ, সওয়াল-জবাব ও সাক্ষ্য প্রদানের সম্পূর্ণ পদ্ধতিটিই বস্তুত' ছিল গরিবের জন্য বর্জনীয়, এর কারণ খরচ, বিলম্ব, হয়রানি ও লিখিত দরখাস্ত পেশ করার আনুষ্ঠানিকতা।[৯২] ময়মনসিংহের উপজাতীয় কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ভট্টাচার্য লক্ষ্য করেছেন যে কৃষকরা প্রায়শ আদালতের মামলার মাধ্যমে তাদের জমি হারাতো।[৯৩] কিন্তু সমস্যা শুধু উপজাতীয় কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মুসলমান কৃষকরাও জমির 'ডিসপুট' সংক্রান্ত মামলায় প্রচুর অর্থ খোয়ায়।[৯৪] এই শতকের প্রথম দশকে বঙ্গীয় ব-দ্বীপের কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে পানান্দীকর লক্ষ্য করেছেন যে, কৃষিকাজে লাভের কটি বড় অংশ 'মামলা-মোকদ্দমায় নষ্ট হয়।'[৯৫] স্বাধীনতার পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান এবং নাঈমুদ্দিন আহমেদ ব্যথিত চিত্তে লক্ষ্য করেছেন যে, ঔপনিবেশিক আদালতের যাঁতাকলে পিষ্ট কৃষকরা রাস্তার ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে।[৯৬] এমনকি ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন এই মর্মে মন্তব্য করে যে, আদালতে মামলা-মোকদ্দমার কারণে অ. - ক ভাগচাষী তাদের জমি হারিয়েছে।[৯৭] আইন-আদালতের

উপর অনগ্রসর শ্রেণীর জনগণের খুব কমই আস্থা ছিল। ৩০-এর দশকের প্রথম দিকের মালদহের উপজাতি বিদ্রোহের নেতা জিতু সাঁওতাল মন্তব্য করেছিলেন, 'ইংরেজ রাজ ছিল' 'নিপীড়নকারী', কারণ 'সরকারি আদালতে বিচার পাওয়া যায় না।'[৯৮]

বিচার বিভাগের অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান পুলিশ বিভাগ ছিল সমভাবে ভীতিপ্রত। ইসলাম লিখেছেন, 'জনগণ (ঢাকা জেলার বদরপুরের) ছিল পুলিশের ভয়ে ভয়ংকরভাবে ভীত।' 'স্বাধীনতার আগে লাল পাগড়ী দেখে (ইংরেজ আমলে পুলিশ লাল পাগড়ী পরতো) জনগণ নিকটবর্তী ধানক্ষেত কিংবা ঝোপের আড়ালে পালাতো।[৯৯] পূর্ববঙ্গ পুলিশ কিমিটির রিপোর্টে বলা হয়, 'স্বাধীনতার পূর্ববর্তী প্রায় অর্ধশতকে কখনোই পুলিশ জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে নি।[১০০] পুলিশ হচ্ছে ন্যনতম বেতনভোগী চরম দুর্নীতিগ্রস্ত ও নিষ্ঠুব, সকলের অপ্রিয় হিসেবে পরিচিত এবং ইংরেজ আমলের দমন-পীড়নের মূর্তিমান প্রতীক হিসাবে স্মরিত।[১০১] পূর্বোল্লেখিত কৃষকের রাজনৈতিক প্রত্যাশা ছিল এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি।

সাধারণ মুসলমান কৃষকের আদর্শিক ভাবনায় পাকিস্তান স্থান পেয়েছে একটি নতুন নৈতিক মুল্যবোধের ভিত্তিভূমি হিসেবে, যেখানে পারস্পরিক অধিকারের এবং বিচারের নৈতিককতা সামাজিক জীবনের উপর কর্তৃত্ব করবে। সামাজিক উচ্চ শ্রেণী এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সদস্যদের দ্বারা যুগ যুগ ধরে অবদমিত হওয়ার ফলে তারা 'পাকিস্তান' নামটিকে একটি 'পবিত্র' অনুভূতির মধ্যে স্থাপন করেছিল। একজন জনপ্রিয় কবির কবিতায় যেমন বলা হয়েছে :

> 'সবসময় সত্য কথা বলো
> পাকিস্তানের মাটিতে
> পাকিস্তানের সব কিছুই পবিত্র,
> খাদ্য এবং বচন, জীবনের প্রতিটি
> দিক।
> মিথ্যাচার এবং অনাচার
> অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।'[১০২]

ঐতিহ্যগতভাবে মুসলমান কৃষকগণ যে সুপরিচিত দমন-পীড়নের শিকার হতো, তা ছিল শ্রেণীগত এবং জাতিগত বা ধর্মীয় উভয়ই। মহাজন এবং জমিদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। ১৯৪৭ সালে বাংলায় ২২৩৭টি বড় জমিদারির মধ্যে ৩৫৮টি ছিল মুসলমান জমিদারি।[১০৩] মহাজনদের অধিকাংশই জাতিতে ছিলেন বণিক ও তেলি, যারা খাতক মুসলমান জনগোষ্ঠীর নিপীড়নকারী বলে গণ্য হতেন। এরা ছিলেন ঋণ গ্রহণকারী মোট কৃষকগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশ।[১০৪] সুদের হার ছিল কম-বেশি ১২ থেকে ২৮০ শতাংশ, কখনো

কখনো তারও বেশি।[১০৫] এই শতকের প্রথম দিকে কৃষকগোষ্ঠীর দ্বারা ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ছিল নিম্নে পানান্দীকর প্রদত্ত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি হিসাব করেছেন যে, ৩৯১৮৯৪ পরিবারের মধ্যে ১৮৫.৮৬৯টি পরিবার ঋণী এবং মোট ঋণের পরিমাণ ৪৩ $\frac{২}{৩}$ লক্ষ টাকা। অনুমান করা হয়, ফরিদপুর জেলায় মোট ঋণ ছিল ২৩০ লক্ষ টাকা যা মাথাপিছু ১১ টাকা, কিংবা মোটামুটিভাবে সমগ্র পরিবারের বার্ষিক আয়ের এক পঞ্চমাংশ।[১০৬] ১৯৩৭ সালে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯ কোটি টাকা ; সালিশী বোর্ডের নিকট মামলা দায়ের করা হয় ৪ লক্ষ।[১০৭] এর বাইরে ছিল জমিদার ও তার লোকদের 'আবওয়াবের' মাধ্যমে জোরপূর্বক অর্থসম্পদ আহরণ। প্রদত্ত খাজনার বাইরে কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায় খরচ এবং জমিদারের নিযুক্ত প্রতিনিধিদের খরচ উঠাতে যে অর্থ আদায় করা হতো সেটাই আবওয়াব। তা ছাড়া বিশেষ আবওয়াব, যেমন খালবান্দি (বাঁধ খরচ), দাখিলা খরচ (খাজনা আদায় খরচ), পোল খরচ (সেতু তৈরি), ডাক খরচ, ভান্ডারী খরচ (হাট-বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় ও মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, সাদিয়ানা (জমিদারবাড়ির বিবাহ খরচ) এবং সর্বশেষ বেগার খরচ (মজুরিবিহীন শ্রম) আদায় করা হতো। ব্যক্তিগতভাবে পাবলিক ব্যবহারের অনুমতিলাভের জন্য ১০ থেকে ২৫ টাকা এবং ছাতা ব্যবহার, হাতিতে চড়া কিংবা পুকুর খনন করতে ২০ থেকে ৪০ টাকা খাজনা প্রদান করতে হতো।[১০৮] কোন কোন জেলায়, যেমন বরিশালে, আবওয়াব ছিল মূল খাজনার এক-চতুর্থাংশ কিংবা তারো বেশি।[১০৯]

মুসলমান কৃষকদের সর্বপ্রকার সামন্তবাদী বৈষম্যমূলক নিপীড়ন সহ্য করতে হতো। অবৈধভাবে উচ্ছেদ, আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড এবং জমিদারের লোকজন কর্তৃক ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা এসবেরই শিকার হতো তারা, যখন তারা খাজনা দিতে দেরি করতো অথবা জমিদারের আদেশ-নির্দেশ পালনে অস্বীকার করতো কিংবা বিদ্রোহ করতো। ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, বদরপুরে আইন অমান্যের জন্য সাধারণ কৃষককে বেত কিংবা জুতো দিয়ে পিটানো হতো, পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থাসম্পন্ন কৃষককে কেবল জরিমানা করা হতো।[১১০] নড়াইল মহকুমার জগপুর গ্রামের মুসলমান কৃষকগণ হিন্দু জমিদার দ্বারা কী ধরনের বৈষম্যমূলক কঠোর সামাজিক নির্যাতনের শিকার হতো সে বিষয়ে সিদ্দিকী বর্ণনা করেছেন:

> "সমগ্র গ্রামের জমির মালিক সাতজন জ্ঞাতিদারের (জোতদার) মধ্যে একজন মাত্র ছিলেন মুসলমান (এবং সেও একজন ক্ষুদ্র জ্ঞাতিদার)...অধিকাংশ মুসলমান ছিল হিন্দু মালিকদের জমির ভাগচাষী এবং দিনমজুর। এর সাথে হিন্দুত্বের প্রচলিত ব্যাখ্যা (মুসলমানরা নীচ শ্রেণীর হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত) মুসলমান এবং দিনমজুর এই উভয় শ্রেণীকে আরও হীন করেছিল এবং গাঁয়ের মুসলমান প্রজাদের বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যমূলক নিপীড়নের শিকারে পরিণত করেছিল:

তাদের 'ছোটলোক' (নীচ শ্রেণীর মানুষ) বলে প্রকাশ্যে সম্বোধন করা হতো,... যদি কোন মুসলমান কোন ব্রাহ্মণের বাড়ি অতিক্রম করতো, তাহলে ঐ অপবিত্র স্থানটি পানি ও গোবর ছিটিয়ে শুদ্ধ করা হতো।"

সিদ্দিকী আরো উল্লেখ করেছেন যে, একজন বৃদ্ধ গ্রামবাসী ১৯৪০ সালের একটি ঘটনা এখনো মনে রেখেছেন, যে ঘটনায় মুসলমান বালক হিন্দু জ্ঞাতিদারের আম বাগানে প্রবেশ করার কারণে জ্ঞাতিদার কর্তৃক প্রহৃত হয়।[১১১] বস্তুত সব শ্রেণীর সব কৃষকরাই মাটিতে মাদুর অথবা বেঞ্চের উপর বসতো, এমনকি অনেক জমিদার তার কাছারির (জমিদারি অফিস) পাশ দিয়ে জুতো পরে যাতায়াত করতে কিংবা জমিদারির মধ্যে ঘোড়া বা হাতিতে চড়তে অনুমতি দিতেন না। কোন কোন জমিদার আবার জমিদারির প্রজাদের কুয়া, পুকুর কিংবা পাকা বাড়ি তৈরির অনুমতি দিতেন না। হিন্দু জমিদার প্রায়শ মুসলমান প্রজাকে গরু জবাই করতে দিতেন না।[১১২] প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা আবুল মনসুর আহমদ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা সচ্ছল অর্থনৈতিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁরা ছোটবেলায় হিন্দু জমিদার ও বর্ণ হিন্দুদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এমন কিছু তিক্ত সামাজিক বৈষম্যের কথা তাঁরা তুলে ধরেছেন, যার মাধ্যমে মুসলমান প্রজাদের উপর সামাজিক নিপীড়নের মাত্রাটি কেবল অনুভব করা যায়।[১১৩] ইসলাম এবং সিদ্দিকী উভয়েই উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, এসইব ঘটনাই গ্রামীণ পূর্ববঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির পথ সুগম করেছিল।

অতীতের স্বর্ণযুগ ফিরে আসবে বলে বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'পাকিস্তান'-এর ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো। এই বিশ্বাসের প্রবক্তারা বেশ্যালয়, মদ ও জুয়ার অবলুপ্তি সাধনের আহ্বান জানাতেন এবং এজন্য ইসলামী বিধান কার্যকর করতে চাইতেন।[১১৪] মুসলিম লীগের সভা ও মিছিলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠে 'কৃষককে ভূমিদান' এবং 'ঋণের অবসান' প্রভৃতির প্রতিশ্রুতিভিত্তিক শ্লোগান।[১১৫] বলা হয় যে, যখন কলকাতার এক শ্রমিক জিন্নাহকে বলেন, 'তাঁরা (হিন্দু নেতারা) বলে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে ধনীদের জন্য, দরিদ্রদের জন্য নয়।', তখন জিন্নাহ বলেন, 'যদি বৃটিশরা বলে যায় এবং ঐ এলাকা (বাংলা) পাকিস্তানে পরিণত না হয়, তাহলে হিন্দুরা কোন দিনই জমিদারের জোয়াল থেকে মুসলমানদের মুক্তির জন্য কোন আইন সৃষ্টি করতে দেবে না।'[১১৬]

চট্টগ্রামের এক জনসমাবেশে নাজিমুদ্দিন শপথ করেন, 'যদি পাকিস্তান অর্জিত হয়, তবে আপনার সন্তান মুন্সেফ হবে, তাদের সন্তান ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ও দারোগা হবে।'[১১৭] আইয়ুব খান যিনি স্বাধীনতার পরপরই ঢাকায় কর্মরত ছিলেন, স্মৃতিচারণ করেন, 'তারা (জনগণ) ভেবেছিল [স্বাধীনতা পেলে] তাদের জীবনে আর কোন সমস্যা থাকবে না।'[১১৮] তাই এটি মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্মের পরপরই তাঁতী সম্প্রদায়ের

নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে তাদের নতুন সামাজিক স্বীকৃতি ও সামাজিক অবস্থানের উত্তরণ দাবি করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার আলোকে তারা এই দাবিকে যুক্তিযুক্ত ও বৈধ মনে করেছে।[১১৯]

গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন চলাকালে পাকিস্তান অর্জিত হয়। এ আন্দোলন হচ্ছে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন বা বর্গাচাষীদের সংগ্রাম এবং খাজনা প্রদানের জন্য টংক ও নানাকার প্রথার বিলোপ আন্দোলন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বের দশকে পূর্ব বাংলার প্রায় সমগ্র পূর্বাঞ্চল এবং আসামের অংশবিশেষ, প্রধানত সিলেট জেলা বিভিন্ন প্রকৃতি ও মাত্রার কৃষক আন্দোলনের আওতায় ছিল। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই এসব আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে । এসব আন্দোলনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভাগচাষীদের আন্দোলন, যা তেভাগার লড়াই নামে বহুল পরিচিত। উৎপাদিত ফসলের উপর জমিদারের অংশ অর্ধেকের বদলে এক-তৃতীয়ংশে নামিয়ে আনার দাবিকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন। বস্তুত সুনির্দিষ্টভাবে আন্দোলনকারী কৃষকদের এই দাবির কারণে আন্দোলনের নামও হয়েছে তেভাগার লড়াই। বামপন্থী ঐতিহাসিকদের মতে, বিভাগপূর্ব বাংলার উনিশটি জেলায় ছড়িয়ে পড়া এই আন্দোলনে ষাট লক্ষ কৃষক অংশ গ্রহণ করে।[১২০] কোন কোন ঐতিহাসিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের উপরোক্ত সংখ্যার যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।[১২১] আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের সংখ্যা সংক্রান্তএই বিতর্ক কোনভাবেই বর্গাচাষীদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের গুরুত্বকে খাটো করে না, যে আন্দোলন পরবর্তীতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রদেশের কৃষক ফ্রন্ট প্রাদেশিক কৃষকসভা কর্তৃক সমর্থিত হয় এবং এর সাহায্য লাভ করে। একজন খ্যাতনামা কৃষকসভাকর্মী এই আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, যিনি এই আন্দোলনকে এমন একটি বিরাট ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন যা গ্রামবাংলাকে আন্দোলিত করেছিল।[১২২]

এই আন্দোলন জমিদারি উচ্ছেদ কিংবা ব্যপক প্রচলিত বর্গাচাষ প্রথা ধ্বংস করার লক্ষ্য স্থির করেনি, যা ১৯৩০-এর দশকের শেষের দিকে সমগ্র বাঙলার কৃষিজমির এক-পঞ্চমাংশ এবং কৃষিভিত্তিক পরিবারের ৩৫ শতাংশের জন্য বর্গাচাষকে একটি প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থায় পরিণত করে। বর্গাচাষ, যা বর্গা নামে সমধিক খ্যাত এবং উৎপাদনের অন্যান্য পদ্ধতিসমূহের প্রসার ঘটেছিল, বিনয় চৌধুরীর বর্ণনানুসারে, 'অকৃষিকরণ প্রক্রিয়ার' মাধ্যমে। এর ফলে রায়তী জমি কমে যাচ্ছিল এবং অকৃষক শ্রেণী এইসব রায়তদের হস্তচ্যুত জমি হস্তগত করছিল। এভাবে রায়ত কমছিল, বর্গাদার বাড়ছিল। কৃষকদের ঋণগ্রহণ এবং তার ফলে মহাজন কর্তৃক জমি জবরদখল অকৃষিকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ।[১২৩] বর্গাচাষ বিষয়ে কোন রকম স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও অকৃষিকরণের এই পদ্ধতিগুলি বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও

প্রায় ভূমিহীন কৃষিমজুরকে এই আন্দোলনে টেনে আনে।

হাশেমীর মতে, জোতদার ও মহাজনসহ ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের মোকাবিলায় পরিচালিত এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও প্রকৃত কৃষকের মধ্যকার সকল মধ্যস্বত্বভোগীকে ধ্বংসের লক্ষ্য নির্ধারণ করে।[১২৪] এই আন্দোলনের প্রভাব গ্রামীণ জীবনে গণতন্ত্র চর্চার সূচনায় যে সাহায্য করেছিল তাও কতিপয় বামপন্থী নেতার দৃষ্টি এড়ায়নি, যদিও ঐতিহাসিকগণ কেবলমাত্র এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক লক্ষ্যের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।[১২৫] ভবানী সেনের মূল্যায়নে তেভাগা আন্দোলন সফল হয়েছিল; কারণ ৪০ শতাংশ ভাগচাষী ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ লাভে এবং বাকি ৬০ শতাংশ কৃষকের আবওয়াব বা ঋণের সুদ মওকুফ করাতে সমর্থ হয়। যারা তেভাগা লাভে সমর্থ হয় নি, তারাও সরকারের উপর অধিকতর চাপ প্রয়োগে ভূমিকা পালন করে, যার ফলে সরকার ন্যূনতম বর্গাচাষীদের দাবিদাওয়া অন্তর্ভুক্ত করে একটি সংসদীয় বিলের সুচনার কথা ঘোষণা করে।[১২৬] যা হোক, এটুকু অর্জন করতে প্রকৃতপক্ষে অনেক মূল্য দিতে হয়। প্রায় ৫০০০ কৃষক বন্দি এবং ৫০ জন কৃষক শহীদ হয়।[১২৭] পক্ষান্তরে একজন ভূস্বামীরও মৃত্যুদণ্ড হয়নি কিংবা কৃষক কর্তৃক তাদের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়নি। এই ধরনের দমন-পীড়ন কৃষক বিদ্রোহে প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়।[১২৮]

তেভাগা আন্দোলনের চেয়ে প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন টংক আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল মূলত উপজাতীয় কৃষকদের মধ্যে, প্রধানত ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলের হাজংদের মধ্যে। হাজার হাজার হাজং উপজাতীয় কৃষকের সমর্থিত এই আন্দোলন ৫০ মাইল দীর্ঘ এবং ১০ মাইল বিস্তৃত একটি বিশাল এলাকাব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনকারী কৃষকদের অধিকাংশ হাজং হলেও তাদের সাথে কোচ, হাদি, ডালু এবং বনাই উপজাতীয় কৃষকরাও জড়িয়ে পড়ে।[১২৯] ভট্টাচার্য এই আন্দোলন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক মুসলমান টংকদারের জড়িত থাকার কথা অগ্রাহ্য করেছেন। তবে এই আন্দোলনের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা মনিসিংহ তাঁর আত্মজীবনীতে ১৯৩৭ সালে এই আন্দোলনের শুরুতে মুসলমান কৃষকদের অংশগ্রহণের কথা স্মরণ করেছেন।

টংক পদ্ধতি এক ধরনের বর্গাচায প্রথা, যা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন ধানকরারি, ফুরর কিংবা চুক্তিবর্গা[১৩০] যেখানে উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ খাজনা হিসেবে প্রদান করতে হতো। বলা হয়, এই আন্দোলনের উৎস বর্গা প্রথার চেয়ে অধিকতর আধুনিক এবং একজন ঐতিহাসিক এই আন্দোলনকে শতাব্দীর বাঁক বলে গণ্য করেছেন।[১৩১] উৎপত্তিগতভাবেই এই আন্দোলন ছিল উত্তরপূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

যে লক্ষ্য নিয়ে টংক আন্দোলন পরিচালিত হয় তা হচ্ছে খাজনা প্রদানের মাধ্যমে টংক-এর পরিবর্তে নগদ রূপান্তর,যার পরিমাণ ছিল অনেক কম: এতে বর্গাচাষীদের উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ দেয়া হলেও তা ছিল নগদ টাকায় খাজনা প্রদানকারী সাধারণ কৃষকদের দেয় অংশের চেয়েও ৫০০ ভাগ বেশি।[১৩২] ১৯৪৭ সালে প্রতি একর টংক জমির খাজনা ছিল ৪০-৭০ টাকা; পক্ষান্তরে ঐ একই পরিমাণ জমির সাধারণ খাজনা ছিল মাত্র ৬ টাকা। প্রতি একরে টংক খাজনা ছিল ৩ মণ ৩৩ সের ধান, যা অ-টংক জমির খাজনার চেয়ে ৮ গুণ বেশি।[১৩৩] স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের বিধানসভার একজন বামপন্থী সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী এই আন্দোলনকে 'গরিব কৃষকদের উন্নতির জন্য বৈধ' বলে বর্ণনা করেছেন। টংক প্রথা বাতিলের সংগ্রামে ১৯৩৭ সালে থেকে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে ২ জন মুসলমান কৃষকসহ অসংখ্য হাজং এবং ডালু উপজাতীয় কৃষক তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।[১৩৪]

অন্যদিকে নানকার বিদ্রোহের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বর্গাচাষীর কায়িক শ্রম প্রদান প্রথার বিলোপ সাধন। এই প্রথায় এক একর জমির একজন বর্গাচাষীকে জমির মালিকের বাড়িতে মাসে পাঁচ থেকে সাত দিন বেগার খাটতে হতো; জমির মালিক ডাকা মাত্রই কৃষক তার স্বীয় প্রয়োজন-অপ্রয়োজন নির্বিশেষে কাজ করতে বাধ্য হতো। নানকার জমির উপর বর্গাচাষীর কোন অধিকার ছিল না।[১৩৫] নানকার কৃষকের প্রাত্যহিক নির্দেশিত কাজ এত বেশি ছিল যে সেই কাজ করতে তার পুরো পরিবারকে শ্রম দিতে হতো, অন্যদিকে তার নিজস্ব যে ছোট্ট এক টুকরো জমি থাকতো, যা দিয়ে তার পুরো পরিবারের বাৎসরিক ভরণপোষণ চলতো, তার খুব কমই পরিচর্যা সে করতে পারতো, ফলে তার উৎপাদন কমতো।

জমিদারের কাজ না করলে শারীরিক নির্যাতন ছিল সাধারণ বিষয় এবং সময় নষ্ট করার জন্য সময় পুষিয়ে নিতে আরো অনেক বেশি কাজ দেওয়া হতো। জমিদার কিংবা জমিদারবাড়ির পুরুষ সদস্যদের দ্বারা প্রায়শ নানকারদের স্ত্রী এবং যুবতী মেয়েরা যৌন নির্যাতনের শিকার হতো এবং এই অবস্থা নিরসনে ব্যক্তিগত কিংবা দলগতভাবে প্রতিরোধ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এই ধরনের প্রতিরোধের জন্য চরম মূল্য দিতে হতো–বাস্তুচ্যুত করা থেকে জমিদারের 'গুণদাস'কর্তৃক হত্যা পর্যন্ত। ১৯৪৬ সাল ও ১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে এই বর্বর প্রথা সিলেট জেলার অধিকাংশ গ্রাস করে। ত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই জেলার জনসাধারণের ১০ শতাংশ এই আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন প্রদান করে।[১৩৬]

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে কৃষক বিপ্লবের 'ভূমি ও খাজনা' প্রশ্নটি পর্যায়ক্রমে প্রশমিত করে পরে একেবারেই খারিজ করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি এবং

বঙ্গবিভাজন কমিউনিস্ট কর্মীদের মতানুসারে কৃষকদের, জমিদার ও রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সঙ্গে বিরোধিতা থেকে সরে আসার মূল কারণ ছিল। সক্রিয় কৃষক কর্মীরা এবং কৃষকসভার সদস্যগণ বিশ্বাস করতো, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া অপ্রয়োজনীয়। তারপর প্রত্যাশা ছিল যে, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাদের দাবি মেনে নেবে। এমনকি ভাগচাষীদের আন্দোলনের ওপর সাম্প্রতিক লেখালেখিতেও তার সাক্ষ্য মেলে। কুপার বিশ্বাস করেন, এ ধরনের প্রত্যাশা তেভাগা আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল।[১৩৭]

মুসলিম লীগের নেতৃত্ব খোলাখুলিভাবে জনসমক্ষে কথা দিয়েছিল যে, তারা জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটাবে এবং অন্যান্য কৃষি বিষয়ক সংস্কার সাধন করবে। কতিপয় প্রধান আঞ্চলিক নেতা কৃষকদের প্রত্যাশার পরিমাণকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিলেন। গিয়াসুদ্দিন পাঠান ময়মনসিংহের একজন অন্যতম লীগ নেতা শোনা যায়, মুসলমান ভাগচাষীরা, যারা কৃষকসভার সাংগঠনিক নেতৃত্বে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, তেভাগার পিছনে তাদের সময় ও শ্রম ও অপচয় করা উচিত নয়; যেহেতু পাকিস্তানের অভ্যুদয় আর বেশি দূরে নয়, তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের পুরোটাই অর্থাৎ চৌভাগই পাবে। মনি সিংহের ভাষ্য অনুযায়ী, এ কথায় যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হয়। কৃষকরা জমিদারদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত শস্য ফিরিয়ে দিল।[১৩৮] বস্তুত মুসলিম লীগ ভাগচাষীদের দাবিদাওয়া মেটানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল, যা গ্রামীণ পরিবর্তনসূচক পদক্ষেপ হিসেবে বিরেচিত হতে পারে।

১৯৪৭-এর ২২ জানুয়ারি 'দি বেঙ্গল বর্গাদার বিল', যা অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র প্রদেশে তেভাগা পদ্ধতি উপস্থাপন করতো, কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই বিল খুব ফলপ্রসুভাবে বিক্ষোভ প্রশমিত করে। যদিও প্রতিক্রিয়ার তারতম্য ঘটে, তবে মোদ্দা কথা এই যে, আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি আন্দোলনের প্রচণ্ডতাকে থিতিয়ে দেয়।[১৩৯] ভাগচাষীদের বিল কৃষি ব্যবস্থায় এক ধরনের প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে এবং একই সাথে আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে আশা ও ভীতির জন্ম দিয়েছে। এই বিলটি মুসলমান কৃষকদের নিকট মুসলিম লীগের ভাবমূর্তিকে অনেক উঁচু করে তোলে, যদিও বিলটি পাশ করানোর জন্য কার্যকর কিছুই করা হয়নি। এমন কথাও বলা হয়ে থাকে যে, খাজা নাজিমুদ্দিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক পর্যায়ের মুসলিম লীগ নেতা ব্যক্তিগত পর্যায়ে জমিদারদের সথে যোগাযোগ করে তাদের স্বার্থ-পুরোপুরি সংরক্ষণের আশ্বাস দিয়েছিলেন।[১৪০] একটি জাতীয় সরকারের সম্ভাবনা সিলেট জেলায় নানকারদের চলমান সক্রিয় আন্দোলনে ছেদ ঘটায়। অজয় ভট্টাচার্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মীরাও স্বীকার করেন যে, সিলেটের সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা এবং ধারণা ছিল যে, নানকার সংকট আপোসের মাধ্যমেই সমাধান

করা হবে, যদি জনগণ পাকিস্তানের প্রতি তাদের সমর্থন অটুট রাখে।[১৪১]

এই একই সম্ভাবনা হিন্দু নানকারদের মধ্যেও হতাশার সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি আরো বেশি জটিল হয়ে ওঠে যখন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা পাকিস্তানের জন্মের পরই তড়িঘড়ি করে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। এঁদের কাছ থেকে অল্প হলেও যে সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল, তা তখন আর থাকলো না।[১৪২] একজন কৃষকসভাকর্মী হাজী মোহাম্মদ দানেশ বলেন যে, হিন্দুরা ভেবেছিল মুসলমানদের দেশ পাকিস্তানে তারা অসহায় হয়ে পড়বে।[১৪৩] হিন্দু ও মুসলমান নানকারদের মধ্যে একটি পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে পাকিস্তান অথবা ভারতের অংশ হওয়ার প্রশ্নে সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়, যা সহজে পরিণত হতে পারতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। এরই সাথে যুক্ত হলো করিমগগঞ্জ থানার বিভাজন, যা ছিল আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল এবং এর ফলে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সৃষ্টি হলো অনিশ্চয়তা।[১৪৪]

সাত

পাকিস্তানের জন্ম হয় দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত সময়ে। তারপরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, মুসলমান কৃষকরা তাদের হিন্দু ভাইদের মতো সেই সময়ে দেশত্যাগ করেনি একটি স্বাধীনতা রিপোর্টে বলা হয় 'পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে। মুসলমানরা প্রত্যাশা করে, দ্রব্যমূল্য নেমে আসবে। তারা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ নিয়ে ততোটা চিন্তিত নয়। তারা তাদের দেশ ত্যাগ করেও চলে যাবে না।'[১৪৫] একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী আবদুস শহীদ স্মরণ করেন কিভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হয়ে বহু মানুষ আশান্বিত হয়, যখন প্রকৃত অর্থে তাদের সামনে ছিল আসন্ন দুর্ভিক্ষের আশংকা।[১৪৬] রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে চট্টগ্রামের এক পল্লীগায়ক গেয়েছেন:

> ১৯৪৩ সালে সাম্রাজ্যবাদের পীড়নে,
> অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক দিয়েছে জীবন
> এইবার মোদের স্বাধীন রাষ্ট্র দুর্ভিক্ষের অন্নকষ্ট
> ঘুচাইয়ে শান্তিরাজ্য কর ভাই স্থাপন।[১৪৭]

১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর থেকেই মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বাসভূমির ছবি এঁকেছেন। এমন হবে সে দেশ যেখানে দরিদ্র কৃষকের দু'বেলা দু'মুঠো খাদ্য পাবার স্বপ্ন সত্যি হবে।[১৪৮] মহা দুর্ভিক্ষের পর 'বিপর্যয় পরবর্তী ইউটোপিয়ার' প্রেক্ষিতে জনগণের কাছে দু'মুঠো 'ভাত' পাওয়াই হয়ে দাঁড়ায় পরিপূর্ণতার প্রতীক। Greenough-এর মন্তব্য অনুসারে, বহু কৃষকের জন্য অন্নের সংস্থানই হচ্ছে তার স্বাধীনতা।[১৪৯] লীগ কর্মীরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এইসব বাস্তব দুর্দশাকেই তাদের রাজনৈতিক প্রচারণার বিষয় করে

তুলেন। সাধারণ মুসলমান কৃষকদের আশাবাদ এবং পাকিস্তান-কেন্দ্রিক প্রত্যাশা নিঃসন্দেহে পূর্ব বাংলার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী অনুভূতির প্রতিফলন। তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে সবদিক দিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয়তাবাদ হতে পারতো নিতান্তই একটি উচ্চবর্গীয় চিন্তাভাবনা। কেননা মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয়তাবাদ ছিল বহু বিপরীত পরিস্থিতির একটি, যা দরিদ্রকে আন্দোলনে নামতে বাধ্য করেছিল।[১৫০]

ইসলাম ধর্ম স্বয়ং এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত সাম্যবাদী জাতীয়তাবাদ[১৫১] একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত হলো, বিশেষত যখন নিপীড়ক শক্তিকে উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিপীড়ক শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে দেখানো হয়েছিল। ইসলাম দৈনন্দিন রাজনীতিতে সেই সময় এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ দাবিসমূহও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ দ্বারা ঈষৎ রঞ্জিত হতো। '৫০-এর দশকের সদ্য গঠিত বাংলা ভাষা কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ ইসলামের সংগঠন ও বাণী থেকে এর বহু ধারণা ও উদাহরণ গ্রহণ করেছিল। এই জাতীয়তাবাদের প্রথম দিককার লেখায় নতুন রাষ্ট্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের প্রসঙ্গ ও উদাহরণ টেনে আনা হয় এবং তাঁর মতোই একটি আদর্শ সমাজ অর্জন ও প্রতিষ্ঠার কথা তুলনামূলকভাবে কেউ কেউ লিখেছেন 'কখন আমরা হযরত ওমরের মতো একজন আদর্শ শাসক পাবো? কখন সেই চার খলিফার যুগের আবার পুনরাবির্ভাব ঘটবে?'[১৫২]

মুসলিম লীগের এই প্রচারণা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছিল, কারণ তা মুসলমান কৃষকদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আনুগত্যের সাথে সামঞ্জপূর্ণ ছিল।[১৫৩] লীগ তার প্রচার কার্যক্রম চালাতো সামাজিক আনুষ্ঠানিক সমাবেশগুলির মধ্যে, যেমন জুম্মার নামাজ, মিলাদ মাহফিল, ওয়াজ ও ঈদের জামাত প্রভৃতি। এভাবেই সামাজিক জীবনকে রাজনীতির সাথে যুক্ত করে মুসলিম লীগ ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আনুগত্যকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করলো, যা কখনো সাম্প্রদায়িক আন্দোলন এবং কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্যোতক প্রতীকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে।[১৫৪]

সংক্ষেপে এই হলো বাংলার মুসলমান জনগণের নিজেদের পৃথক বাসভূমি অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রামের পথে তাদের বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও শ্রমলব্ধ অবদানের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট। স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুসলিম লীগ স ের্কে মোহমুক্তি সম্পর্কে ধারণালাভের জন্য মনে রাখা প্রয়োজন জনগণের সে সময়কার প্রত্যক্ষ আশা ও প্রত্যাশার কথা, যা প্রাথমিক পর্যায়ে লীগকে ক্ষমতাসীন করার ক্ষেত্রে কার্যকর শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল।

তথ্য নির্দেশিকা

১ আসহাব উদ্দীন আহমদ, *আসহাবুদ্দীন রচনা সংগ্রহ*, ৩য় খণ্ড (চট্টগ্রাম ১৯৮২),৫৫।

২ তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী, সংকলিত, বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে কতিপয় দলিল*, (ঢাকা ১৯৮৪)।

৩ ঐ।

৪ *The Statesman*, 15 August 1947. Calcutta

৫ হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *আলতাফ মাহমুদ* (ঢাকা ১৯৮২), ৭।

৬ *The Statesman*, 15 August 1947.

৭. Provash Chandra Lahiry, *India Partitioned and Minorities in Pakistan* (Calcultta, 1964), 1

৮. সত্যেন সেন, *বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম*, (ঢাকা ১৯৬৪), ৫৭।

৯ প্রমথ গুপ্ত, *মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী*, কলকাতা ১৯৮২, ৮৮।

১০ *ডায়েরী*, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সম্পর্কে মন্তব্য, দলিল।

১১. L F Rushbrook Williams, *The State of Pakistan* (London 1962), 35 : Adrienne Cooper. *Sharecropping and Sharecroppers' Struggle in Bengal 1930-50*, Unpublished Ph.D.Thesis London University, 1984.

১২. Mustaq Ahmed, *Politics without Social Change* (Karachi 1971), 3.

১৩ M A Jinnah 'Presidential Address to Constituent Assembly of Pakistan' no 11, August, 1947 দ্র. Jamiluddin Ahmed (ed)., *Speeches and Writings of Mr. M A Jinnah*, Vol 2 (Lahore 1964), 402.

১৪ *East Bengal Legislative Assembly Proceedings*, Vol 1, No 3, p.7,from now on EBLA. progs.

১৫ Cive Y Thomasm, *The Rise of the Authoritarion State in Peripetal Societies*, (New York, London 1984), 97.

১৬ *ডায়েরী, দলিল*।

১৭. তালিম হোসেন, 'পাক ওয়াতন' উদ্ধৃত, সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা ১৯৮৩), ১৭২।

১৮. Kalim Siddique, *Conflict, Crisis and War in Pakistan* (London 1972), 54.

১৯. Abul Mansur Ahmed. *End of a Betrayal and Restoration of Lahore*

Resolution (Dacca 1975), 1565-8.

২০ .Begum Saistha Ikramullah, ***From Purdah to Parliament*** (London 1963), 158; A B M Habibullah, 'Plassey to Pakistan', Statesman, Independence Day Supplement, 15 August 1947, Calcutta.
আরও দেখুন, সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, মাসিক মোহাম্মদী নং ৭, ৯, ১০, ১১, ২০ বর্ষ, ৫৭৭, ৭৯৬, ৮৮১, ৫৮৯, ৯১৯ কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩৫৪

২১. বিস্তারিত দ্র Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal* (New Delhi 1976), and sirajuddin Hussain, *Look into the Mirror* (Dacca 1974); Kamruddin Ahmad, *Social History*, আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা।

২২. দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ এফ. ই. জুকভ পাকিস্তান কনসেপ্টের অনেক রকম অর্থ লক্ষ্য করেছন; দেখুন D Overstreet and Windmiller, *Communism in India*, (Barkeley 1959), 254.

২৩. সাঈদ-উর-রহমান, *রাজনীতি ও কবিতা*।

২৪. Benedict O'Gorman Anderson. 'A Time of Darkness and a Time of Light, Transposition in Early Indonesian Natinalist Thought' in Anthony Reid and David Marr (eds.) *Perceptions of the East in South -Asia* (Singapore 1979), 247.

২৫. Barbara Metcalf.'The Case of Pakistan.', in Peter Herke land Ninian Smart (eds) *Religion and Nationalism in the Modern World* (New York, 1983), 107.

২৬. Ayesha Jalal. The Sole Spokesman(Cambridge 1985), 293.

২৭. Kamruddin Ahmed, *The Social History of East Pakistan* (Dacca n. d.), 89.

২৮. Chaudhry Mohammad Ali, *The Emergence of Pakistan* (New York and London 1967), 203-221; Abul Mansur Ahmad, *Amar Dekha*, 257.

২৯. Kamruddin Ahmad, *Sicial History*. 96.

৩০. Paul R. Greenough made this observ 'ion in his *Prosperity and Misery in Modern Bengal . The Famine of 1943-1944* (New York 1982), 8.

৩১. *Eastern Pakistan through Six Months of independence*.East Bengal Government Press. from now GOEB, 1948, 5, 29.

৩২. দ্রষ্টব্য, Metcalf, 'Pakistan', 17C

৩৩. Mount Batten's Address to the Indian Constituent Assembly at New Delhi, 15 August 1947, taken from Ayesha Jalal, *Spokesman*,293.

৩৪. Khalid B. *Sayeed, Pakistan : The Formative phase* (Karachi 1960), 102

৩৫. Lawrence Ziring, 'TheFailure of Democracy in Pakistan : East Pakistan and the Central Government 1947-1958', unpublished Ph.D. thesis, Columbia University, 1962, 10

৩৬. EBLA progs, Vol 1, No 3, 39

৩৭. ঐ, Vol, 3, 143.

৩৮. Fishery Bundle, B-progs. Sept. 1953, Nos. 461-472.

৩৯. *The Dacca Gazzette*, 22 Nov., 1951, Parti, Dacca, 1225.

৪০. *East Pakistan Forges Ahead,Homes Political Bundle*

৪১. Nafis Ahmad, *An Economic Geography of East Pakistan* (London 1958).

৪২. *Eastern Pakistan,* 30-32.

৪৩. East Bengal Province, Home Police, B-progs, June, 1951, No. 102.

৪৪. ঐ, ৬.

৪৫. দ্রষ্টব্য, *Eastern Pakistan,* East Pakistan Forges Ahead, GOEB.

৪৬. Abdur Razzaq, *Bangladesh : State of the Nation* (Dhaka 1981), 7.

৪৭. *East Pakistan*, 3.

৪৮. Abdus Salam, 'My Faith as an Editor'. *Pakistan Day Supplement, Pakistan Observer,* 15 August 1966, as quoted in D N Banerjee, *East Pakistan, A Case Study in Muslim Politics* (Delhi, 1969) 46.

৪৯. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলা ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৫, ৯।

৫০. Greenough, *prosperity,* 254

৫১. *Eastern Pakistan,* 1.

৫২. *East Pakistan Forges Ahead,* Home Political Bundle, 1.

৫৩. Taya Zinkin, *Reporting India* (London, 1962), 40.

৫৪. *The statesmen,* 9 March 1948, Calcutta.

৫৫. *East Pakistan Forges Ahead, 3–4*, Emphasis mine.

৫৬. Muhammad Ayub Khan, *Friends not Masters : A Political Autobiography* (London, 1967), 22-23.

৫৭. Colonel Mohammad Ahmad, *My chief* (Lahore 1960), 6-7.

৫৮. Humayun Kabir, *Muslim Politics. 1906-47 and Other Essays*

(Calcutta 1969) 94

৫৯. দ্রষ্টব্য, Habibullah Bahar's speech in EBLA, progs. Vol, 1, No, 4, 26

৬০. Talukder Maniruzzaman, 'National Intergration and Political Development in Pakistan', *Asian Survey*, December 1967, Vol, 7. No. 12.

৬১ Keith Callard, 'The Political Stability of Pakistan'. *Pacific Affairs*, Vol, xxix, No, 1.1956, 8.

৬২. Rafiuddin Ahmed, *Bengal Muslim, 1871-1906* (Delhi 1981). xxii

৬৩. Speech by Manjurul Huq, Chairman, Reception Committee of Sub divisional Muslim League Conference held on 4 May 1947, Umar (ed).), Delhi, 19.

৬৪ কামরুদ্দিন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ২য় খণ্ড, ১৯৭৫, ৯০। ব্যানার্জী বঙ্গবিভাগের দরুণ বাঙালি মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের হতভম্ব দশাব বিবরণ দিয়েছেন অতিরঞ্জিতভাবে। সম্ভবত

তাদের কিছু অংশের বেলায় একথা আংশিকভাবে সত্য ছিল। দেখুন, D N Banerjee, *East Pakistan* (Delhi 1969).45.

৬৫. ঐ, 21

৬৬. P C Joshi, 'They Must Meet Again'. Bombay, Sept. 1944, 7, as cited by Shri Prakash in 'CPI and the Pakistan Movement', in Bipin Chandra (ed), *The Indian Left* (Delhi 1983)

৬৭. আবদুস শহীদ, *আত্মকথা*, ১ম খণ্ড (ঢাকা ১৯৮৪), ১৪৬। আরও দেখুন, আবদুল মতিন, *মওলানা হামিদ খান ভাসানী প্রসঙ্গ*, সংকলিত শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম* (ঢাকা ১৯৭৮), ১৪৭।

৬৮. সরদার ফজলুল করিম, *নানা কথার পরেব কথার*, ঢাকা,৫।

৬৯. ধনঞ্জয় দাস, আমার জন্মভূমি স্মৃতিময় বাংলাদেশ, (কলকাতা ১৯৭১), ১৩।

৭০ আবদুস শহিদ, *আত্মকথা*, ১ম খণ্ড (ঢাকা ১৯৮৪), ১৪৮।

৭১ নুকুল মল্লিক, *আমার জীবন ও ডুমুরিয়ার কৃষক আন্দোলন* (ঢাকা ১৯৮০), ৩৪।

৭২. অমল সেন, *নড়াইল তেভাগা সংগ্রামের সমীক্ষা* (ঢাকা ১৯৮০), ৩৪।

৭৩. Lahiry, India Partitioned, 2-3

৭৪. Letter from S. Bhattacharya, President Hindu Sevak Sangha, Sylhet, on 7 October, 1947, Home Political Bundle Bangladesh Secretariat Recor ' Room, Dhaka.

৭৫ .জ্ঞান চক্রবর্তী, *ঢাকা জিলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ* (ঢাকা ১৯৭২), ১৩১, আরও দেখুন, সত্যেন সেন, *মনোরমা মাসীমা* (ঢাকা ১৯৭০), ১২৭।

৭৬. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ* ২য় খণ্ড (ঢাকা) ১৪৭।

৭৭. Jail Bundle, B-progs, February, 1956, Nos 1-18.

৭৮. ঢাকায় হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৫৯% এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ঢাকার ধন-সম্পদের ৮৫%-এর মালিক।

৭৯. হিন্দু রাজনীতির এই দিক সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, Muhammad Golam Kabir, *Minority politics in Bangladesh* (Delhi 1980).

৮০. ঐ Jogen Mondol's letter of Resignation, Appendix v.

৮১. শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), *জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম* (ময়মনসিংহ ২ ১৯৬৮), ৩৬১।

৮২. Home Political Bundle, B-progs, October, 1950, No. 516

৮৩. গারো সম্প্রদায় সম্পর্কে আরো জানার জন্য দেখুন, Pieree Bassaignet, 'Tribes of the Northern Border of East Pakistan' in Bassaignet (ed.) *Social Research in East Pakistan* (Dacca 1960), 150-52, also Gautam Bhadra, *'Paglai Dhum' · Mymensingher Krishak Bidroho, in Saradiya Anustupa,* (Calcutta 1986).

৮৪. *ডায়েরী দলিল*।

৮৫. Lahiry, *India Partitioned,* 1.

৮৬. ১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুসারে প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে কেবল ৯৯ জন শহরের বাসিন্দা ছিল। দেখুন, Nafis Ahmad, Statesman, 15 August 1947, *Supplement,* Calcutta.

৮৭. *ডায়েরী, দলিল*।

৮৮ Lahiry, India Partitioned, 1.

৮৯. Jail Bundle, B-progs, February 1956 Nos. 1-18.

৯০. *আজাদ,* ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ কলকাতা।

৯১ আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর* (ঢাকা ১৯৪৭), ৪৫।

৯২. Chittabrata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society* (Calcutta 1975), 81.

৯৩. Jnanbrata Bhattacharyya, 'An Examination of Leadership Entry in Bengal Peasant Revolts 1937-1947', *Journal of Asian Studies,* August, 1978, Vol xxxvii, No. 4, 626.

৯৪. উমর, *দলিল*,৭৭।

৯৫. S G Panandikar, *The Wealth and Welfare of the Bengal Delta* (Calcutta 1926), 150.

৯৬. শেখ মুজিবুর রহমান এবং নাইমুদ্দিন আহমেদ, *পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভাগা জনসাধারণ* (ঢাকা ১৯৪৮), ২।

৯৭. R K Mukherjee, *Dynamics of a Rural Society* (Berlin 1957), 30.

৯৮. Tanika Sarkar, 'Jitu Santal's Movement in Malda, 1924-1932: A Study in Tribal Protest' in Ranajit Guha (ed.) *Subaltarn Studies*, Vol. iv (Delhi 1985), 159.

৯৯. A K M Aminul Islam, *Bangladesh Village Confict and Cohesion* (Cambridge, Massachusetts 1974), 104.

১০০. Report of the East Bengal Police Committee, 1953, East Bengal Government Press, Dhaka, 1954, 5

১০১ Tanika Sarkar, 'National Movement and Popular Protest in Bengali 1928-1934', Unpublished ph,D. Thesis, Delhi University, 1980.

১০২ কাজী আবুল হোসেন, *জিন্নাহনামা* (ঢাকা ১৯৬১) (পরিবর্ধিত সংস্করণ), ৯০।

১০৩. D N Wilber, Pakistan : Its People, Its Society, Its Culture (New Haven 1964), 219.

১০৪. কে. এম শমসের আলী, *প্রশাসনিক সংস্কারের সরকারী কর্মচারির ভূমিকা*, নিলুফার বেগম সম্পাদিত, *স্মৃতিচারণ প্রবীণ প্রশাসকের অভিজ্ঞতা*, (ঢাকা ১৯৮৪), ৭৯।

১০৫. দেখুন, Hashmi, Thesis, 40.

১০৬. দেখুন, Panankiar, *The Wealth and Welfare*, 181

১০৭. EBLA, progs, Vol 1, No. 3, 34..

১০৮. Panandikar, *The Wealth and Welfare*, 102.

১০৯. Hashmi, thesis, 31.

১১০. Aminul Islam, *Bangladesh village*, 99.

১১১. Kamal Siddiqi, *The Political Economy of Rural Poverty in Bangladesh* (Dhaka 1983), 257

১১২.. Hashmi, Thesis, 53.

১১৩. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা*, ১৪; চৌধুরী কুদরাত-ই-গণি, *উন্নয়ন ও আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি;* সংকলিত, নিলুফার বেগম (সম্পা.) *স্মৃতিচারণ* (ঢাকা ১৯৮৪); কামরুদ্দিন আহমদ, *আত্মবিকাশ*. ১ম খণ্ড ৭০।

১১৪ EBLA, progs, Vol, 1, No, 3, 155 also Umar (ed.), *Dalil*, 35

১১৫. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা*, ২৮৪।

১১৬. Sirajuddin Hossain, *Mirror*, 1.

১১৭. সাঈদ-উর-রহমান *রাজনীতি ও কবিতা*, ১০।

১১৮. Ayub Khan, Friends, 79.

১১৯. Home Pol. Bundle Memo No. 60: This may help answer the question which Partha Chatterjee raises, as to whether the demand for Pakistan was 'anything more specific than their desire to free themselves from zamindar domination'. see Partha Chatterjee, *Bengal, 1920-1947, Vol I Land Question* (Calcutta 1984), 171.

১২০. আবদুল্লাহ রসুল, *কৃষকসভার ইতিহাস* কলিকাতা ১৯৬৯, ১৫৪।

১২১. Hashmi, Thesis, 308; Also Jnanbrata Bhattacharyya, 'Leadership Entry'.

১২২. ভবানী সেন, *বাঙ্গালী তেভাগা আন্দোলন, তেভাগা স্মারক* (কলিকাতা ১৯৭৩), ৫।

১২৩. Jnanbrata Bhattacharyya. 'Leadership Entry', 625.

১২৪. Hashmi, Thesis, 315

১২৫. অমল সেন, *নড়াইল তেভাগা*, ১০৯: বানী দাসগুপ্ত, *তেভাগার লড়াইয়ে কৃষক মেয়েদের ভূমিকা, তেভাগা স্মারক*।

১২৬. ভবানী সেন. *স্মারক*, ১৫।

১২৭. ঐ, ৪-৫।

১২৮. দেখুন Ranajit Guha, *Elementary Aspect of Peasant Insurgency in Colonial India* (Delhi, 1983). Chapter on *Negation*,

১২৯. Janabrata Bhattacharyya, 'Leadership Entry', 612.

১৩০. মনি সিং, *জীবন সংগ্রাম*. ৪৬।

১৩১. Binay Bhushan choudhury, 'The Process of Depeasantisantion in Bengal and Bihar, 1885-1947', *India Historical Review*, ii, i, 1975, 105-165, 146-52.

১৩২. Sunil Sen, *Agrarian Struggle in Bengal*, 1946-47 (New Delhi 1972), 78.

১৩৩. উমর, *ভাষা আন্দোলন*, ২য় খণ্ড, ৬০-১।

১৩৪. উমর, ভাষা আন্দোলন, ২য় খণ্ড, ৬০১।

১৩৫. *Cross Roads*, 1 Sept. 1950, As cited in Yu V Gankovosky and L R Gordon, polonsky. *A Histroy of Pakistan* (Lahore, n,d,), 141.

১৩৬. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ*, ২য় খণ্ড, (ঢাকা) ২৩৪।

১৩৭. Adrienne Cooper, Thesis, 375.

১৩৮. মনি সিং. *সংগ্রাম* ৯৭।

১৩৯. Cooper, Thesis. 376.

১৪০ কামরুদ্দিন আহমদ. *আত্মবিকাশ* ১ম খণ্ড, (ঢাকা ১৯৭৫). ১১৬-৭।

১৪১. অজয় ভট্টাচার্য. *নানকার* ২য় খণ্ড, ১৬৭।

১৪২. ঐ, ২৫১।

১৪৩. Cooper. Thesis. 380.

১৪৪. অজয় ভট্টাচার্য. *নানকার*. ২য় খণ্ড. ২৪৩।

১৪৫. উদ্ধৃত. উমর. *ভাষা আন্দোলন*. ২য় খণ্ড. ৫।

১৪৬. আবদুস শহিদ. আত্মকথা ১৩৭।

১৪৭. পূর্ণেন্দু দস্তিদার. কবিয়াল রমেশ শীল, (ঢাকা ১৯৬৩), ৪৯।

১৪৮. Humaira Momen, *Muslim Politics,* 57; Shila Sen, *Muslim Politics,* 80-83; উমর, *দলিল,* ৭৭-৭৯।

১৪৯. *Greenough, Prosperity,* 228.

১৫০. ঐ, Chapter 4.

১৫১ গেলনার ইসলামকে প্রচ্ছন্ন সাম্যবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন। দেখুন, Ernst Gellner, *Nations and nationalism* (England 1993), 17.

১৫২. শেখ মুজিবুর রহমান এবং নাইমুদ্দিন আহমেদ, *দুর্ভাগা জনসাধারণ*. ৭।

১৫৩. দেখুন, Rafiuddin Ahmed, *Bengal Muslims*, কামরুদ্দিন আহমেদ, আত্মবিকাশ ২য় খণ্ড, ৪৯।

১৫৪. দেখুন. Partha Chatterjee, Agrarian Relations and Communalism in Bengal, 1926-35 Ranajit Guha (ed.) *Subaltern Studies ;* Vol. 1, Delhi, 1982, also for a fine treatment of this aspect in UP politics see Gyan Pandey. 'Rallying Round the Cow', *Ibid,* Vol. 2, Delhi, 1983, also Hashmi, Thesis, 44.

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ

আবদুল মতিন

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজ কর্তৃক এই উপমহাদেশ দখল হওয়ার সময় থেকে এই উপমহাদেশে পুঁজিবাদের এবং তার সাথে আধুনিক জাতি সত্তার বিকাশ ঘটতে থাকে। কিন্তু বিদেশী পুঁজিবাদের শাসন-শোষণের কারণে এই উপমহাদেশে পুঁজিবাদের মতই জাতি সত্তার বিকাশও গুড়িয়ে যেতে থাকে। ফলে জাতি সত্তার ও পুঁজিবাদের এই রকম ধীর ও দুর্বল বিকাশের কারণে জাতি সত্তার ভিত্তির পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ঐ উপমহাদেশে যে দুটি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের উদ্ভব ঘটেছিল সে দুটো রাষ্ট্রের চরিত্রও জাতি ভিত্তিক না হয়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এ ছাড়া ঐ রাষ্ট্র দুইটির মূল উপাদানও হয়ে দাঁড়িয়েছিল -আধা স্বাধীন তথা আধা উপনিবেশিক এবং অর্থনীতিগতভাবে আধাপুঁজিবাদী তথা আধা সামন্তবাদী।

এই উপমহাদেশে জাতি ও ভাষার যতটুকু আন্দোলন সংগ্রাম ও বিকাশ হয়েছিল তার সর্বোচ্চ ঘটেছিল বাংলা প্রদেশে কোলকাতা কেন্দ্রিক ভাবে। পূর্ব বাংলা ভিত্তিক পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর বাঙালী জাতি ও তাদের ভাষা বাংলা আন্দোলনের মূল স্থান হয়ে দাঁড়ায় পূর্ব বাংলা।

লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বের মুসলমান গরিষ্ঠ বাংলা ও আসাম প্রদেশ এবং উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাব, সিন্ধু ও ফ্রন্টিয়ারের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে নিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে।

এই প্রস্তাবের কোথাও লিখিতভাবে জাতি সত্তার উল্লেখ মাত্রও ছিল না। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীরা লাহোর প্রস্তাব বলতে মুসলমানদের রাষ্ট্রই বুঝেছিল এবং তারা তাই চেয়েছিল। তবু লেখা জোখা বা কথা বার্তায় বলা না থাকলেও দুইটি মুসলমান প্রধান অঞ্চলের দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠনের লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে দুইটি রাষ্ট্রের গন্ধ প্রকারান্তরে

আবদুল মতিন ঃ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের রূপকার, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি'র পলিটব্যুরো'র সদস্য

থাকাতে অন্তত বাঙালী মুসলমানরা প্রধানত কৃষক হওয়ার কারণে সেইভাবে বুঝেছিল এবং মুসলমানদের আঞ্চলিক রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের জাতির স্বার্থ দেখেছিল বা তা ছিলও। যার জন্য বাঙালী মুসলমানরা এত দৃঢ়ভাবে ও কৌশলগতভাবে মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছিল।

এই সব কিছু মিলে ১৯৪৫ সালে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে মোট তিরিশটি আসনের মধ্যে তিরিশটিই এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে সর্বাধিক মুসলমান আসনের প্রদেশ বাংলাদেশের মুসলিম লীগ শতকরা সাতানব্বইটির বেশি এবং সমগ্র উপমহাদেশে একটি প্রদেশ ছাড়া আর সবগুলি প্রদেশে শতকরা ৫০% এর বেশি আসন লাভ করেছিল। এই ফলাফল দৃষ্টে মুসলিম লীগে এবং কংগ্রেসেরও বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে এত বিশাল ভাবে উপমহাদেশের মুসলমানদের সমর্থিত পাকিস্তান অপ্রতিরোধ্য।

এইটা বুঝে মুসলিম লীগ তাদের পার্টির টিকিটে নির্বাচিত সকল কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রাদেশিক সদস্যদের দিল্লীতে ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে এক সম্মেলন আহ্বান করে। সেখানে মুসলিম লীগের মুখপাত্র হিসাবে জিন্নাহ সাহেব লাহোর প্রস্তাবের দুইটি অঞ্চলের দুইটি রাষ্ট্র গঠনের কথাকে ছাপার ভুল বলে 'দুইটি রাষ্ট্র' কথাটিকে বাদ দেয়।

এইভাবে লাহোর প্রস্তাবে যে ক্ষীণ জাতি সত্তার ইঙ্গিত ছিল তাকে সমূলে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। বাংলার প্রতিনিধিরা কিছুটা সাম্প্রদায়িক মন মানসিকতার কারণে, কিছুটা আম ও ছালা দুটোই হারাবার আশংকায়, দুই একজন, বিশেষ করে বাংলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বাদে সকলে সেদিন লাহোর প্রস্তাবের মৌলিক পরিবর্তনে নিশ্চুপ ছিলেন। এইভাবে উপমহাদেশের মুসলমানদের লাহোর প্রস্তাবের ভেল্কিবাজী দেখিয়ে লাহোর প্রস্তাবকে অন্তসার শূণ্য করে প্রদেশগুলিকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগাভাগি করার সুযোগ করে যে পাকিস্তান ইংরেজ ও কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্য করা হয়েছিল তাতে বিকাশমান পুঁজিবাদ ও জাতি সত্তার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল।

পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার আশঙ্কায় বাংলার শিক্ষিত ও উন্নত বাঙালীরা বাংলাকে ভাগ করে তাঁরা এতদিন যেটার ঘোরতর বিরোধী ছিল শেষ পর্যন্ত সেটাই করে বসলো। এ রকমভাবে বিভক্ত বাংলা নিয়ে যে বাংলাদেশ হল তার নামকরণ হল পূর্ব পাকিস্তান।

এহেন দেশের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রায় অর্ধেক বাঙালী ও অর্ধেক বাংলা এবং কলিকাতা হারিয়ে যে পূর্ব পাকিস্তান হল তার বাসিন্দারা অন্ততঃ শতকরা নব্বই ভাগ বাঙালী তারা যখন তাদের 'সাধের' পাকিস্তানের প্রথম প্রকাশিত ডাক টিকিট, পোস্ট কার্ড, রেল টিকিট ইত্যাদিতে যে ইংরেজরা পর্যন্ত বাংলাকে বাদ দিত না সেই বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে কেবল ইংরেজি ও উর্দু দিয়ে ছেপে বার করল তখন বাঙালীদের ধৈর্যের

বাঁধ রক্ষা করা কঠিনই হয়েছিল।

এইভাবে ১৯৪৭ সাল শেষ না হতেই মানুষ বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হল এবং তারা ১১ই মার্চ ১৯৪৮ তারিখে দেশব্যাপী ধর্মঘট ও মিটিং মিছিল করার কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। ছাত্র ও সাধারণ মানুষরা যখন তারা যা বলেছিল, সেই সব করা শুরু করল তখন বোধ হয় সেই সময়কার ভাষা আন্দোলনের নেতারা যারা অবশ্যই ছয়মাস আগেও মুসলীম লীগের নেতা বা কর্মী ছিলেন তারা জোট বেঁধে জেলে গেলেন বা পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কিছু না বলাতে এত বড় এত প্রাণের আন্দোলন চুপ মেরে গেল।

এর সপ্তাহ খানেক পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ সাহেবকে বাঙালীদের শান্ত করার জন্য দেশের শাসকরা ঢাকায় পাঠাল। তিনি ঢাকায় আসলে দেশের লোকেরা তাঁকে বিরাট সংবর্ধনা দিল। তিনি মনে করলেন, তিনি যা বলবেন মানুষরা তাই শুনবে। তিনি বললেন, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা, আর কোনো ভাষা নয়। মানুষরা তাঁর কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। তারা তাঁর কথা শুনলো কিন্তু মানলোনা, তারা বাংলাকেও উর্দুর সাথে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী করলো।

এরপর জিন্নাহ সাহেব যখন কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় কেবল উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার কথা আবারও বললেন তখন ছাত্ররা প্রতিবাদ করে না না বলল, এবং ছাত্ররা শেষ পর্যন্ত বাংলাকেও রাষ্ট্র ভাষা করে ছেড়েছিল।

কেবল এই সব করাতে 'বাংলা' পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র-ভাষা হয়নি। তার বহু কাঠ-খড়ি পোড়াতে হয়েছিল, সংগ্রাম করতে হয়েছিল, জীবন দিতে হয়েছিল।

নেতারা তো ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের ভাষা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর সেই যে ডুব দিলেন তারপর ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারির আগে তাদের এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য নেই। কিন্তু ছাত্ররা চুপ করে ছিলনা, জনসাধারণও থেমে থাকে নি।

১৯৪৯ সালের শেষ দিকে এক রেস্টুরেন্টে নাস্তা খাওয়ার সময় কয়েকজন কেরানী গোছের লোক চা খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় বলছিলেন, ছাত্ররা যে কেন আর ১৯৪৮ সালের পর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন করছে না তা তারা বুঝছে না! ছাত্ররা আন্দোলন করলে তারা তাদের সাথে আন্দোলন করে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করতে পারে। বাংলা রাষ্ট্র ভাষা না হলে বাঙালীদের বাঁচার পথ নেই।

তাদের এই কথা শুনে ভাষা আন্দোলন কোথা থেকে শুরু করতে হবে তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি কোন ছাত্র সংগঠনে ছিলাম না। ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্ররা ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন করছিল। আমি ছাত্র বক্তাদের কথা শুনে কিছু বলার জন্য সভাপতির অনুমতিক্রমে বললাম, কেবল '৪৮ সালের ১১ই মার্চ উদযাপন করলে বাংলা রাষ্ট্র ভাষা হবে না। বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করতে চায় এ রকম সবগুলি ছাত্র প্রতিষ্ঠানের একটা কমিটি করে বাংলার প্রতিটি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাতে ঐ রকম কমিটি গঠন করে ঐ সব কমিটিগুলির সম্মেলন করে কর্মসূচী নির্ধারণ করে দেশের মানুষকে তাতে সামিল হতে আহ্বান জানাতে হবে। মানুষরা ছাত্রদের বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার আন্দোলনে সামিল হয়ে আন্দোলন করতে চায়। ছাত্রদের আন্দোলনে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষরা সামিল হলে সে আন্দোলন সফল হবেই আর বিলম্ব না করে এইভাবে কাজ শুরু করুন।

আমার কথায় সেদিন সেখানেই বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করতে আগ্রহী ছাত্ররা সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছিল এবং আমাকে সেই কমিটির আহ্বায়ক করেছিল। ১৯৪৯ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের ধর্মঘট সমর্থন করার অপরাধে এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যায় কর্তৃপক্ষ আর এই রকম কাজ না করার লিখিত প্রতিশ্রুতি চাইলে আমি তা দিতে অস্বীকার করায় আমাকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। ফলে এই তিন বছর আমি ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য বিকালে এক ঘন্টা টিউশনি করা ছাড়া সমস্ত সময় দিতে পারতাম।

এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি প্রথমে এক পতাকা দিবস পালন করে কাজ চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেছিল।

তারপর ১৯৫১ সালের ১১ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে গণপরিষদের এবং সকল সদস্যদের নামে এবং দেশের সকল পত্রিকায় বাংলাকে কেন পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করা হবে তা জানিয়ে এক স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলাম। এই স্মারকলিপি গণপরিষদ কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং পত্রিকাগুলি দেশব্যাপী আমাদের স্মারকলিপির কথা ছড়িয়ে দিয়েছিল।

এর সাথে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটিগুলিতে ছাত্ররা যখন বাড়িতে যেত তখন তাদের স্ব স্ব এলাকায় স্কুল মাদ্রাসায় কেন বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করতে হবে তা জানাতে সভা করতে ও সংগঠন করার কথা বলে দিতাম . ছাত্ররা অনেকে আমাদের তাদের অভিজ্ঞতার মজার কথা বলত। সন্দীপের এক ছাত্র বলেছিল – সে এক ধর্ম সভায় এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাইলে মাওলানা সাহেব অনুমতি দেননি। পরে সাধারণ লোকেরা অনুরোধ করলে তিনি অবশেষে অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই ছাত্র ধর্মসভার শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করেছিল তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনদের সাথে স্বপ্নে কখনও কথা হলে তারা

তাদের সাথে কোন ভাষায় কথা বলেন। তারা বলেছিলেন বাংলায় বলে। তখন সেই ছাত্রটি বলেছিল যখন পরকালে বাংলা চলে তখন ইহকালে কেন বাংলা চলবে না এবং বাংলা কেন রাষ্ট্র ভাষা হবে না। তার এই কথা মানুষদের মধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সেখানকার লোকেরা তারপর থেকে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী সমর্থন করতেন।

এর দুই বছর পর আসলো সেই মহেন্দ্রক্ষণ। ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে খাজা নাজিম উদ্দিন (১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা নাজিম উদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন) পল্টনের এক জনসভায় জিন্নাহ সাহেবের মতই বলেছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা হবে কেবলমাত্র উর্দু। তিনি যেমন কায়েদে আজম ছিলেন না, সময়টাও তেমনি ১৯৪৮ সাল ছিলনা। ইতোমধ্যে গঙ্গা, ব্রক্ষপুত্র, যমুনা, মেঘনা, তিস্তা দিয়ে বহু পানি গড়িয়ে গেছে। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছে, তারা ভাষা আন্দোলনের দায় দায়িত্ব তাদের কাঁধে তুলে নিয়েছে, ছাত্র সমাজ তাদের ওপর আস্থা স্থাপন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ভাষা কমিটি ৩০শে জানুয়ারি বিদ্যালয়ে নাজিম উদ্দিনের উক্তির প্রতিবাদে ধর্মঘট আহ্বান করেছে এবং বিরাট মিছিল করে শহর প্রদক্ষিন করেছে। মানুষ তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করেছেন, তারা আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়েছে। তারা আশার আলো দেখেছে।

৩১শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, যুবলীগ ও অন্যান্য দলসহ বার লাইব্রেরীতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সম্মেলন ডেকে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম কমিটি করেছে। কিন্তু তবুও ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ছাত্ররা আন্দোলনের অগ্রিম কর্মসূচী দেওয়ার জন্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ধর্মঘট ও মিছিলের ডাক দিয়েছে। ঢাকা শহরের এতবড় মিছিল ও ধর্মঘট এক অভূতপূর্ব ঘটনা। শহরের মানুষ মিছিলকে ফুল ছিটিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে। মিছিলের পর ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকালের সভা মুলতবী করে বিকাল তিনটায় মিছিল শেষে মিলিত হয়ে ১৬ দিন প্রস্তুতির সময় নিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থা পরিষদের শীতকালীন অধিবেশনের শুরুর দিন পরিষদ সদস্যদের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বাক্ষর নিয়ে ভাষা আন্দোলনের নতুনভাবে যাত্রা শরু করার কর্মসূচী গ্রহণ করে।

এর ফলে এই প্রথম দেশবাসী ভাষা আন্দোলনের এক পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী পায়। ছাত্র ও জনগণ এই কর্মসূচী পালনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এই কর্মসূচী সরকারকেও তৎপর করে তোলে। তারা ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকালে ২১শে থেকে রমনা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি ঘোষণা করে।

২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের জরুরী বৈঠক আহ্বান করা হয়। আওয়ামী লীগসহ অধিকাংশ সংগ্রাম পরিষদ সদস্য ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কমিউনিস্ট পার্টি মতামত প্রকাশে বিরত থাকে কেবল সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা পরিষদের চারজন (তিন জন ছাত্র, একজন যুবক) সদস্য ১৪৪ ধারা না মেনে অর্থাৎ ভঙ্গ করে সরকারের ষড়যন্ত্রের সমুচিত জবাব প্রদানের জন্য তাদের বক্তব্য রাখেন।

সভাপতি ভোটের আকারে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মতামত নিলে দেখা গেল ১১ জন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে, ৪জন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে এবং দুইজন নিরপেক্ষ।

এই ভোটাভুটির প্রসঙ্গে তার মতামত বলার জন্য সভাপতি জনাব আবুল হাশেম উঠে দাঁড়ালে আমি সভাপতির অনুমতি নিয়ে বললাম— আলোচনা ও বক্তব্য দৃষ্টে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের দুটো মত বিরাজ করছে—১১ জন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে, ৪ জন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে। সুতরাং এই দুই মতকে আগামী কাল (২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২) বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ছাত্র সভায় পেশ করা হোক এবং ছাত্ররা যা বলে সেই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক কারণ ছাত্ররাই গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারিতে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখের ছাত্র সভা আহ্বান করেছে।

সভাপতি বললেন কি করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি রাজনীতি শিখতে চান না। তিনি আরো বলেন, আগামী কাল ছাত্র সভা যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে মত দেয় তাহলে সর্বদলীয় ভাষা পরিষদ তো বাতিল হয়ে যাবে।

আমি আবার সভাপতির অনুমতি নিয়ে বললাম আজকের (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২) সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক যদি ১১-৪ ভোটকে দুইটি মতামত হিসাবে গ্রহণ করে এই দুইমত আগামীকালের (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২) ছাত্র সভায় সেইভাবে পেশ করে এবং তারপর যদি ছাত্র সভা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ বাতিল হওয়ার প্রশ্ন আসেন না। আমার বক্তব্য শোনার পর বিজ্ঞ, বিচক্ষণ সভাপতি ভোটাভুটির মর্মকে দুইটিমত হিসাবে গ্রহণ করে তা ছাত্রদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ছাত্র সভায় দুই মতের জন্য দুইজন বক্তা নির্ধারণ করে সুচারু রূপে বৈঠক সমাপ্ত করেছিলেন।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের দুই মত পর দিন (২১ ফেব্রুয়ারি. ১৯৫২) বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ছাত্র সভায় দুই বক্তা পেশ করলে দশ-বারো হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিপুলভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

এই সিদ্ধান্তের কারণে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ও ছাত্রদের দুই মতের জন্য

অবধারিত বিরোধ রোধ করা সম্ভব হয়েছিল এবং সমগ্র আন্দোলন ২৫শে ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত, এমন কি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অজানা ছিল। দুই মতের জন্য আন্দোলন দুই ভাগ হলে জনগণের ভাষা আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনও বিঘ্নিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হত। আবার সর্বদলীয় পরিষদের দুই মতের সংগ্রামের কারণেই বিভক্ত না হয়েও সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। রাজনীতিতে বর্তমানে এই রকম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুপস্থিত।

এরপর ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তারিখটি ছিল সর্বপ্রথম ২০শে ফেব্রুয়ারির দুইটি মত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বিশাল ছাত্র সভায় উপস্থিত করা এবং সেখানে গৃহীত সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করা অর্থাৎ ছাত্র সভায় দুটি মত পেশ করা ও একটা মতের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া। ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হয়ে যেত অথবা ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত হলে ছাত্ররা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চরম হট্টগোল করে পুলিশের নির্যাতনে ও গোলাগুলির পরিণতিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পরাজিত হত অথবা অনিশ্চিত সংগ্রাম ও পরিণতির সম্মুখীন হত।

অথচ ২০ ফেব্রুয়ারির সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের যা সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার পরিণতিতে ভাষা আন্দোলন জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে পেরেছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা তিন ঘন্টা রাস্তায় টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ, ধরপাকড় মোকাবিলা করার কারণেই পুলিশ ছাত্রদের সেদিনের মিছিলকে রোধ করতে পারে নি। ঘন্টা তিনেক পর ছাত্ররা মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়ার কারণেই পরবর্তি কর্মসূচী অর্থাৎ মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের পার্শ্ববর্তী রাস্তা পার হলেই ছাত্ররা পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের তিনটার অধিবেশনকালে পরিষদ সদস্যদের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে স্বাক্ষর নিতে পারত।

সরকার এই সম্ভাবনা দেখেই মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এখানেই বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক নিহত ও শতাধিক ছাত্র আহত হয়।

এরপর ছাত্ররা আহত নিহতদের মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সিতে নেওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছাত্রদের নিহত-আহত হওয়ার সংবাদ শহরে ছড়িয়ে পড়ার পর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষ হাজারে হাজারে মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে আহত-নিহতদের দেখার জন্য ভীড় করতে থাকে।

আন্দোলনকারী ছাত্ররা তাদের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি দেখে হতবাক হয়ে যায়। তখন তাদের মনে হয় নিহতদের জানাজার জন্য পরের দিন কর্মসূচী দিলে জনগণ তাতে

সামিল হতে পারে ভেবে তারা আমার খোঁজ করছিল। আমি পরবর্তী কর্মসূচীর কথা ভাবছিলাম কিন্তু তা কি হতে পারে তার কূলকিনারা করতে পারছিলাম না।

ছাত্রদের প্রস্তাব আমার কাছে ঘোর অন্ধকারে আলোর দিশার মত মনে হয়েছিল। আমি তাদের নেতা ছাত্তারকে বললাম এই কথাগুলি সহজ ভাষায় অল্পকথায় লিখে আনতে এবং ঐ কথাগুলি লিখে ছোট আকারের লিফলেট আগামী কর্মসূচী হিসাবে দিলে মানুষ তাতে সাড়া দেবে এবং তা দিতে হবে সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা পরিষদের নামে।

কিন্তু তাদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার প্রস্তাব নাকচ হওয়ায় তারা আমাদের সাথে কাজ না করার কথা ভাবছিল। ছাত্ররা গায়েবী জানাজার কর্মসূচী দিয়ে লিফলেটের খসড়া লিখে আনলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের আহ্বায়ক তাতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলে আমার স্বাক্ষরে বিশ্ববিদল্যালয় রাষ্ট্র ভাষা কমিটির নামে সে লিফলেট ঘন্টা দুই'র মধ্যে ছেপে আমরা এশার নামাজের পর মসজিদে মসজিদে বিলি করেছিলাম। ফলে রাতের মধ্যে ঢাকার অধিকাংশ স্থানে জানাজার কর্মসূচীর কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ঢাকার প্রেসগুলি বিনা পয়সায় এমন কি কাগজও দিয়ে লিফলেট ছেপে দিয়েছিল। তখনই আমরা অনেকটা বুঝতে পারছিলাম যে ভাষা আন্দোলন জনগণের আন্দোলনে পরিণত হতে চলেছে।

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তারিখে ছাত্ররা ২১শে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে নিহতদের উদ্দেশ্যে গায়েবী জানাজার ঘোষণা করেছিল। জানাজার স্থান দেওয়া হয়েছিল মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে। সময় দেওয়া হয়েছিল। সকাল নয়টা। সাড়ে নয়টা বেজে যায় কিন্তু জমায়েত খুবই অল্প। উপস্থিত মাত্র কিছু ছাত্র। আমরা মর্মে মর্মে জনগণ কি তা উপলব্ধি করছিলাম। জনগণ থাকলে আমরা বাহাদুর, তারা না থাকলে আমরা শুণ্য। এই সময় আমরা হাইকোর্টের দিক থেকে ভেসে আসা জনসমুদ্রের গর্জন শুনে পূর্ব দিকে তাকিয়ে দেখি বিশাল এক জনতা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, খুনী নুরুল আমিন মুর্দাবাদ শ্লোগান দিতে দিতে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টলের দিকে এগিয়ে আসছে।

তারা হলেন সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা। সরকার সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীদের জন্যসেদিন মিছিল, সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীদের জানিয়ে দিয়েছিল। সে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করবে কিনা সে সম্পর্কে সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে সভা করে সিদ্ধান্ত নিতে তাদের কিছু সময় লেগেছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তারিখে যেমন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত না হলে ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামের সূচনা হত না তেমনি ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তারিখে জানাজার সিদ্ধান্ত না হলে মনে হয় ২২শে ফেব্রুয়ারির অভ্যুত্থান ঘটত না, ২১শের গুলির মধ্যে দিয়ে ভাষা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটত। বহু বহু আন্দোলন, যেমন ১৯৬১ সালের আমাদের বারাক উপত্যকায় (আসাম) বাংলাকে তাদের রাষ্ট্রভাষা করার সংগ্রাম ১২জন ভাষা সৈনিকের জীবন দানের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছিল।

পাঁচ হাজারের মত সেক্রেটারিয়েট কর্মচারী সরকারি সকল নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত চাওয়ার উদ্দেশ্যে ২২শে ফেব্রুয়ারি যেখানে আগের দিন (২১শে ফেব্রুয়ারি) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গুলি করে পুলিশ ছাত্র হত্যা করেছিল সেখানে জানাজায় শরীক হওয়ার জন্য সামিল হওয়ার পর মিছিল করে শহরের দিকে যাওয়া ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখের অভ্যুত্থানের সূচনা করেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ আমি এই মিছিলে ছিলাম। এই মিছিল কার্জন হল ও হাইকোর্টের কাছাকাছি পৌঁছতেই তার ওপর গুলি বর্ষণ শুরু হয়। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর পুরানো ঢাকা থেকে যতদূর সম্ভব জানাজায় যোগদানের জন্য আসা এক মিছিলে যোগ দিয়ে অন্যান্য মিছিলের সঙ্গে মিলে আমরা তোপখানা দিয়ে নবাবপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। চারদিক থেকে আসা ছোট ছোট মিছিল এই মিছিলের সাথে যোগ দিতে থাকে।

এই মিছিল কোথায় যাচ্ছে তা আমরা কেউ জানি না। তবে বংশালের মোড়ে পৌঁছতেই মিছিল দৈনিক সংবাদ অফিসে আগুন দেওয়ার ১ নং জটলারত মিছিলে গুলি শুরু হতেই মিছিল আবর ছত্রভঙ্গ বিলীন হওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমি ক্ষুদ্র এক মিছিলে মিশে বড় এক মিছিলে যোগ দিয়ে রথখোলার মোড়ে পৌঁছতেই তার ওপর গুলি চলল। মুহূর্তে মিছিল ছত্র ভঙ্গ হয়ে আবার এক ছোট মিছিলে যোগ দিয়ে এগুতে এগুতে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বড় মিছিল হয়ে কিছুদূর এগুতেই আমাদের বিপরীত দিক ইংলিশ রোড দিয়ে বিরাট এক জনতাকে ছুটে আসতে দেখে আমাদের মিছিলও উল্টো রথখোলার দিকে ছত্র ভঙ্গ আকারে ছুটতে ছুটতে কখন যে একটা ছোট মিছিল হয়ে সামনের দিকে এগুতে এগুতে বড় মিছিল হয়ে কোর্টের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। সামনে দেখি অসংখ্য মানুষ কি যেন দেখছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরাও সেই বিশাল ধুম্ররাশি দেখতে পেলাম। আরো কিছু দূর এগুনোর পর আমরা দৈনিক মর্নিং নিউজ পোড়ার অগ্নিকুণ্ড এবং হাজার হাজার মানুষের ফায়ার ব্রিগেডের হোজ কাটার মহোৎসব এবং আরো হাজার মানুষকে সে সব ঘটনার দৃশ্য উপভোগ করতে দেখতে দেখতে আমরাও দর্শক হয়ে পড়লাম।

এই অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ মিছিল বন্ধ থাকার পর তাকিয়ে দেখি সদরঘাটের মোড় থেকে তৎকালীন ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত চারিদিকে মানুষ আর মানুষ। বিকালের আগে আর কোথাও পুলিশ বা সেনাবাহিনীর লোক দেখতে পেলাম না। হয় তারা পালিয়েছে অথবা তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ফেরার পথে দেখি বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে উৎফুল্ল হাসি খুশী মানুষ জটলাবদ্ধ হয়ে আছে। মানুষদের মধ্যে ভয়ভীতি বা তাড়াহুড়া নেই।

যত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি আসতে থাকি তত এই রকম মানুষদের তৃপ্তভাব নিয়ে জটলা করতে দেখে আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছিল। তাহলে কি ভাষা আন্দোলন শেষ?

হাটতে হাটতে আর এই রকম সব দৃশ্য দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলাম এ সবের অর্থ কি, ভাষা আন্দোলনের কি হল, তখন বুঝতে লাগলাম আজ ও কাল যতকিছু ঘটেছে তাতে তো ভাষা আন্দোলনের প্রতিপক্ষ পরাজিত হয়ে গেছে, আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষাকারীরা বিজয়ী হয়ে গেছি। আমি যা দেখছি সেসব তারই প্রতিফলন। আমি যেন একটা ভাল স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে এসব দেখেছি। আমার অন্তরটা এক অপার আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে রয়েছে।

সন্ধ্যার কিছু আগে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছে সেখান থেকে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে গিয়ে সকলের মধ্যে একই রকম বিজয়ীর তৃপ্ত ভাব ও পরিবেশ দেখে আমার মনেই হল না যে আমার, মওলানা ভাসানী, ওলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখদের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা পালনের অপরাধে হুলিয়া জারি করা হয়েছে বরং যেন বিরাট ও মহান এক দায়িত্ব পালন করার জন্য পুরস্কৃত হয়েছি।

বাঙ্গালী জাতি তাদের ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীতে পাঁচ বছর আগে যে আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু করেছিল তা উনিশ শ বাহান্ন সালের বাইশে ফেব্রুয়ারির অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে বিজয় অর্জন করেছে। এটা যে অভ্যুত্থান ও বিজয় তার আরো প্রমাণ ১৯৫৪ সালের পাকিস্তান হওয়ার পর প্রথম নির্বাচনে পাকিস্তান অর্জনে নেতৃত্বকারী দলের শোচনীয় পরাজয় এবং বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার সমর্থক যুক্তফ্রন্টের ৯৮ শতাংশের অধিক ভোটের মাধ্যমে বিজয় অর্জন।

৬-দফা বনাম
পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

আবুল বাসার

*(**সম্পাদকীয় নোট ঃ** জনাব আবুল বাসারের লেখাটি ডিসেম্বর '৬৮ থেকে মার্চ ১৯৬৯ অর্থাৎ গণ আন্দোলনের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা এবং পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত করা হলো।)*

[**লেখকের কথা ঃ** পাকিস্তান উপনিবেশিক শক্তির শাসনামলে বাঙালী জাতির অস্তিত্ব বিলোপ সাধনের জন্যে পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক নামকরণ করা হয়–পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান উপনিবেশবাদের উপনিবেশিক শোষণ তথা জাতিগত নিপীড়ন হতে মুক্তি লাভের লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার জনগণ ১৯৫৪ সনের সংসদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়-মাল্য পরিয়ে দেয়। উপনিবেশবাদীরা এই বিজয়কে নস্যাৎ করে দেয়। অত:পর আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর বজ্রকণ্ঠে পাক উপনিবেশিক শাসকদের প্রতি 'আচ্ছালামুআলাইকুম' পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার আকাঙ্খার গগণবিদারী আওয়াজ ভেসে উঠে। ফলে দ্বিধাবিভক্ত হয় আওয়ামী লীগ। মওলানা সাহেব মূলত: স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সামনে রেখেই ন্যাপ গঠন করেন। ন্যাপের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হয় ১৯৫৮ সনের সামরিক শাসনের মাধ্যমে।

১৯৬৬ সনে শেখ মুজিবর রহমান সাহেব ৬-দফা কর্মসূচী উপস্থাপনের পর রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়। ৬-দফার আয়নায় পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ স্বাধীকারের একটা বিমূর্ত ছবি দেখতে পায়। কার্যত: ৬-দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৬-দফা হুবহু কার্যকরী করলেও পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তান উপনিবেশবাদের শোষণের কোনও হেরফের ঘটে না। পাক উপনিবেশবাদের শোষণ হতে মুক্ত হবার একমাত্র পথ স্বাধীনতা অর্জন। এজন্যেই '৬–দফা বনাম পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম।

আবুল বাসার ঃ শ্রমিক নেতা, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি'র পলিটব্যুরোর সদস্য

১৯৬৯ সনের জুন মাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের অপরাধে আমি হুলিয়ার কবলে পড়ি। সামরিক আদালতে আমার অবর্তমানে বিচার কার্য সম্পন্ন হয় এবং ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এই আন্দোলনে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় দুই শত নেতা-কর্মী হুলিয়ার কবলে পড়েন এবং জুন ৬৯ হতে শুরু করে ৭১ এর ২৫ শে মার্চ সময়ের মধ্যে পার্টির সাড়ে তিন হাজার নেতা-কর্মী গ্রেফতার হয়ে সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হন।

শ্রমিক-কৃষক অস্ত্র ধর-পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর এই ধ্বনি দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ঢেউ খেলতে থাকে। পার্টিতে এ শ্লোগান আমিই চালু করি। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকাও পাক উনিবেশবাদীদের মত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইত্তেফাকের রাজনৈতিক মঞ্চের দীর্ঘ প্রবন্ধে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে ইহা কিসের আলামত এই প্রশ্ন তোলা হয় এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থপ গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়। স্বাধীনতার আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবেও মোকাবেলার জন্যে ইয়াহিয়া খাঁন মাসে (৬৯) ৮ দিনের প্রশাসনিক সফরে এসে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ভ্রমণ করে পাকিস্তানের অখণ্ডতার আদর্শের ভিত্তিতে দেশের ডান-বাম প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে এক অঘোষিত ফ্রন্ট গঠনে সমর্থ হন। ফ্রন্টের গৃহীত কর্মসূচি মোতাবেক ৭০ সনের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে ইত্তেফাকের ভাষায় ইয়াহিয়া খাঁন গণতন্ত্রের পয়গম্বর রূপে আবির্ভূত হন।

'৬ দফা বনাম পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন' বইখানা ছাপা হবার পর সাপ্তাহিক একতা পত্রিকাও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করে এবং একতা পত্রিকার একই নিবন্ধে ৬-দফার কারণে শেখ সাহেবকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করে, উভয়কে একই গর্তের শিয়াল বলেও একতা পত্রিকা গালমন্দ করে। অবশ্য ৬-দফা বনাম 'পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' বইখানা জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এমন কি বইখানা আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের মধ্যেও ৬-দফার বিপরীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষে মেরুকরণ জোরদার করেছে। দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, পাক ঔপনিবেশবাদের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের রাজনৈতিক আপোষের লাইনও ব্যর্থ হয়ে যায়।

আমরা মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপেও কাজ করতাম। স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণেই ন্যাপ ১৯৭০-এর নির্বাচন বর্জন করে। পাক উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন সংগ্রামকেই প্রধান্য দিতাম এবং গণ আন্দেলনকে অভ্যুত্থান ও গণযুদ্ধের পথে নিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকতাম।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাকে পার্টি হতে বইখানা প্রচার-প্রকাশের অনুমতি গ্রহণ করতে হয়েছে। এই অনুমতির জন্যে আমাকে এক জায়গায়

পার্টির হাই কমাণ্ডের মেজরিটির সাথে আপোষ করতে হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করতাম (এখনও করি) যে, পূর্ব বাংলা পাক ঔপনিবেশবাদের উপনিবেশ ছিল। পার্টি হাই কমাণ্ডের মেজরিটি এই মত সমর্থন করতেন না। এজন্যে, পূর্ব বাংলাকে তাত্ত্বিক কারণে উপনিবেশ বলা যায় না, কিন্তু ঔপনিবেশিক চরিত্রের শোষণ বিদ্যমান-এই কথাগুলো সংযোজিত করে বই খানার প্রকাশ-প্রচারের অনুমতি গ্রহণ করতে হয়েছিল]

১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান সরকার সমীপে ৬ -দফা কর্মসূচীর একটি দাবী নামা পেশ করেন। ৬ –দফা কর্মসূচি মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ-

১। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন–সভা সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

২। ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে কেবল মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত ষ্টেট সমূহের বর্তমান অবস্থার প্রদেশের হাতে থাকিবে।

৩। মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প প্রস্তাব ঃ-

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়-যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ষ্টেট ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

৪। সকল প্রকার ট্যাক্স–খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে।

৫। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এই ভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ :

(ক) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।
(গ) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে। (ঘ) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে। (ঙ) ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের জন্যে; বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী রপ্তানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

৬। পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠন করা। একুশ দফার দাবীতে আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবী ছিল। তাহাতো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই-পি-আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা ও নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবী একুশ দফার দাবী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও একটি দাবীও পূরণ করেন নাই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে উক্ত ৬ –দফা কর্মসূচি পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের একটি কর্মসূচি এবং এই কর্মসূচি উত্থাপিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলার জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উঠতি বাঙালী ধনী ও শ্রমিকদের একটা অংশের মধ্যে এক উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই উৎসাহে ভাটা পড়িতে থাকে। জনগণের উক্ত অংশের প্রথমাবস্থায় উৎসাহ ও চাঞ্চল্য সৃষ্টির পিছনে যে যে কারণ বিদ্যমান ছিল, উহার সংক্ষিপ্ত রূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

পাক-ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবী মুসলিম লীগের ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত হয়। মরহুম শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেব উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটিতে ভারতের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল লইয়া দুইটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম-স্বাধীন স্টেট গঠিত হইবে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর পাকিস্তানের নায়কগণ পাকিস্তান আন্দোলনের মূলনীতির বরখেলাপ করেন। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলকে পৃথক পৃথক সার্বভৌম-স্বাধীন স্টেট রূপে ঘোষণা না করিয়া এক কেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসাবে দুইটি পৃথক ভূখণ্ড নিয়া একই রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। এই বিষয়ে পাকিস্তানই একটা ব্যতিক্রম। যদি ইহা মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে হইয়া থাকে, তবে কেন মুসলিম অধ্যুষিত বিশ্বের দেশগুলি নিয়া একই রাষ্ট্র গঠিত হয় না? ইহার একমাত্র উত্তর হইতেছে যে, ধর্মের ভিত্তিতে কোন জাতির অস্তিত্ব পৃথিবীতে নাই। যেমন, বাঙালীজাতি বলিতে বাংলার মুসলমান, বাংলার হিন্দু,

বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খৃষ্টান সবাইকেই বুঝায়। যেহেতু, ভাষা-আচার-ব্যবহার এবং শিক্ষা সংস্কৃতিতে প্রত্যেকেই একই ঐতিহ্য বহন করে এবং মানসিক গঠনও প্রত্যেকের একই রকম। অদ্রূপ, ইরানী বলিতে ইরানের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকেই বুঝাই।

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে পৃথক দুইটি অঞ্চল নিয়া এক কেন্দ্রীক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হইয়াছিল এই কারণে যে ভারত বিভাগের পূর্বে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পরবর্তী সময়ে ভারত ভীতিকে মূলধন করিয়া পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাহাদের প্রতি পূর্ব বাংলার মুসলিম জনসাধারণের মোহ ও দুর্বলতা সৃষ্টি করেন এবং এক কেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের সুযোগ লাভ করেন। অতঃপর, পূর্ব বাংলার জনসাধারণকে পঙ্গু করার জন্য ধাপে ধাপে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু অংশ পূর্ব বাংলার জনসাধারণের মুখের ভাষা বাংলা ভাষাকে কাড়িয়া লইয়া উর্দুভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে প্রচলন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশ রক্ষা বিভাগে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। বাঙালীরা যোদ্ধা নহে–এইরূপ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক যুক্তির অবতারণা করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী দীর্ঘদেহী সেপাহীদের দ্বারা পূর্ব বাংলার রক্ষা সম্ভব বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এমনকি এক শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়, যাহার ফলে পূর্ব বাংলার শিক্ষা সংকোচন ও পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা সম্প্রসারণ চলিতে থাকে। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগে বাঙালীদের অনুপ্রবেশ অলিখিত নিয়মদ্বারা বন্ধ করা হয়। স্থল ও নৌ পথে পূর্ব বাংলার যোগাযোগ ও যানবাহনের মান বৃটিশ আমল হইতেও নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তানে ইহার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা হয়।

ন্যাশনাল এসেম্বলীতে শতকরা ৫৬ জন অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার আসনের সমান সংখ্যক আসন শতকরা ৪৪ জন অধ্যুষিত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করিয়া ৫৬=৪৪ এই অঙ্ক চালু করিয়া পূর্ব বাংলার জনসাধারণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক আজাদী লাভ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়। সামরিক শাসনের ভয় দেখাইয়া কুখ্যাত ইস্কান্দর মির্জা ইহা কায়েম করে।

করাচি, পরবর্তী সময়ে রাওয়ালপিণ্ডি এবং সর্বশেষে ইসলামাবাদকে কেন্দ্রীয় রাজধানী হিসাবে উন্নয়ন করার জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ইহার বেশীর ভাগ টাকাই পূর্ব বাংলার জনসাধারণের। অথচ, উক্ত নগরী সমূহের উন্নয়নের প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়াছে পশ্চিম পকিস্তানেরই বিশেষ সুবিধাভোগী ও পুঁজিপতি গোষ্ঠী। পক্ষান্তরে, পূর্ব বাংলার শহর, বন্দর অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে পূর্ব বঙ্গ সীমানায়ও বাঙালী ব্যবসায়ীকে সুযোগ দেওয়া হয় নাই। শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে পূর্ব বঙ্গ অবহেলিত। পূর্ব বঙ্গের সীমিত শিল্প বিকাশে অবাঙালী মালিকানাই

প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গে ৯ খানা কাপড়ের কল ছিল আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৩ খানা। ঢাকেশ্বরী, চিত্তরঞ্জন, মোহিনী, মুসলিম, আদর্শ, ন্যাশনাল প্রভৃতি পূর্ব বাংলার কাপড়ের কলসমূহে সুন্দর ও মিহি কাপড় উৎপাদিত হইত। দেশ বিভাগের পর উক্ত মিল সমূহের উৎপাদন বিনষ্ট করা হইয়াছে। হাজার হাজার শ্রমিককে বেকার করা হইয়াছে। অধিকাংশ মিলকে বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করা হইয়াছে। শ্রমিকদের শেয়ারক্রয়ের এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কয়েক কোটি টাকাও সরকার পরিশোধ করিতে নারাজ। গ্রাম্য কুটির শিল্প হস্তচালিত তাঁতে সুতা সরবরাহের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে কিছু সংখ্যক কটন স্পিনিং মিল পূর্ব বাংলায় স্থাপিত হইয়াছে, উহার অধিকাংশের মালিকানায় অবাঙালী শিল্পপতি। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমানে সুতা ও কাপড়ের কলের সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক এবং উক্ত মিল সমূহে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত কাপড়ের বাজারের প্রয়োজনে পূর্ব বাংলায় পুরানো কাপড়ের কল সমূহের উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে, কুটির শিল্প হস্তচালিত তাঁতকে ধ্বংস করার জন্য পূর্ব বাংলার সুতা কলে উৎপাদিত সুতার উপর মাত্রাধিক্য কর বসানো হইয়াছে। তাই হস্তচালিত তাঁত শিল্প আজ ধ্বংস প্রায়। কয়েক লক্ষ তাঁতীকে বেকার করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ বাৎসরিক কাপড় খরিদ করে ৬৭ কোটি গজ। অবশ্য প্রয়োজন প্রায় ১০০ কোটি গজের ৬৭ কোটি গজের মাত্র ৪কোটি গজ পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত হয়। বাকী ৫৬ কোটি গজ পশ্চিম পাকিস্তান হইতেই রপ্তানীর মাধ্যমে পূর্ব বাংলা হইতে বাৎসরিক প্রায় ১২৫ কোটি টাকা আহরণ করা হয়।

সিগারেট শিল্পের ক্ষেত্রে বহিরাগত পুঁজির বিকাশের স্বার্থে-বিড়ি শিল্পকে ধ্বংস করিয়া এক যোগে বাঙালী ব্যবসায়ী কয়েক লক্ষ বিড়ি শিল্প শ্রমিককে বেকার করিয়া মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চট্টগ্রামের কুটির শিল্প লবণ উৎপাদনের উপর কর বসাইয়া ক্রেতা সাধারণ ও লবণ উৎপাদনকারীদের সর্বনাশ সাধন করা হইয়াছে। পূর্ব বাংলার লবণ উৎপাদন ব্যাহত করিয়া এক পর্যায়ে ১৬.০০ টাকা সের দামে জনসাধারণকে করাচীর লবণ কিনতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

সরকারের পরিচালনাধীন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ওয়াপদা কর্তৃক সরবরাহ করা হয় কলকারখানার জন্য ও শহর এবং বন্দরের জন্য বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের দাম পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব বাংলায় দ্বিগুণ। পূর্ব বাংলায় শিল্প বিকাশে ইহাও অন্যতম বাধা। শিল্প ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদতা কতখানি, এক কথাই বুঝা যাইবে যখন আমরা দেখি সারা পূর্ব বাংলায় যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় একমাত্র করাচী নগরীতে হয় উহার আট গুণ।

পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন পূর্ব বাংলার প্রায় সাড়ে পাঁচগুণ। অথচ, পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন বাস করে পূর্ব বাংলায়। এখানে ভূমির উপর জনতার চাপ অত্যন্ত বেশী।

এখানকার কৃষি ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নত করার কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নাই। তদুপরি প্রতি বৎসরে বন্যায় শত শত কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয় ও প্রাণহানি ঘটে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিকার্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে ঢালিয়া সাজানো হইতেছে। অনুর্বর জায়গা ও ধূলি-ধুসরিত ভূ-খণ্ডকে সুজলা, সুফলা করার জন্য সিন্ধু অববাহিকার মহাপরিকল্পনা, তারবেলা ও মংগলা বাঁধ ইত্যাদিতে ৪/৫ হাজার কোটি টাকার মত ব্যয়িত হইতেছে, অথচ, পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৫ শত কোটি টাকা খরচ করিয়া 'ক্রুগ মিশনের সুপারিশ' কার্যকরী করা হয় নাই।

বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৮৮ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়িত হইয়াছে। এবং পাকিস্তানের রফতানী বাণিজ্যের আয় বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আয় হইয়াছে পূর্ব বাংলার স্বর্ণ সূত্র পাট হইতে।

পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ ভাগ দেশরক্ষা খাতে ব্যয়িত হয়। দেশ রক্ষা বিভাগে মূলত: পশ্চিম পাকিস্তান নিয়োজিত থাকায় দেশরক্ষা খাতে এই ব্যয়ও মূলতঃ পশ্চিমাঞ্চলের জনসাধারণ ভোগ করিয়া থাকে।

এই অবস্থায় পাকিস্তানে চালু মুদ্রার শতকরা ৮৮ ভাগই পশ্চিমাঞ্চলের মালিকানায় চলিয়া গিয়াছে। আর শত করা ৫৬ জন অধিবাসী অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার বা বাঙালীর হাতে মাত্র শতকরা ১২ ভাগ টাকা আছে।

পাকিস্তানের বর্তমান এককেন্দ্রীক সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের অসন্তোষের কারণ আরো গভীরে। পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ জন কৃষক, ৬ জন শ্রমিক, শতকরা ১ জন ভিক্ষাবৃত্তির উপর জীবন ধারণ করে। বাকী শতকরা ৮ জনের মধ্যে আছে শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মচারী দেশরক্ষা বাহিনী, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও জোতদার বা ভূ-স্বামী। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই দেশের কৃষক সমাজ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল এই আশায় যে বৃটিশের শাসন শোষণ বন্ধ হইলে তাহাদের জীবনে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি আসিবে। বৃটিশের সাথে সাথে তাহারা বৃটিশের পদলেহী কুকুর জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধেও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন করিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ পাক ভারত ভূখণ্ড জয় করার পরও খাজনা ট্যাক্স আদায়ে দেশের জনসাধারণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তাই, পাক ভারতে বৃটেনের প্রতিনিধি বড় লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশ পাক ভারত ভূখণ্ডের দুর্ধর্ষ ডাকাত ও দুষ্টচরিত্রের লোকদিগকে নয়াদিল্লীতে ডাকিয়া সম্মেলন করেন। বৃটিশের সহিত সাম্রাজ্য শাসন ও শোষণের কাজে সহযোগীতা করার জন্য তাহাদিগকে জমিদারী প্রদান করেন। অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য খুন করার অধিকার পর্যন্ত জমিদারদের প্রদান করা হয় এবং বৃটিশের পক্ষ হইতে শক্তি ও আইন রচনার দ্বারা জমিদারদের সাহায্য করা হয়। এই জমিদ্দারেরা যিনি যে পরিমাণ খাজনা আদায় করিত, তার এক ক্ষুদ্র অংশ

(প্রায় শতকরা দশ টাকা) রাজকোষে জমা দিতেন এবং বাকী বড় অংশ তাহারা ভোগ করিতেন। প্রত্যেক জমিদারের প্রচুর খাস দখলী ভূমিও ছিল। জমিদারেরা বৃটিশ রাজত্বের ভিত্তি মজবুত করিয়াছিল। করভারে জর্জরিত প্রজাদের হত্যা করা, ভিটা ছাড়া করা, দৈহিক নির্যাতন করা হইতে কোন প্রকার অত্যাচারই জমিদারেরা বাদ রাখিত না।

যে সকল জমিদার প্রজা নিপীড়ন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিতেন, তাহাদিগকে রাজ দরবার হইতে রায় বাহাদুর, খাঁন বাহাদুর ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হইত। তাই, এই দেশের কৃষক সমাজ বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে বৃটিশের সৃষ্ট জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিল। এই আশায় যে জমিদার গোষ্ঠীর অত্যাচার ও নিপীড়ন হইতে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে খাজনার যে অংশ জমিদার শ্রেণী ভোগ করিত উহা হইতে তাহারা (কৃষক শ্রেণী) রেহাই পাইবে এবং জমিদারদের খাস দখলী প্রচুর জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকগণ লাভ করিবে। ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের ঘোষণাপত্রে 'লাঙ্গল যার জমি তার'– এই নীতি গৃহীত হইয়াছিল।

বৃটিশ ভারত ত্যাগ করিল; দেশ বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইল। যে আশা বুকে লইয়া কৃষকগণ স্বাধীনতা আন্দোলন করিয়াছিল; তাহাদের সেই আশা পূরণ হয় নাই, জমিদারদের ভোগকৃত খাজনার অংশ কৃষকদের মাফ করা হয় নাই, ভূমিহীন ও অল্প জমির মালিকেরা জমি পায় নাই। বরং বৃটিশ আমলের তুলনায় খাজনার হার বহুগুণে বাড়ানো হইয়াছে। সরকারী খাস জমি ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত না দিয়া যে সকল জোতদারের শত শত বা হাজার হাজার একর জমি ভোগ দখলে আছে, বিভিন্ন মিথ্যা ও জাল নামে তাহাদের বন্দোবস্ত দিতেছে। কৃষকেরা খাজনা প্রদান করার সময় সরকারী আমলাদের ঘুষ প্রদান করিতে হইবেই, বকেয়া খাজনার সুদ এবং সুদের সুদও প্রদান করিতে হয়।

খাজনার জন্য সার্টিফিকেট নিলাম এবং বডি ওয়ারেন্ট জাতীয় নিপীড়ন বৃটিশ ও বৃটিশের পদলেহী জমিদারদের অত্যাচারকেও হার মানাইয়াছে। ইহার উপর ইউনিয়ন কাউন্সিলের ট্যাক্সও বহুগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু কৃষক সমাজের আয় বাড়ে নাই, বরং মোটামুটি কমিয়া গিয়াছে। করভারে জর্জরিত কৃষক সমাজ আজ অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাইতেছে। স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, প্রয়োজনীয় বস্ত্র, রোগে চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্য, সন্তান সন্ততিদের লেখা পড়ার ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলা তো দূরের কথা, কৃষক সমাজকে আজ বাঁচিয়া থাকার জন্য অবিরাম মৃত্যুর সহিত লড়াই করিতে হইতেছে এবং অকাল বার্ধক্য ও দুরারোগ্য রোগে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মৃত্যুর দিকে ঢলিয়া পড়িতে হইতেছে। কৃষক সমাজকে আজ বলিতে শোনা যায় 'বৃটিশ আমলেই ভাল ছিলাম'। স্বাধীনতার প্রহসন ও দারিদ্রের কষাঘাতে কৃষক সমাজের জীবনী শক্তি আজ বিলুপ্ত হইয়াছে।

একইভাবে এই দেশের শ্রমিক শ্রেণীও স্বাধীনতা আন্দোলন করিয়াছিল এই আশায় যে বৃটিশের শাসন শোষণের অবসান হওয়ার পর তাহাদের জীবনে সুখ শান্তি নামিয়া আসিবে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সেই আশা পূরণ হয় নাই। ১৯৩৯ সালের তুলনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে গড়পড়তা ১২ গুণ। অথচ শ্রমিক শ্রেণীর বেতন ৪/৫ গুণের বেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। ১৯৩৯ সালে শ্রমিক শ্রেণী যে বেতন পাইতেন, উহার দ্বারা তাহাদের অনেক দুঃখ কষ্টে জীবন ধারণ করিতে হইত– আর বর্তমানের অবস্থাতো কল্পনাতীত। শ্রমিক শ্রেণীকে বাসস্থান দেওয়া হইতেছে না। কোথাও কোথাও বাসস্থানের সামান্য ব্যবস্থা থাকলেও ঐগুলি মনুষ্যবাসের উপযোগী নহে। শ্রমিক-শ্রেণী গ্যাসট্রিক, যক্ষ্মা, অকাল বার্ধক্য ইত্যাদি ব্যাধিতে ভুগিয়া ভুগিয়া মালিকের মুনাফার পাহাড় বানাইতেছে। অথচ মালিক শ্রেণীর সমৃদ্ধি কী হারে হইয়াছে, একটা নজির উল্লেখ করিলেই উহা সহজে বোঝা যাইবে। দাউদ কোম্পানী দেশ বিভাগের পর মাত্র ৪ লাখ টাকা নিয়া পাকিস্তানে আগমন করিয়াছিল, বর্তমানে দাউদ কর্পোরেশন একশত কোটি টাকারও বেশী পরিমাণ টাকার মালিক হইয়াছে এই দেশের কৃষকের উৎপাদিত কাঁচা মাল ও শ্রমিকের সস্তা শ্রম ব্যবহার করিয়া।

এখন প্রশ্ন উঠিবে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী কি এই অবস্থা বিনা প্রতিবাদে বা বিনা প্রতিরোধে মানিয়া লইয়াছে? উত্তর, না। কৃষক শ্রেণী শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে বহু প্রতিরোধ আন্দোলন করিয়াছে। বহু জায়গায় বহু কৃষক স্বাধীন সরকারের পুলিশ বাহিনীর বুলেট ও বেয়নেটে শহীদ হইয়াছেন এবং এখনও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি কৃষক শ্রেণীর দাবী দাওয়ার লড়াইকে অগ্রসর করিয়া নিতেছে। শ্রমিক শ্রেণীও তদ্রূপভাবে শোষণ মুক্তির জন্য, তাহাদের বাঁচার নিম্নতম দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করিতে গিয়া এযাবৎ অসংখ্য মিথ্যা মামলা, জেল-জুলুম, পুলিশ কর্তৃক দৈহিক নির্যাতন, পুলিশ ও মালিকের ভাড়াটিয়া গুণ্ডা কর্তৃক হত্যা লীলা প্রভৃতি বহু প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াও শোষণ মুক্তির আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে।

এখন প্রশ্ন উঠিবে যে স্বাধীনতা আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী ভবিষ্যৎ মুক্ত জীবনের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাগণ কি সে ছবি দেখেন নাই? উত্তর– হ্যাঁ, দেখিয়াছিলেন তাহারাও সুন্দর ভবিষ্যৎ এর স্বপ্ন। দাউদ কোম্পানী, আদমজি, আমিন, বাওয়ানী, ইস্পাহানী প্রভৃতি ব্যবসায়ীর বৃটিশ ভারতে ব্যবসায়ে বিড়লা, টাটা, গোয়েনকা প্রভৃতি বৃহৎ কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগীতায় অগ্রসর হওয়া দূরের কথা, টিকিয়া থাকাও কষ্টকর হইয়াছিল। তাই তাহারা পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন যোগাইয়াছিল এই আশায় যে হিন্দু-মুসলিম-দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হইলে প্রস্তাবিত পাকিস্তানে তাহারাই সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীতায় বিড়লা-টাটা, গোয়েনকাদের মত শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী এবং ছোট মাঝারী ব্যবসায়ীকে শোষণ করিয়া একচেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত

হইবে। কৃষক-শ্রমিক যেমন আশা করিয়াছিল যে বৃটিশের শোষণ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তাহাদের উপর হইতে সর্ব প্রকার শোষণ বন্ধ হইয়া তাহারা এক সুখী এবং সমৃদ্ধশালী সমাজে বসবাস করিবে। তাই, স্বাধীনতা আন্দোলননে অন্ধের হাতী দেখার মত প্রত্যেক শ্রেণীই নিজ নিজ শ্রেণী স্বার্থেরই স্বপ্ন দেখিয়াছিল। মুসলিম লীগ নেতৃত্বে দাউদ, আদমজি, ইস্পাহানী গোষ্ঠীর সরাসরি প্রভাব ছিল। তদ্রুপ কংগ্রেস নেতৃত্বে প্রভাব ছিল টাটা-বিড়লা -গোয়েনকাদের। (স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষের দিকে অনিবার্য সাফল্যের মুখে বিরোধীতা ত্যাগ করিয়া জমিদার শ্রেণীর এক অংশ ভবিষ্যৎ স্বাধীন রাষ্ট্রে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থরক্ষার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং ছোট মাঝারী ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করে এমন কোন রাজনৈতিক দল দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকাও গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে নাই) পক্ষান্তরে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ বৃটিশের সহযোগীতায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে চাহিয়াছিল। উক্ত দল দুইটিকে বৃটিশও সহযোগীতা করিয়াছিল এবং নিজ স্বার্থে কংগ্রেস ও লীগের হাতেই যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়াছিল।

নিজ স্বার্থেই বৃটিশ কংগ্রেস ও লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন-ইহা কেমন করিয়া হয়? এখানে সামান্য আলোচনা প্রয়োজন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি অভ্যন্তরীণভাবে তাহাদের পুঁজিবাদী বিকাশের বিশেষ এক পর্যায়ে তাহাদের সওদাগরি জাহাজ লইয়া বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহির্বিশ্বে এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হইতে থাকে। বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ কর্তৃক আরোপিত বাণিজ্যকর ইত্যাদি বিধিনিষেধের ফলে ব্যবসায়ে তাহাদের ঈপ্সিত ফল লাভ হইতে ছিল না। তাই তাহারা বিভিন্ন দেশের শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়াছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা বিভিন্ন দেশের জনবর্গের মধ্যে রেষারেষিকে এবং রাজ-দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এজেন্টদের কাজে লাগাইয়া যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে জয়লাভ করে। ভারতে পলাশী মহীশুর যুদ্ধ ইত্যাদি এই বিষয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কবি গুরুর ভাষায় 'বণিকের মানদণ্ড' দেখিয়াছিল 'রাজদণ্ডরূপে।' আবার ইউরোপের বেনিয়া শক্তির মধ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের প্রশ্নে পরস্পরে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ হইত। যেমন, ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী শক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পর্যায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সাম্রাজ্য বা কলোনী সমূহে আধিপত্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে যুদ্ধের বলি হিসাবে ব্যবহার করে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৃথিবীর বহু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ইহার প্রমাণ। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে ১৯১৭ সালে অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী দেশ রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির (বলশেভিক) নেতৃত্বে মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। রাশিয়ার সর্বহারা মেহনতি মানুষ

ক্ষমতা দখল করিয়া পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণের অবসান ঘোষণা করে এবং সারা বিশ্বের মেহনতি মানুষ শ্রমিক ও কৃষক সমাজকে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শোষণ মুক্তির সংগ্রামে আগাইয়া যাওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। সাথে সাথে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া এক শোষণমুক্ত বিশ্ব মানব সমাজ গঠনে বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণীর সহিত সহযোগীতা ও সাহায্যের নীতি ঘোষণা করে। এই অবস্থায় সারা বিশ্বব্যাপী সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে এক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মেরুদণ্ডে কাঁপন ধরে। রুশ বিপ্লবের ঢেউ সরাসরি মহাচীন ও পাকভারত উপমহাদেশে আসিয়া পৌঁছে। মহাচীনে ঔপনিবেশিক, আধা–ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের পার্টি কমুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মুক্তি যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পাকভারতের শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষক সমাজও রুশ বিপ্লবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বৃটিশকে তাড়াইয়া শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গঠন করিবে এই আশংকায় বৃটিশ অবিভক্ত ভারতের পুঁজিপতিদের প্রভাবিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সহিত সহযোগীতা করিতে থাকে এবং উক্ত দুই দলের হাতে যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া নিজেদের ও পাকভারতের পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষা করে। অবিভক্ত ভারতে মেহনতি মানুষের পার্টি ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টি স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হইয়াছিল বলিয়াই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। পক্ষান্তরে মহাচীনে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি জাতীয় মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারিয়াছিল বলিয়াই মহাচীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হইয়াছিল এবং শ্রমিক -কৃষক-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় ধনীদের সরকার গঠন করা সম্ভব হইয়াছিল। এই বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব দিয়াছিল। এবং কৃষক সমাজ মূলশক্তি হিসাবে সংগ্রাম করিয়াছিল বলিয়াই মহাচীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়।

আজো পাকভারত উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কার্যকরীভাবে উহার শোষণের ভূমিকা পালন করিয়া যাইতেছে। পূর্ব বাংলার চা বাগান সমূহের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ এখানো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির মালিকানায় আছে এবং বহুশিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় এখনো তাহারা আছে। একমাত্র চট্টগ্রামেই ৭০টি বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আছে। ঐগুলি হইতে প্রতি বছরে প্রকাশ্য ভাবে এবং আন্তর্জাতিক কালোবাজারী পথে কোটি কোটি টাকা এইদেশ হইতে পাচার করা হইতেছে। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শ্রেণী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট এতখানি আত্মসমর্পণ করিয়াছে যে পাকিস্তানের ভূমিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধঘাঁটি পর্যন্ত স্থাপন করিতে দেওয়া হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সহিত ক্ষমতাসীন শ্রেণী নিজেদের স্বার্থকে এক করিয়া দেখিয়াছে। শতকরা ৭ হইতে ৯ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক সুদ দিয়া মার্কিন সাহায্য (?) গ্রহণ করা

হইয়াছে। অথচ, দেশের উন্নয়নের জন্য নাম মাত্র সুদে অথবা বিনা সুদে সমাজতান্ত্রিক দেশ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই।

আদমজি, দাউদ, আমিন এজেন্সি, ইস্পাহানী, বাওয়ানী, সায়গল ইত্যাদি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর আশীর্বাদপুষ্ট হইয়া পাকিস্তানের শাসকবর্গ এই দেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের পীড়ন করিতে থাকে; উত্তরোত্তর খাজনা, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ট্যাক্স বৃদ্ধি হইতে থাকে। অবাঙালী বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে মুদ্রা স্ফীতি ঘটাইয়া নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ানো হয়। শ্রমিক শ্রেণীর মজুরী বৃদ্ধির দাবী আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জবাব শাসকগোষ্ঠী দিয়াছে জেল-জুলুম, মিথ্যা-মামলা, টিয়ারগ্যাস, লাঠি-পেটা ও গুলি বর্ষণ করিয়া। বৃহৎ ধনিক-গোষ্ঠী শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করিয়া পি, আই, ডি, সি, কর্তৃক স্থাপিত জনসাধারণের সম্পদ বিভিন্ন কলকারখানা নিজেদের হস্তগত করিতে থাকে। এই ধনিক গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীতায় পাকিস্তানে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন করিতে থাকে। মরহুম খাজা নাজিম উদ্দিনকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে বরখাস্ত করা, মরহুম মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে রাতারাতি আমেরিকা হইতে আমদানি করিয়া গদিতে বসানো, ৯২ (ক) ধারা জারি ও পূর্ব বাংলার যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করিয়া ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জনসাধারণের ২১–দফার ম্যানডেট (হুকুম) কে বানচাল করা, ৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করা ইত্যাদি কার্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। পুঁজিপতি গোষ্ঠী সরকারী যন্ত্রকে ব্যবহার করিয়া আমদানী-রফতানী নীতি তাহাদের নিজেদের স্বার্থে প্রণয়ন করে ছোট মাঝারী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিকাশের পথে বাঁধা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বিকাশকে স্তব্ধ করিয়া দেয়, রফতানী বাণিজ্য উন্নয়নের নাম করিয়া বোনাস-ভাউচার প্রথা প্রবর্তন করিয়া আমদানীকৃত মালের দাম দ্বিগুণেরও বেশী, কোন কোন ক্ষেত্রে ৪ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ইহার ফলে স্বল্প আয়ের জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা লোপ পায়। যেহেতু তাহাদের আয় বাড়ে নাই, কিন্তু ব্যয় কয়েকগুণ বাড়িয়াছে। এই প্রথার ফলে আমদানী কারক ও ছোট মাঝারী ব্যবসায়ী শিল্পপতিগণ ব্যবসায় মার খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেককেই ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালাইতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে, এই প্রথার ফলে মুষ্টিমেয় বৃহৎ ধনী পরিবার (২০ পরিবার) আইন সংগত ডাকাতির টাকা দুই হাতে লুণ্ঠন করিতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সমাজ ব্যবস্থায় দুইটি শ্রেণী বিদ্যমান। বৃটিশ আমল হইতে সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না বলিলেই চলে। সেখানকার মত এই অঞ্চলেও মধ্যবিত্ত ও ছোট মাঝারী ব্যবসায়ী শ্রেণীকে লোপ করিয়া দেওয়ার জন্য বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বিদেশে কাঁচা পাট রফতানীর ক্ষেত্রে অবাঙালী ৫টি পরিবার শতকরা ৮০ ভাগ পাট রপ্তানি করে, আর ১০০ টি বাঙালী ব্যবসায়ী রপ্তানী করে মাত্র ২০ ভাগ। পাট-ব্যবসায়ী সমিতি পাটের দাম নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়াই কৃষকদের হাতে পাট থাকা অবস্থায় পাটের দাম অত্যন্ত কম থাকে। পানির দামে কৃষকদের পাট বিক্রয় করিতে হয়। কৃষকদের হাত হইতে পাট চলিয়া যাওয়ার পার পরই পাটের দাম চড়া হইয়া উঠে।

রপ্তানী, পাট চাষীর হাড়ভাংগা পরিশ্রমের ফল ভোগ করে। পাট বিক্রয় করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হয় বলিয়াই কৃষকগণ হাতে পাট রাখিয়া দর কষাকষি করিতে পারে না। কৃষকদের দর কষাকষির ক্ষমতা হউক এটা রপ্তানীকারক বা সরকারের কামনা নহে। তাই তাহারা কৃষককূলকে শোষণ করিয়া কঙ্কালসার করিয়াছে।

বর্তমানে ব্যাঙ্ক ও শিল্পপুঁজি অনেকখানি একত্রিভূত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় দাউদ কর্পোরেশন, আদমজি, গওহর আইউব, আমিন এজেন্সিজ, বাওয়ানী গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ, নিশাত গ্রুপ, সায়গল, ইউসুফ হারুন প্রভৃতি ২০ পরিবারের হাতে পাকিস্তানের সমুদয় সম্পদের শতকরা ৬৫ ভাগ জমা হইয়া গিয়াছে। উক্ত ২০ পরিবারের গোলাম সরকারী কর্তারাও এই তথ্যটি স্বীকার করেন। সরকারী প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুল হক তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন যে শিল্পপুঁজির শতকরা ৬৬ ভাগ, ব্যাঙ্ক পুঁজির শতকরা ৮৪ ভাগ, ইনসুরেন্স পুঁজির শতকরা ৯৭ ভাগ বৃহৎ ২০ পরিবারের মালিকানায় আছে। বৃহৎ পরিবারসহ ২০০ পরিবারের হাতে দেশের সমুদয় সম্পদের শতকরা ৮৫ ভাগ আছে। পাকিস্তানের চালু মুদ্রার শতকরা ৭ হইতে ৮ ভাগের মালিক খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই অর্থ পাকিস্তানী ব্যাঙ্কে জমা আছে। ব্যাঙ্ক হইতে সুদ সংগ্রহ করা এবং এই টাকা দিয়া পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে কলুষিত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। অবশিষ্ট সামান্য কিছু অর্থের মালিক সরকারী তহবিল ও পাকিস্তানের সাড়ে বার কোটি জনসাধারণ। উক্ত ২০ পরিবারের মধ্যে একজনও বাঙালী নাই। বাকী ১৮০ পরিবারের মধ্যেও ২/১ জনের অধিক বাঙালী ব্যবসায়ী নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে বৃহৎ ধনীগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও ছোট মাঝারী ব্যবসায়ীদের মত পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিক এবং কৃষকদের একইভাবে শোষণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে সাবেক সিন্ধু প্রদেশের ২০ লক্ষ হারি (ভূমিহীন কৃষক) এখনো কোন জমি পায় নাই। পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারী উচ্ছেদ করা হইয়াছে সত্য কিন্তু প্রত্যেক জমিদারের সর্বনিম্ন ১ হাজার একর কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক হাজার একর পর্যন্ত জমি রাখার ব্যবস্থা করিয়া কার্যত : তাহাদের ভূস্বামী হিসাবেই রাখা হইয়াছে। জমিদারের জমির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে। বাজেয়াপ্ত জমি সামরিক বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অফিসারদের প্রদান করিয়া এক বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করা হইয়াছে। তবু পূর্ব বাংলার তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে সামগ্রিক উন্নয়ন বহুগুণ বেশী হইয়াছে বলিয়া সেখানকার জনসাধারণের মাথা পিছু বাৎসরিক আয় পূর্ব বাংলার জনসাধারণের মাথা পিছু বাৎসরিক আয় হইতে কয়েকগুণ বেশী। '৬৪ সাল হইতে বিগত ঘেরাও অভিযান পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে সুতাকলের শ্রমিকগণ সর্ব-নিম্ন বেতন ভোগ করিত মাসিক ১১৭.০০ টাকা। আলোচ্য সময়ে পূর্ব বাংলার সুতাকলে শ্রমিকগণ সর্ব-নিম্ন বেতন ভোগ করিত মাসিক মাত্র ৭০.০০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে ১১৭.০০ টাকায় যে পরিমাণ ব্যবহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায়, উহ. কিনিতে পূর্ব বাংলায় লাগিবে ৩০০.০০

টাকা। তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পাকিস্তানের উভয় অংশে শ্রমিকদের আয়ের ক্ষেত্রে ব্যবধান হইতেছে ৩০০ টাকা ও ৭০ টাকার মধ্যে। স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও দুই অঞ্চলের মধ্যে একই ধরনের ব্যবধান বিদ্যমান আছে। ইহা বিশেষ সুবিধাভোগী রাজবংশ ও তাদের অনুগ্রহ্প্রাপ্ত প্রজাগণের সম্পর্কের মতই একটা অবস্থা। দুই অঞ্চলের শ্রমিকদের জীবন যাত্রাব তুলনামূলক চিত্র এইরূপ। কিন্তু উভয় অঞ্চলের ধনী গরীবদের আয়ের বা সঞ্চয়ের মাথা প্রতি গড় পড়তা হিসাব যদি দেখি তাহা হইলে আমরা কি পাই। পূর্ব বাংলার ৭ কোটি জনসাধারণের নিকট আছে পাকিস্তানে চালু মুদ্রার শতকরা ১২ ভাগ; আর পশ্চিমাঞ্চলের সাড়ে ৫ কোটি জনসাধারণের নিকট আছে শতকরা ৮৮ ভাগ টাকা।

স্বর্ণের মত মূল্যবান ধাতুও অস্পৃশ্য বাঙালীদের জন্য নিষিদ্ধ হইয়া আছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হইতে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত পথে স্বর্ণ খোলাখুলি ভাবে চোরাকারবারের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানি করা হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান হইতে এই মূল্যবান ধাতুটি পূর্ব বাংলায় বিক্রয় হওয়া বেআইনী। ফলে স্বর্ণের মূল্যমানে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে বিরাট পার্থক্য বিরাজ করিতেছে। একই রাষ্ট্রের দুই অঞ্চলে স্বর্ণের অবাধ চলাচল নিষিদ্ধ পৃথিবীর কোথাও ইহার নজির নাই। ইহা পুরাপুরিভাবে ঔপনিবেশিক ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নহে। কার্যত: ইহা দুই অর্থনীতি এবং দুই রাষ্ট্রের মত ব্যবহার। উপরোক্ত তথ্য ও অবস্থার ভিত্তিতে নিঃন্দেহে ইহা বলা যায় যে অবাঙালী বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে যে হারে শোষণ করিয়াছে উহা বৃটিশ উপনিবেশিক শোষণকেও হার মানাইয়াছে। নিশ্চিতভাবেই ইহা উপনিবেশিক চরিত্রের শোষণ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সহায়তায় বৃহৎ ২০ পরিবারের ধনী গোষ্ঠী এই শোষণ করিতেছে বলিয়া রাজনীতির প্রচলিত সংজ্ঞা হিসাবে ইহা আধা-ঔপনিবেশিক ধরণের শোষণ। কিন্তু ২টি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের একটিকে অপরটির গুটিকতেক বৃহৎ ধনী ও আমলা কর্তৃক শোষণকে উপনিবেশিক শোষণ বলা হয়। যেহেতু, বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠী এখানো সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভর করিতেছে এবং যৌথভাবে এই শোষণ কার্য চালাইতেছে তাই ইহাকে 'আধা-উপনিবেশিক শোষণ বলিলেও ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পূর্ব বাংলাকে শোষণের ধরণ উপনিবেশিক শোষণ' হইতেও নির্মম। তাই, শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ৬ দফা কর্মসূচী পূর্ব বাংলার ব্যবসায়ী. শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও আমলা গোষ্ঠী এবং শ্রমিক শ্রেণীর এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে উৎসাহ ব্যঞ্জক সা৽া জাগাইতে সক্ষম হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই উৎসাহে ভাট' পড়িতে থাকে। এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও আমলা গোষ্ঠি এবং শ্রমিক শ্রেণীর এক অংশ ৬ দফা কর্মসূচিকে প্রথমে অন্ধের হাতী দেখার মতই দেখিয়াছিল। যতই দিন অতিক্রান্ত হইতেছে, তাহারা ৬ দফা সম্পর্কে ততই বেশী বেশী পর্যালোচনা করিতেছে এবং নিজেদের জ৽বনের সহিত এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতিধ৽রার সহিত উহা মিলাইয়া

দেখিতেছে। তাহারা বুঝিতেছে যে ৬ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হইলেও পূর্ব বাংলার গণজীবনে উহা কোন পরিবর্তন আনিবে না। পূর্ব বাংলায় অবাঙালী আমলা মুৎসুদ্দি- গোষ্ঠী কর্তৃক বিনিয়োজিত পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি তখনও বর্তমানের ন্যায় পূর্ব বাংলার উঠতি ব্যবসায়ীদের বিকাশের পথে বাধা হইয়া থাকিবে, পূর্ব বাংলার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী-এক কথায় পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ শোষিত হইতে থাকিবে।

যদি কেহ প্রশ্ন তোলেন যে ৬দফা কায়েমের পর অবাঙালী বৃহৎ ধনীরা টাকাতো আর পশ্চিম পাকিস্তানে নিতে পারিবেন না, তবে তাহার জবাবে বলিতে হয় যে আয়কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমানে পূর্ব বাংলায় সাম্রাজ্যবাদী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার যে অংশের প্রকাশ্য রেকর্ড রাখা হয় না, উহা আন্তর্জাতিক চোরা কারবারির পন্থায় স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পাচার হয়। একই ভাবে পূর্ব বাংলার অর্থ ৬ দফা কায়েমের পরও বাহিরে যাইতেই থাকিবে। ৬ দফা বাস্তবায়িত হইলেও কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প এবং বিড়ি শিল্পের ধ্বংস রুদ্ধ হইবে না; বৃহৎ ধনীদের স্বার্থে কুটির শিল্প ধ্বংস হইতেই থাকিবে। তাই, পূর্ব বাংলার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় ধনীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য বলিষ্ঠ কর্মসূচি গ্রহণ করিয়া সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করা দরকার। পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সংগ্রামী অংশ স্মরণ করে যে ১৯৫৭ সালের ঐতিহাসিক কাগমারি সম্মেলনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানী যখন '২১-দফা পূরণ না হইলে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ কেন্দ্রকে আচ্ছালামো আলায়কুম জানাইব'- এই ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখন আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন অংশ মওলানা সাহেবকে প্রাদেশিকতাবাদের দোষে অভিযুক্ত করেন এবং পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্বশাসনের শতকরা ৯৮ ভাগ দেওয়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া মিথ্যা দাবী করেন। আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন অংশ জনসাধারণের ২১-দফার নির্বাচনী ম্যাণ্ডেটকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শণ করিয়া স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অবলম্বনের বদলে পাক মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া পাকিস্তানের শিল্প বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। নৌ-বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব বাংলায় স্থানান্তর করা এবং পূর্ব বাংলার ভুমির উপর জনসাধারণের চাপ বেশীর ফলে এখানে ব্যাপক শিল্প বিকাশের মাধ্যমে- বেকার সমস্যার সমাধান করা, পাট শিল্প ও ব্যবসাকে জাতীয়করণ করা, সামন্ত প্রথা বাতিল করিয়া ভূমিহীন ও স্বল্প ভূমির মালিকদের ভূমি প্রদান করা, পূর্ববাংলার স্বায়ত্বশাসন কায়েম করা প্রভৃতি ২১-দফার মূল দাবী সমূহ আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন অংশ ক্ষমতা পাইয়াও পূরণ করেন নাই। বরং তাহারা নির্লজ্জভাবে ইহা বলিতে থাকেন, "২১-দফা নির্বাচনী ওয়াদা, ঐগুলি কমুনিষ্টদের দাবী, ঐগুলি পূরণ করা সম্ভব নহে, মওলানা ভাসানী কমুনিস্টদের খপ্পরে পড়িয়াছেন এবং প্রাদেশিকতাবাদের বীজ ছড়াইতেছেন।"

ভূমি বন্টনের প্রশ্নে এখানে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ব বাংলার বা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা যাহারা লাভ করেন, তাহাদের মধ্যে প্রভাবশালী ভূ-স্বামীরাও ছিল। যেমন, ফরিদপুরের মোহন মিয়া এখনো ৫২ হাজার বিঘা জমির মালিক আছেন এবং তাহার ভাই মরহুম আবদুল্লা আল জহির উদ্দিনের সুপুত্রগণ ৮৫ হাজার বিঘার মালিক আছেন। গোটা ফরিদপুর জেলা, বরিশাল জেলা, ময়মনসিংহ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালী গোটা চর অঞ্চল, দিনাজপুরের অধিকাংশ এলাকা, চট্টগ্রামের কক্সবাজার মহকুমা বলিতে গেলে পূর্ব বাংলার প্রায় জেলাতেই এখনো ভূ-স্বামীদের করতলে প্রচুর জমি বিদ্যমান আছে। ২১-দফা কার্যকরী কবাব অর্থ হইল এই দেশের ভূ-স্বামী বা জোতদার এবং অবাঙালী পুঁজিপতির বিকাশ ও শোষণ বন্ধ করার এক বিশেষ পদক্ষেপ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইহা কার্যকরী করার দায়িত্ব যাহাদের উপর অর্পিত হইয়াছিল, তাহাদের স্বার্থ নিহিত আছে ২১-দফা কার্যকরী না করার মধ্যে- তাহারা নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করিয়া তাহারা নিজেদের শ্রেণী স্বার্থকেই টিকাইয়া রাখিয়াছে। আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময় আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনে জনসাধারণের নির্বাচনী ম্যাণ্ডেট ২১-দফা কার্যকরী করা প্রশ্নে নুতন করিয়া বিতর্ক সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদার, ভূ-স্বামী, পুঁজিপতি এবং পূর্ববাংলার ভূ-স্বামী ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের নিকট ২১-দফা বাস্তবায়নের নীতি বিসর্জন দেয়। আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন অংশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে আরো তীব্র করিয়া তোলার পরিবেশ সৃষ্টি করে। ১৯৫৭ সালে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে কেন্দ্রীয় সরকার জরুরী সার্ভিস সংরক্ষণ আইন (Essential Services Maintenance Act. 1957) পাশ কবিয়া শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার কাড়িয়া লইয়া শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের শোষণের বেদীমূলে নিক্ষেপ কবে এবং শেখ মুজিব সাহেবের শ্রম মন্ত্রীত্বের কালেই চট্টগ্রাম ও খুলনার শ্রমিকদের উপর ও সিলেটের কৃষকদের উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করিয়া হত্যালীলা চরিতার্থ করে এবং শ্রমিক - কৃষকদের বাঁচার দাবী নস্যাৎ করে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন অংশ সাম্রাজ্যবাদ, পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজি ও পাকিস্তানের উভয় অংশের সামন্তবাদী ভূ-স্বামীদের স্বার্থের নিকট ২১-দফার গৃহীত নীতি বিসর্জন দেয়। আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন অংশই পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা ও শোষক গোষ্ঠীর দাবী সংখ্যাসাম্য (৫৬= ৪৪) মানিয়া লইয়া পার্টিতে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও নৈতিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে। অবশ্য এ কথা সত্য যে প্রাদেশিক পর্যায়ে কুখ্যাত কালা কানুন 'নিরাপত্তা আইন' বাতিল করিয়া বাক স্বাধীনতা উপভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহারের এই দাবী ২১-দফার অন্তর্ভূক্ত। নিরাপত্তা আইন বাতিলের ফলে জনসাধারণ আর্থিক দিক দিয়া লাভবান না

হইলেও গণতান্ত্রিক মহল ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং ইহার ফলে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মর্যাদা কিছুটা অক্ষুণ্ন থাকে।

যাহা হোক, কাগমারী সম্মেলনে ২১–দফা নীতির উপর আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন অংশের সহিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর শেষ বোঝাপড়া হইয়া যায়। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ২১-দফা বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে পার্টি কর্মীদের সমর্থন আদয়ের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া বিভিন্ন কৌশলে প্রভাব বিস্তার করে। ভোটাভুটিতে ক্ষমতাসীনদের জয় হইল। এই সময়ে মওলানা ভাসানী এক অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। এক দিকে পার্টি ও অন্যদিকে নীতি বা আদর্শ। পার্টির স্বার্থে নীতি ও আদর্শ বিসর্জন না দিয়া নীতির স্বার্থে তিনি পার্টি ত্যাগ করেন এবং পূর্ব বাংলার শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী এক কথায় পূর্ব বাংলার জনতার দাবী ২১–দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের নীতি সম্মুখে রাখিয়াই প্রগতিশীল কর্মীদের নিয়া তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও অবাঙালী বৃহৎ ধনীদের শোষণের বিরুদ্ধে গৃহীত সংগ্রামী ভূমিকা পূর্ব বাংলার জনসাধারণের মধ্যে এক জাগরণ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়।

কৃষকদের দাবী দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে ঢাকা কৃষক সমাবেশকে ব্যর্থ করার জন্য আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন চক্রকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করিতে দেখা গিয়াছে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পূর্বে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাথে সরকারকে সমর্থন করার প্রশ্নে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পার্লামেন্টারী দলকে ২১-দফার বাস্তবায়ন এবং শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ সম্পর্কিত আরো ৪–দফা দাবি মানার জন্য দরকষাকষি করিতে দেখা গিয়াছে। এই সকল প্রশ্নে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান।

দ্বিতীয়ত : ৬–দফা কর্মসূচিতে পূর্ব বাংলার টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে যেন আর পাচার হইতে না পারে– এই কর্মসূচি বিদ্যমান আছে। ইহা ভাল কথা। যদিও পূর্ব বাংলায় আদমজি, দাউদ ইত্যাদি ২০ পরিবারের ব্যবসা বহাল রাখিয়া টাকা পাচার বন্ধ করা যাইবে না। কিন্তু, পূর্ব বাংলার টাকা সাম্রাজ্যবাদী দেশ সমূহেও পাচার না হয় উহার কোন ব্যবস্থা পত্র ৬–দফা কর্মসূচিতে দেওয়া হয় নাই এবং পূর্ব বাংলার টাকা যেন পূর্ব বাংলার গুটি কতেক পরিবারে হাতে জমা হওয়ার পরিবর্তে পূর্ব বাংলার শতকরা ৯৫ জন কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও ছোট মাঝারী ব্যবসায়ীদের জীবনকে সুন্দর করিয়া তোলে এমন কোন কর্মসূচি বা ব্যবস্থা পত্র ৬–দফা কর্মসূচিতে বিদ্যমান নাই। আওয়ামী লীগ মহল দাবী করেন যে ৬–দফা বাংলার দাবী তাহারা ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। বাঙালী জাতির মধ্যে দুইটি জাতি বিদ্যমান–একটি শোষক এবং অপরটি শোষিত।

তাই ইহা নি:সন্দেহে বলা যায় যে স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবীদের যে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ছিল উহা ৬ –দফা কর্মসূচির মাধ্যমে সফল হইতে পারে না। এই প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ মহল বলিয়া থাকে যে আগে অবাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজির শোষণ বন্ধ হউক, পরে বাংলার অর্থনীতি কি হইবে উহা আমরা ঠিক করিয়া লইব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পাকিস্তানের জন্মের আগে কলিকাতার এক জনসভায় কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে জনতার মধ্য হইতে যখন প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অর্থনীতি কিরূপ হইবে তখন তিনি জবাব দিয়াছিলেন যে আগে পাকিস্তান আসুক, অর্থনীতি কি হইবে উহা আমরা পরে ঠিক করিয়া লইব। ইহা হইতে জনসাধারণের এই শিক্ষা হইয়াছে যে ঠিক কবিয়া লইব এইরূপ উক্তি রাজনৈতিক দুষ্টচাল ও ভাওতা ছাড়া আর কিছুই নহে। আওয়ামী লীগের ৬–দফা কর্মসূচি মূলত: উঠতি ব্যবসায়ী মহলেরই দাবী। সেই দৃষ্টিতে অখণ্ড ভারতে মুসলিম উঠতি ব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থেই পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করিয়াছিল। একই দৃষ্টিতে বাঙালী উঠতি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিকাশের পথে যে অবাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজির শোষণ ও চাপ বাঁধা স্বরূপ হইয়া আছে উহাদের অপসারণ করিয়া পূর্ব বাংলায় গুটি কয়েক বাঙালী পরিবারের শোষণের রাজত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে বাঙালী উঠতি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মহল ৬–দফা সম্পর্কে উৎসাহিত। তাহারা আশা করে যে তাহারাও এই দেশের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও ক্ষুদ্রে ব্যবসায়ীদের শোষণ করিয়া দাউদ-আদমজির মত বড় পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হইতে পারিবে। অওয়ামী লীগের ঘোষণায় পূর্ব বাংলায় অবাঙালী পুঁজি বিনিয়োগে বা বর্তমানে বিনিয়োজিত পুঁজি সংরক্ষণ ও উহাকে পরিবর্ধনে কোন বাঁধা নাই।

তাহা হইলে উহা স্পষ্ট যে উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমেও বাঙালী উঠতি পুঁজিপতিদের আশা-আকঙ্খা পূরণ হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব বাংলায় শিল্প এবং ব্যবসায়ে বর্তমান অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ ধনীদেরই একচেটিয়া প্রাধান্য আছে। ৬–দফা বাস্তবায়িত হইলেও তাহাদের সেই প্রাধান্য অক্ষুন্নই থাকিবে বাঙালী উঠতি ব্যবসায়ীগণ বিকাশের পথে বর্তমানের মত একই প্রকার বাঁধার সম্মুখীন থাকিবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের যে পুঁজি পূর্ব বাংলায় বিনিয়োজিত আছে, উহার মুনাফার টাকা পূর্ব বাংলা হইতে পাচার হইতে পারিবে না–এমন কোন ব্যবস্থা পত্র ৬–দফা কর্মসূচিতে বিদ্যমান না থাকায় স্পষ্টই দেখা যায় যে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক চরিত্রে খাঁটি জাতীয়তাবাদী গুণ এখনও বিকশিত হয় নাই। পূর্ব বাংলার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের শোষণের ক্ষেত্রে তাহারা সাম্রাজ্যবাদকেও অংশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। তাই ৬ দফা কর্মসূচির পর্যালোচনা শ্রমিক শ্রেণী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও আমলা গোষ্ঠী ও উঠতি বাঙালী ব্যবসায়ীরা যতই করিয়াছে, ততই ৬–দফা সম্পর্কে তাহাদের উৎসাহে ভাটা পড়িয়াছে। একটা বিশেষ দিকে আমাদের দৃষ্টি না ফিরাইলে ৬–দফা

সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। উহা হইল এই যে গ্রামের কৃষক সমাজ প্রথম হইতেই ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি কোন প্রকার উৎসাহ প্রদর্শন করে নাই। তাহারা ৬-দফার মধ্যে মুক্তির পথ দেখে নাই। যেহেতু, কৃষক সমাজ গত ২১ বৎসরের শোষণ, বঞ্চনা এবং শিক্ষিত আমলাদের ব্যবহার হইতে জীবনে অভিজ্ঞতা দিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেছে। এখন প্রশ্ন হইল-এমন কোন রাজনৈতিক দল বা উহার প্রণীত কোন কর্মসূচি আছে কিনা যে রাজনৈতিক দল বা উহার কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ছোট-মাঝারী ধনী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় ধনীদের সমবায়ে এক সুখী সমাজ গঠন করা যায়? ইহার সঠিক জবাব হইতেছে-না। এমন কি বর্তমানের সব চাইতে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও এইরূপ একটা সমাজ গঠনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করিতে পারে না। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল পেটি-বুর্জোয়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই পার্টির কর্মসূচিতে সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে; সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, কিছু পরিমাণ উদ্যোগও গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু চূড়ান্তভাবে সামন্তবাদের উচ্ছেদ করিয়া ভূমিহীন ও সামান্য জমির মালিক কৃষকদের হাতে জমি তুলিয়া দিতে পারে না। একটা প্রগতিশীল সমাজ গঠনে জোতদার এবং সামন্ত প্রভুগণও অন্যতম বাঁধা। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে রংপুরের জনাব মশিহুর রহমান, নোয়াখালীর জনাব মুহম্মদ তোহার মত জোতদারও রহিয়াছেন যাঁহারা এই পার্টির নেতৃত্বে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন। কৃষকদের হাতে জমি তুলিয়া দিলে তাহাদের শ্রেণী স্বার্থের আঘাত আসিবে বলিয়াই তাহারা এ কাজটা করিতে পারে না। তাহা হইলে কিভাবে এবং কোন কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ছোট-মাঝারী ধনী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় ধনীদের সমবায়ে এক সুখী-সমাজ গঠন করা যায়? ইহার সঠিক জবাব হইতেছে যে বৃহৎ ২০ পরিবারের সরকার (যাহা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে শাসন পরিচালনা করিতেছে) সমীপে কোন দফাওয়ারী কর্মসূচি বা দাবীনামা পেশ করিয়া কোন ফল লাভ হইবে না। পূর্ব বাংলার মানুষের জাতীয় স্বার্থ-কি রাজনৈতিক কি অর্থনৈতিক কোন কিছুই পাঞ্জাবী কোটারী মানিয়া লইবে না। তাই একটি মাত্র পথ, একটি দাবী-একটি মাত্র কর্মসূচি; উহা হইল-পূর্ব বাংলায় জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব।

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে রাজনৈতিকভাবে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হইয়াছে, পূর্ববাংলার ৫৬ জন পশ্চিম পাকিস্তানের ৪৪ জনের সমান এই ফর্মূলার মাধ্যমে। পাঞ্জাবী কোটারী পূর্ব বাংলার জনগণকে রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রত্যেক দিকেই পঙ্গু করিয়া দেওয়ার জন্য আঘাতের পর আঘাত হানিতেছে। এক কথায় পূর্ব বাংলার গণজীবন আজ বিপর্যস্ত। পাঞ্জাবী কোটারী হইতে পূর্বে প্রচার করা হইত যে পাঞ্জাবী সেনারাই পূর্ব বাংলার রক্ষা ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত সেনা, বাঙালীরা যোদ্ধা নহে। বিশ্বের কোন ঔপনিবেশিক শক্তি আজ পর্যন্ত এইরূপ মিথ্যা ও নির্লজ্জ উক্তি করে নাই। পূর্ব বাংলার জনগণ যখনই বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, তখনই ভারতের সহিত বিচ্ছিন্ন সীমানা সংঘর্ষ, কাশ্মীর জীগির এবং ভারত ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা করা হইত। বিগত পাক-ভারত যুদ্ধ ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে পূর্ব বাংলাকে রক্ষার জন্য পাঞ্জাবী সেনারা কোনই কাজে আসিবে না। সামুদ্রিক পথে সাড়ে তিন হাজার মাইল, আকাশ পথে বারশত মাইল ও স্থল পথে দুই হাজার মাইলের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলের মানুষ এই ভূ-খণ্ড (পূর্ব বাংলা) রক্ষার জন্য অন্য কোন ভূ-খণ্ডের মানুষের উপর নির্ভর কারার অর্থ আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কিছুই নহে। কোন বৈদেশিক আক্রমণের সময় পশ্চিম পাকিস্তান হইতে এই অঞ্চলে কোন প্রকার সাহায্য করা মোটেই সম্ভব নহে। বরং ইহা দেখা গিয়াছে যে বেঙ্গল রেজিমেন্টই পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ফ্রন্টে ভারতের সহিত যুদ্ধে সর্বাধিক সাহস ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। বাঙালীরা যুদ্ধ জানেনা- এই শয়তানী ও উদ্দেশ্যমূলক উক্তি শাসক গোষ্ঠী এখন আর করেন না। এই প্রসঙ্গে-উল্লেখযোগ্য যে বাঙালীরা অতীত ইতিহাসের পাতার প্রতি আজ চোখ বুলাইতেছে এবং বৃটিশ আমলে ভারতীয়দের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপাহী বিদ্রোহে ৫০ রেজিমেন্ট বাঙ্গালী সৈন্যের নেতৃত্ব ও কৃতিত্বের কথা গৌরবের সহিত স্মরণ করিতেছে। সেপাহী বিদ্রোহে বাঙালী সেপাহীদের বীরত্বের পরিচয় পাইয়াই পরবর্তী সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাঙালীর হাতে অস্ত্র দেয় নাই। বৃটিশের আজ্ঞাবহ পদলেহী হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছিল পাঞ্জাবী সেনারাই। পূর্ব বাংলাকে একমাত্র পূর্ব বাংলার অধিবাসীরাই যে কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে। সুশিক্ষিত বাঙালী সেনাবাহিনী ও জনসাধারণকে ব্যাপক সামরিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমেই এই অঞ্চলের রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৪ লক্ষ লোকের দেশ কুয়েত, ১ কোটি লোকের আফগানিস্তান, ৩ কোটি লোকের বার্মা, কয়েক লক্ষ লোকের সিংহল দ্বীপ স্বাধীন দেশরূপে আত্মরক্ষা করিয়া বিশ্বে তাহাদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিয়াছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাকের ডগায় ৪০ লক্ষ লোকের কিউবা দ্বীপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নত শিরে পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইয়া আছে। মার্কিন দৈত্যরা দুই দুইবার হামলা চালাইয়াও ক্ষুদ্র কিউবাকে কাবু করিতে পারে নাই। কারণ কিউবা জনসাধারণের রাষ্ট্র। দেশকে রক্ষা করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে সক্ষম সমস্ত ব্যক্তিই সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। তাই মার্কিন দৈত্য দুই দুইবারই আক্রমণের দাঁত ভাঙ্গা জবাব পাইয়াছে। একইভাবে সাত কোটি পঞ্চাশ হাজার পূর্ব বঙ্গবাসী নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করিতে সক্ষম। যদি কেউ বলেন

যে বৃহৎ ভারত পূর্ব বঙ্গকে গ্রাস করিতে সক্ষম। তাহা হইলে তাহার জবাবে বলিতে হয় যে ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুগণ বেশী শক্তিশালী। কিন্তু দেড় কোটি ভিয়েতনামীর মুক্তি যুদ্ধের সম্মুখে সপ্তম নৌ বহর, হাজার হাজার বিমান, তের লক্ষ স্থল বাহিনী আজ অকেজো প্রমাণিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা সেখানে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচির মত। ৪০ লক্ষ লোকের কিউবার তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দৈত্যের মত শক্তিশালী; ৭ কোটি জনতার পূর্ব বঙ্গের তুলনায় ভারতের শক্তি ততখানি নহে। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আর আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ এক রকম নহে। কারণ আক্রমণকারী কখনো আক্রান্ত দেশের জনতার সমর্থন পায় না। তাই আক্রমণকারী ২০/৩০ গুণ শক্তি লইয়া আক্রমণ করিয়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করিতে হয় যে বৃহৎ ভারত ৪ লক্ষ নাগাজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বুলেট ও বেয়নেটদ্বারা বন্ধ করিতে পারে নাই। নাগাজাতি আজ স্বাধীন সরকার গঠন করিয়া নিজেদের ডাক ব্যবস্থা পর্যন্ত চালু করিয়াছে। আমরা আরও দেখি ভারতীয় সীমানার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যেমন, বার্মা, নেপাল, ভুটান, সিংহল আজকের শ্রীলংকা আত্মরক্ষা করিয়াই স্বাধীন দেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে দাঁড়াইয়া আছে। ইহাও উল্লেখ করা দরকার যে ৭ কোটি লোক একই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বসবাস করে পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্রের সংখ্যা ৭টির বেশী নাই। মহাচীনের লোক সংখ্যা ৭২ কোটি, ভারতের ৫০কোটি, সোভিয়েট রাশিয়ার ২৩ কোটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৮ কোটি, ইন্দোনেশিয়ায় ১২ কোটি, জাপানে ১০ কোটি, ব্রাজিলে ৯ কোটি। জনসংখ্যা হিসাবে সারা বিশ্বে পূর্ব বাংলার স্থান হইবে অষ্টম। গ্রেট বৃটেনের জনসংখ্যা ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার, বিশাল দেশ কানাডার জনসংখ্যা ৩ কোটি। সাত কোটি জনসাধারণের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তিদের যদি সামরিক শিক্ষা প্রদান করা হয়, তবে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে পূর্ব বাংলাক রক্ষা করার জন্য কোন স্থায়ীবাহিনীর দরকার হইবে না। কেবল সীমান্তের চোরা চালান প্রতিরোধের জন্য কিছু সংখ্যক সৎ সিপাহীর দরকার হইবে।

জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের চরিত্র ও ভূমিকা সম্পর্কেও এখানে সামান্য আলোচনা প্রয়োজন এবং জনগণতান্ত্রিক সরকারি ব্যবস্থায় সমাজের কোন কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব থাকিবে এই প্রশ্নও পরিষ্কার করা দরকার। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা শুধু মাত্র ব্যালট ভোটের মধ্যেই নিহিত নাই। যে নিয়ম বা তন্ত্রের দ্বারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয় না সেই নিয়মকে গণতন্ত্র বলা যায় না। দেশের সর্ব শ্রেণীর জনগণের স্বার্থ উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের শোষণ অবসানের মাধ্যমে ; কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় ধনীদের স্বার্থ, সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল ও আপোষকামী বৃহৎ ধনীদের সম্পদ, পুঁজি ও বৈদেশিক পুঁজি বাজেয়াপ্ত করণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই জনগণতান্ত্রিক সরকার হইল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল বৃহৎ ধনীদের সরকার। এই শ্রেণী সমূহের প্রত্যেকটিই এই গণতান্ত্রিক সরকারের অংশীদার। এখানে আলোচনা করা দরকার যে কোন দেশে বুর্জোয়া বিকাশ সম্পন্ন হইতে পারে না যদি সেই দেশে ভূ-স্বামী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকে এবং উপনিবেশবাদ বা নয়া উপনিবেশবাদের শোষণ অব্যাহত থাকে। তাই বুর্জোয়া বিকাশের স্বার্থে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ বিরোধী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা থাকিলে রাষ্ট্রের চরিত্র হয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্রে দুর্বলতা ও দোদুল্যমান অবস্থা থাকে বলিয়াই এবং বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বে বিভিন্ন কারণে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী অনিবার্যভাবে তার বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করিতে পারে না বলিয়াই শ্রমিক শ্রেণীকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হয় এবং এই সংগ্রামে কৃষক সমাজ হইল শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বস্ত মিত্র ও মূল শক্তি। তাই জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণীকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হয় বলিয়াই রাষ্ট্রের চরিত্র হয় জনগণের গণতান্ত্রিক। জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কোন কোন শক্তি বা শ্রেণীর ক্ষতি হয় এবং জনগণের গণতন্ত্রের সংগ্রামে কোন কোন শক্তি বা শ্রেণী শত্রু হিসাবে প্রতি বিপ্লবী ভূমিকা পালন করিবে? জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জোতদার বা ভূ-স্বামীদের ক্ষতি হয়; যেহেতু ভূমিহীন ও স্বল্প ভূমির মালিক কৃষক সমাজের মধ্যে ভূমি বন্টন করা হয়, ক্ষতি হয় আমলা মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণীর এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির মালিকদের; যেহেতু, আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা হয়; আরো ক্ষতি হয় ঐ সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর যে সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরোধিতা করে- এই সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীরও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হইবে। তাই, জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে শত্রুর ভূমিকা পালন করিবে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শক্তি এবং আমলা মুৎসুদ্দি, পুঁজির মালিকেরা। জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় ধনিক শ্রেণীর পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা হয় না সত্য কিন্তু কার্টেল ব্যবস্থা (ধনীকে আরো ধনী করা এবং গরীবকে আরো গরীব করার নিয়মের মাধ্যমে গুটি কয়েক বৃহৎ ধনী পরিবারের একচেটিয়া ব্যবসাও শোষণের রাজত্ব কায়েম করার ব্যবস্থা) থাকে না-- অর্থনীতি গণমুখী থাকে; শ্রমিকদের বাঁচার মত মজুরী, স্বাস্থ্য সম্মত বাসস্থান, চাকুরীর নিরাপত্তা, চিকিৎসার ফ্রি ব্যবস্থা থাকে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় শ্রমিকগণকে অংশ গ্রহণের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় অফিসারগণও জনগণের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দেশের জন্য কাজ করিয়া যান। ঘুষ দুর্নীতি প্রায় লোপ পায়। দারিদ্র অর্ধাহার-অনাহার-রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, বিজাতীয় বিকৃত সংস্কৃতি বিলুপ্তিকরণ করা হয় এবং গণ-সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা হয়, সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। ক্ষুধা--দারিদ্র ও ভূমি-বাসস্থান সমস্যা এবং বেকার সমস্যা থাকে না। সামাজিক অনাচার চুরি ডাকাতি, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি লোপ পায়।

এখন কথা হইল–জনগণের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অর্জনের সংগ্রামকে আমলা মুৎসুদ্দি সরকার, জোতদার বা সামন্ত প্রভুরা এবং সাম্রাজ্যবাদ আপোষে অগ্রসর হইতে দিবে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশে তাহাদের অসংখ্য এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সি, আই,এ) এর মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কায়েম রাখার জন্য দেশে দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, গণ-সংগঠন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনে তাহাদের এজেন্ট নিয়োগ করিয়া যাইতেছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির শোষণকে টিকাইয়া রাখার জন্য তাহারা তাহাদের বিভিন্ন এজেন্ট রাজনৈতিক দল বা গণ সংগঠন কর্তৃক জঘন্য মিথ্যা প্রচার চালায় যে, জনগণের গণতান্ত্রিক সমাজ শরিয়ত-বিরোধী। তারপরও জনগণ যদি বিভ্রান্ত না হইয়া তাহাদের আন্দোলন পরিত্যাগ না করে এবং আন্দোলনকে অগ্রসর করিয়া নিতে থাকে, তখন আমলা, মুৎসুদ্দি সরকার হিংসাত্মক পন্থায় জেল, জুলুম, মিথ্যা মামলা-গণহত্যা ইত্যাদি নির্যাতন মূলক ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের শাসন–শোষণ অব্যাহত রাখার চেষ্টা করিবে। তাই, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় ধনীদের ফ্রন্ট সভা অনুষ্ঠান করিয়া, দাবীর প্রস্তাব পাশ করিয়া এবং শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ হরতাল, শোভাযাত্রা বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম করা সম্ভব হইবে না। প্রতিক্রিয়াশীলদের হিংসাত্মক প্রতিবিপ্লবী হামলাকে সশস্ত্রভাবে বিপ্লবী প্রতিহিংসা দিয়া ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে এবং পূর্ববাংলার মাটি হইতে উক্ত তিন শত্রুকে এবং তাহাদের এজেন্টদের উৎখাত করিয়া জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম করিতে হইবে। প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতি বিপ্লবী শক্তির পতন ও ধ্বংস অনিবার্য। বিপ্লবী জনগণের জয় অবধারিত।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও মওলানা ভাসানী

মেসবাহ্ কামাল

ক. সূচনা

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। উনসত্তরে জনগণের আন্দোলন যে কেবল ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিলো তাই নয়, পরবর্তীতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অনিবার্য করে তোলার ক্ষেত্রে তা পালন করেছিলো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। উনসত্তরে ঘটনাক্রমের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন ছাত্ররা, কিন্তু পরবর্তীতে তা আর কেবলমাত্র ছাত্র সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ছড়িয়ে পড়েছিলো শ্রমিক কৃষকসহ ব্যাপক মানুষের মধ্যে। ঘটনাক্রমের সূত্রপাত যাদের মাধ্যমেই ঘটে থাকুক না কেন, আপাতঃদৃষ্টির বিচারে আন্দোলনে যারাই নেতৃত্ব প্রদান করে থাকুন না–অভ্যন্তরীণভাবে একটি পরিবর্তন কিন্তু ক্রমাগতভাবে সাধিত হচ্ছিলো; শহরের মানুষের পাশাপাশি গ্রামের ব্যাপক মানুষের মধ্যেও আন্দোলন শুধু যে ছড়িয়ে পড়ছিলো তা-ই নয় — শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে, গ্রামাঞ্চলে নিম্নবর্গভুক্ত কৃষকদের মধ্যে এবং শহরাঞ্চলের পেশাজীবী কর্মচারীদের মধ্যে এই আন্দোলন ক্রমাগতভাবে শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করছিলো। উনসত্তরের গণ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের পর্যায়ে পৌঁছে আর কেবলমাত্র আইয়ুব বিরোধিতা ও কতিপয় গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা ক্রমাগতভাবে রূপ পরিগ্রহ করছিলো 'জালেম ও মজলুমের' মধ্যে সংঘাতের। এই গণআন্দোলন তথা গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়েই পতন ঘটে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় দশ বছর ধরে আসীন 'লৌহমানব' আইয়ুব খানের। তাছাড়া যে পাকিস্তান সরকার সকল গণঅসন্তোষের মধ্যেই কমিউনিস্টদের কারসাজি আবিষ্কার করতো, সেই সরকারকে বাধ্য হয়ে মণি সিংহ,

মেসবাহ কামাল ঃ সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
প্রকাশক ও সম্পাদক, সমাজ চেতনা

নগেন সরকার, রবি নিয়োগী সহ সকল কমিউনিস্ট বন্দীকে মুক্তি দিতে হয়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিতে হয়।[১]

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কোনো একক ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিলো এ কথা বলা যাবে না। কিন্তু ঐ আন্দোলন সংগঠনে তথা আন্দোলনকে 'জালেম ও মজলুমে'র মধ্যেকার একটি সংঘাত হিসেবে রূপ প্রদানের উদ্যোগ নেয়ার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিত্বের ভূমিকা ছিলো সর্বাধিক তার নাম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।[২] ষাটের দশকে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের যে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো, তার সুবাদে তার দলের তৎকালের অলিখিত সিদ্ধান্ত 'Donot Hit Ayub Regime' পরিত্যাগ করে তিনি যদি ৬ ডিসেম্বরে গভর্ণর হাউস ঘেরাও ও পরবর্ত্তী দিনগুলোর কর্মসূচী গ্রহণ না করতেন তাহলে হয়তো ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান আদৌ সংঘটিত হতো না। এরপর ২৯ ডিসেম্বর শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পাবনার জেলা প্রশাসকের বাড়ি ঘেরাও করার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘেরাও আন্দোলনের সূচনাও করেন তিনিই। গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক মানুষকে আন্দোলনের কাতারে সামিল করার জন্য ভাসানী ঐ একই দিন গ্রামাঞ্চলের হাট-বাজারে হরতাল পালনের ডাক দিয়েছিলেন এবং সেই ডাকের প্রেক্ষিতে সারাদেশের প্রচুর সংখ্যক হাট-বাজারে হরতাল পালিত হয়। পরবর্তীতে, আন্দোলনের অগ্রসর পর্যায়ে জনগণের মধ্যে 'শুদ্ধিকরণে'র স্বপক্ষে একটি মনোভাব গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন এলাকায় গণ শত্রু এমনকি পুলিশের বিপক্ষে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিযান পরিচালিত হতে শুরু করে। অনেক জায়গায় গণ-আদালত গঠিত হয় এবং ঐ আদালতে বিচারের মাধ্যমে অনেককে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। অর্থাৎ আন্দোলন ক্রমাগতভাবে Violent হতে শুরু করে এবং মওলানা ভাসানী 'Prophet of Violence' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[৩] এসবের বিচারে তাই বলা যায় যে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও মওলানা ভাসানীর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

খ. প্রেক্ষাপটের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে পাকিস্তানের উভয় অংশেই মধ্য ও নিম্নবর্গের মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার ও প্রতিরোধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সরকার উভয় অংশের মধ্য ও নিম্নবর্গের সাধারণ শত্রুতে পরিণত হয়। এর কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ঊনসত্তরের আন্দোলনের ব্যাপকতা অনুসন্ধানের স্বার্থেই এই সাধারণ শত্রুতে পরিণত হবার বিষয়টির ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দরকার। আর এজন্য ফিরে যেতে হয় পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠালগ্নে।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ এই উপমহাদেশের জাতি সমস্যার সামাধান করতে পারেনি। ধর্মের কৃত্রিম বিভাজনের উপর নির্ভর করে সংঘটিত হয় সাতচল্লিশের দেশবিভাগ। এবং

হাজার মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধানের পাশাপাশি ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ততোধিক ব্যবধান সত্ত্বেও পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত হয় শংকর রাষ্ট্র পাকিস্তান। নবগঠিত এই রাষ্ট্রে ক্ষমতায় আসীন হয় সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল এবং সামন্তবাদের সংরক্ষক মুসলিম লীগ সরকার।

গোড়া থেকে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটে। প্রতিরক্ষা বাহিনী ও সিভিল সার্ভিসও কেন্দ্রীভূত হয় পাঞ্জাবে। সরকারী আনুকূল্যে গড়ে ওঠা অর্থনীতির কেন্দ্রও হয়ে দাঁড়ায় পশ্চিম পাকিস্তান। কিন্তু এর বিপরীতে মোট জনসংখ্যার ষাট ভাগের অবস্থিতি দাঁড়ায় পূর্ব বাংলায়। পূর্ব বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার কারণে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রের ধারকরা কখনই জনগণের সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি স্বীকার করতে চায়নি।[৪] কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হলেও পাকিস্তানে মুসলিম লীগের গণভিত্তি অতোটা মজবুত ছিলো না। পাঞ্জাবের ভূস্বামীরা চরম প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন বলে এমনকি মুসলিম লীগকেও তারা পছন্দ করতেন না। বেলুচিস্তানের অনেক লোক মুসলিম লীগের নামও জানতো না। তাদের শাসক ব্যক্তিগতভাবে মত প্রদান করে বেলুচিস্তানকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। পাঠান মুলুকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্বীকৃত নেতা খান আবদুল গফফার ছিলেন কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাবশালী। সিন্ধুতে মুসলিম লীগের সংগঠন থাকলেও তাদের অন্তর্বিরোধ ছিলো বড় ধরনের। এসবের ফলশ্রুতিতে দূর্বল লীগ নেতৃত্বের উপর নির্ভর না করে জিন্নাহ নির্ভর করেন আমলাতন্ত্রের ওপর এবং তার ও লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র কর্তৃত্বের ভূমিকায় চলে আসে।[৫]

ভাষা প্রশ্নে বিতর্ক ও আন্দোলন এবং পূর্ব বাংলার বিপক্ষে পক্ষপাতের খেলা পরিচালনার কারণে মুসলিম লীগের এক সময়ের ঘাঁটি পূর্ব বাংলাও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে তারা লাভ করে মাত্র ন'টি আসন। এতোবড় একটি পরাজয়কে মেনে নিতে পাকিস্তানী শাসকবর্গ মোটেই রাজি ছিলনা না, তাই ৯২(ক) ধারার অধীনে পূর্ব বাংলায় গভর্ণরের শাসন জারি করে ভেঙ্গে দেয়া হয় নবনির্বাচিত আইনসভা।

কিন্তু 'পশ্চিম পাকিস্তান'কে নিয়েও শাসকবর্গের দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। কেননা সেখানেও উপনির্বাচন গুলো'তে মুসলিম লীগ একের পর এক পরাজিত হতে থাকে। ফলে ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের সঙ্গে অ-পাঞ্জাবী অপরাপর জাতিসত্ত্বার একটি সম্ভাব্য জোট কল্পনা করে কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই অনুভব থেকেই সামনে আনা হয় এক ইউনিট গঠনের প্রস্তাব-প্রদেশগুলোকে বিলুপ্ত করে সমগ্র 'পশ্চিম পাকিস্তান'কে একক প্রাদেশিক ইউনিটে পরিণত করা হয়।[৬]

এক ইউনিট গঠনের অর্থ ছিলো 'পশ্চিম পাকিস্তানে'র বিভিন্ন বিকাশ আকাঙ্খী জাতিসমূহের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিকশিত হবার পথকে রুদ্ধ করে দেয়া। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঐসব জনগোষ্ঠীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার হারিয়েছে।[৭]

বস্তুত পাঞ্জাব-কেন্দ্রিক বড় পুঁজিপতিগোষ্ঠির স্বার্থকে নিরঙ্কুশভাবে রক্ষা করতে গিয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন শাসনচক্র বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নটিকে মৌলিকভাবে সমাধানের চেষ্টা না করে সব সময় আপাত সমাধানের পথ খুঁজেছে। ফলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান তো হয়নি, খণ্ডকালীন সমাধানও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়নি। বিকল্প হিসেবে সরকার বার বার বেছে নিয়েছে নির্যাতনের পথ। আর এই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন সাধারণভাবে পাকিস্তানের 'উভয় অংশে'র জনগণ। তবে হাজার মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত – ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ পৃথক পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানেরর বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠি তাদের অর্থনৈতিক শোষণের 'পশ্চাদভূমি' হিসেবে বেছে নেয়ায় নির্যাতন ও ভোগান্তির বড় একটি অংশ ভোগ করতে হয় এখানকার জনগণকে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে অস্বীকার, পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে অস্বীকৃতি, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুতকরণ, পূর্ব বাংলা থেকে রাজবন্দী এবং নিহত- আহত ও গ্রেফতারের ক্ষেত্রে সংখ্যার আধিক্য, ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক নির্দেশকটি যোগ করলেই পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোয় পূর্ব বাংলার অবস্থানটি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যাবে।[৮]

কিছু অর্থনৈতিক নির্দেশক

	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
আয়তন (স্কয়ার মাইল)	৫৪৫০১	৩১০২৩৬
জনসংখ্যা (১৯৭০ হিসেবে)	৭০ মিলিয়ন	৬০ মিলিয়ন
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ		
প্রথম	৩২%	৬৮%
দ্বিতীয়	৩২%	৬৮%
তৃতীয়	৩৬%	৬৪%
চতুর্থ (প্রয়োগ হতো কিনা সন্দেহ)	৫২.৫%	৪৭.৫%
বৈদেশিক সাহায্যের বরাদ্দ	২০–৩০%	৭০–৮০%
রফতানী আয়	৫০–৭০%	৩০–৫০%
আমদানী ব্যয়	২৫.৩০%	৭০–৭৫%

বাঙ্গালী মালিকানাধীন শিল্প সংস্থা		১১%	
সিভিল সার্ভিসের চাকরি	১৬–২০%		৮০–৮৪%
সামরিক বাহিনীতে চাকরি	১০%		৯০%
১৯৪৮–৪৯ থেকে ১৯৬৮–৬৯ এর মধ্যে পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদের স্থানান্তর			৩১,১২০ মিলিয়ন রুপি
মাথাপিছু আয় (অফিসিয়াল)			
১৯৬৪–৬৫	২৮৫.৫ রুপি		৪১৯.০ রুপি
১৯৬৮–৬৯	২৯১.৫ রুপি		৪৭৩.৪ রুপি
মাথাপিছু আয়ে অঞ্চলভেদে প্রভেদ (অফিসিয়াল)			
১৯৫৯–৬০		৩২%	
১৯৬৪–৬৫		৪৭%	
১৯৬৮–৬৯		৬২%	
মাথাপিছু আয়ে প্রকৃত প্রভেদ, ১৯৬৮–৬৯		৯৫%	
গড়পড়তা জীবন মানে প্রকৃত প্রভেদ, ১৯৬৮–৬৯		১২৬%	
শিল্প শ্রমিক কর্তৃক আয়কৃত অর্থের খাদ্যের পেছনে ব্যয়ের শতাংশ (১৯৫৫–৫৬ পরিসংখ্যান)	৬৯–৭৫%		৬০–৬৩%

আড়ালে পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে সার্বিক পক্ষপাক্ষিত্বের খেলা কোন পর্যায়ে চলছিলো। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই বৈষম্য একদিকে যেমন এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য জীবিকা নির্বাহকে প্রতিদিন কঠিনতর করে তুলছিলো, তেমনি বিকাশের আকাঙ্খায় উন্মুখ এদেশের উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণীর সামনেও অন্তরায় হিসেবে বিরাজ করছিলো। তাই এতদঞ্চলের উঠতি পুঁজির বিকাশের স্বার্থে, 'পূর্ব বাংলা'র স্বায়ত্তশাসন অর্জন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো। আর সেই উদ্দেশ্যেই স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ উদ্ধারের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে ব্যাপক জনগণকে নিজের পেছনে সমবেত করে আওয়ামী লীগ বক্তব্য রাখে যে, স্বায়ত্তশাসন অর্জনের মাধ্যমে 'পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ' থেকে মুক্তি পেলেই 'পূর্ব বাংলার'র মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটবে।

অন্যদিকে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্থনৈতিক,

সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের সূত্রে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র একটি অস্তিত্ব হিসেবে ভাবার একটি চেতনা পরিদৃষ্ট হয়। জাতীয়তাবোধের সেই উৎসারণ প্রত্যক্ষ করে জনসমাজের একটি অগ্রণী অংশ 'স্বাধীন, সার্বভৌম ও জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'র কথা ভাবতে থাকেন। ১৯৬৮ সালে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি ও কর্মসূচী সংক্রান্ত একটি দলিলে 'স্বাধীন সার্বভৌম ও জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' রাষ্ট্রের বিস্তৃত কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।[৯] এছাড়া সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন' ১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারিতে তার বিপ্লবী পরিষদে গৃহীত দলিলে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে উল্লেখ করে এবং পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে পাকিস্তানী 'উপনিবেশবাদের' দ্বন্দ্বকে 'জাতীয় দ্বন্দ্ব' ও 'প্রধান দ্বন্দ্ব' হিসেবে বিবেচনা করে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন পরিচালনার ঈপ্সা ব্যক্ত করে।[১০]

অর্থাৎ, উপরের সামগ্রিক আলোচনা থেকে এই সত্যটি বেরিয়ে আসে যে প্রধানত পাঞ্জাবকেন্দ্রিক বড় বুর্জোয়া গোষ্ঠির স্বার্থকে নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে প্রবর্তন করা হয়েছিলো এক ইউনিট প্রথা যার বিরুদ্ধে পশ্চিমাংশের অপরাপর জাতিসত্তাসমূহের বিকাশ আকাঙ্খী মধবিত্ত ছিলো স্বাভাবিক কারণে ক্ষুব্ধ। আর পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পুঁজির ধারক সরকারের বিশেষ রকম নেতিবাচক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীতে এখানকার বিকাশ আকাঙ্খী মধ্যবিত্তের আকাঙ্খাও ক্রমাগত ভাবে হয়ে উঠছিলো সুতীব্র এবং তাদের স্বার্থকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই সামনে তুলে ধরা হয় ছয় দফা কর্মসূচী। আর সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় পুঁজি এবং সামন্ত বিশেষের শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন পাকিস্তানের সকল অংশের সাধারণ জনগণ। তাদের কাছে শোষণ মুক্তির আকাঙ্খাটা ছিলো প্রধান। কাজেই মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষ–এই উভয়ের সামনে তাদের বুকের উপর চেপে বসা বিশেষ ব্যবস্থাটির প্রতিভু হিসেবে উপস্থিত হয় আইয়ুবী স্বৈরশাসন। ফলে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও আকাঙ্খা নিয়ে তারা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে।

গ. প্রাথমিক ঘটনাবলি ও আন্দোলনের সূত্রপাত

যে আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৬৯ সালের মার্চে আইয়ুব খানের তখত-এ-তাউস খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে তার সূত্রপাত হয়েছিলো ১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বরে–মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বায়তুল মোকাররমে জনসভা অনুষ্ঠান ও গভর্ণর হাউস ঘেরাও -এর কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু 'আন্দোলনে'র সূত্রপাত ৬ ডিসেম্বরে ঘটলেও প্রাথমিক ঘটনাক্রমের সূত্রপাত ঘটেছিলো আরো মাসখানেক আগে - 'পশ্চিম পাকিস্তানে'।

একটি ছোট ঘটনা দিয়ে এর শুরু। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিণ্ডি সফর করছিলেন। সেখানকার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে তখন ছাত্র অসন্তোষ

বিরাজমান। ভুট্টোর তখনকার আইয়ুব বিরোধী রাজনীতির কারণে সেখানকার ছাত্ররা তাকে সাতই নভেম্বর তারিখে তাদের ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানায়। ভুট্টো বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু প্রশাসনের কাছ থেকে বাধা পেয়ে তাকে বক্তৃতা না দিয়েই ফিরে যেতে হয়। তিনি যখন হোটেলে ফিরে যাচ্ছিলেন তখনই বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে।[১১] কদিন আগে সংঘটিত আরেকটি ঘটনার প্রেক্ষিতে পিণ্ডির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা পুলিশের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলো। ঐ শহরের ৭০ জন ছাত্র চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য ল্যাণ্ডিকোটাল থেকে কয়েক হাজার টাকার মালামাল কিনে ফেরার পথে পুলিশ তাদের আটক করে এবং পণ্যগুলো বাজেয়াপ্ত করে। আটককৃত ঐসব ছাত্রের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পিণ্ডির ছাত্ররা ৭ নভেম্বরেই জমায়েতের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলো। ভুট্টোকে বক্তৃতা দিতে না দেয়ায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের সময় ঐ ছাত্ররাও সংঘর্ষে যোগ দেয়। ফলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের ব্যাপ্তি ঘটে। এর এক পর্যায়ে পুলিশ গুলী চালালে আবদুল হামিদ নামে পলিটেকনিকের সতেরো বছর বয়স্ক একজন ছাত্র নিহত হন।[১২]

পুলিশের গুলীবর্ষণ ও ছাত্র মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে শহরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু পরের দিনও হাজার হাজার ছাত্র একযোগে আইয়ুব বিরোধী মিছিলে রাজপথে নামেন এবং দোকান-পাটে ঝোলানো আইয়ুবের প্রতিকৃতি নামিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেন। পরের দিন পুলিশের গুলীতে আরো দুজন পথচারী নিহত হলে মুলতান, লাহোর, করাচী, হায়দ্রাবাদ, পেশোয়ারসহ অপরাপর শহরে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পরের দিন সংঘটিত হয় আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। ঐদিন এক সংক্ষিপ্ত সফরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পেশোয়ারে পৌছলে হাসিম উমর জাই নামে একজন বিক্ষুব্ধ ছাত্র তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে।[১৩] সরকার বিভিন্ন শহরে সেনাবাহিনী নামিয়ে সান্ধ্য আইন, গ্রেফতার ও নির্যাতন পরিচালনার মাধ্যমে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সচেষ্ট হয়। ১৩ নভেম্বর ভুট্টো ও ওয়ালী খানসহ বেশ কিছু লোককে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এই গ্রেফতারের ফল হয় উল্টো। শত শত আইনজীবী মৌন মিছিলে অংশগ্রহণ করে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। বর্ধিত সংখ্যায় জনগণও প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে।

'পশ্চিম পাকিস্তানে' বিরাজমান এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯ নভেম্বর বিকেলে 'পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্র সমাজে'র উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এক ছাত্র-গণজমায়েত। এই জমায়েতে সভাপতিত্ব করেন ডাকসু'র সদস্য মফিজুর রহমান এবং বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ কলেজের নাজমুল আলম (লাল), প্রাক্তন ডাকসু সাধারণ সম্পাদক মুর্শেদ আলী ও আব্দুর রব। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পাকিস্তানে সাম্প্রতিক ছাত্রহত্যার

প্রতিবাদ করে গ্রেফতারকৃত সকল ছাত্র ও রাজবন্দীর মুক্তি ও তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়।[১৪] এছাড়া প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং ভোটাধিকারের দাবিও উপস্থাপন করা হয়। ২২ নভেম্বর ঢাকার ২২ জন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট নাগরিক ছাত্র-জনতার ওপর সাম্প্রতিক নির্যাতনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দেন।

বিক্ষোভের ঢেউ প্রশমিত হয়েছে মনে করে ২৬ নভেম্বর তারিখে রাওয়ালপিণ্ডির সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া হয়। কিন্তু ঐ দিনই ছাত্ররা আবার রাস্তায় নেমে আসেন এবং পুলিশ গুলী চালালে একজন পথচারী নিহত হন। প্রতিবাদে রাজা আনোয়ার ও হাসানুল হকের নেতৃত্বে ছাত্ররা ২৯ নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে হরতাল পালনের আহ্বান জানান। শ্রমিকদের সমর্থনে শহরে হরতাল পালিত হয়। দু'ঘন্টার সংঘর্ষে দু'টি থানায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে রেলওয়ে ষ্টেশন ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিসসমূহ আক্রান্ত হবে আশঙ্কা করে সেগুলোকে রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীকে তলব করা হয়।[১৫]

২৯ নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে যখন ছাত্র-শ্রমিকরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত, তখন এদিকে ঢাকা হাইকোর্ট বার সমিতির সদস্যরা 'পশ্চিম পাকিস্তানে' গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। ১ ডিসেম্বর ঢাকার সাংবাদিকরা পথে নামেন। তাঁরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও সাংবাদিকসহ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে উচ্চকিত হন। এছাড়া শহীদুল্লাহ কায়সারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ই.পি.ইউ. জে'র এক সভায় পি.এফ.ইউ.জে'র প্রতি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়।[১৬]

দেশে যখন এই অবস্থা বিরাজমান তখন রাজনৈতিক মহল থেকে সর্বাগ্রে সক্রিয় ও সোচ্চার হন মওলানা ভাসানী। ৬ ডিসেম্বরকে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি ঐদিন পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। দিবসটি পালনের জন্য ভাসানী ন্যাপ, পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি ও পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন যৌথভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করে। ৬ ডিসেম্বর বিকেলে অনুষ্ঠিতব্য জনসভাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য মওলানা ভাসানী ১ ডিসেম্বর বিকেলে তিনটি পথসভায় বক্তৃতা করেন। পথসভায় তিনি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সার্বভৌম অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান এবং ৬ ডিসেম্বরে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবসে'র কর্মসূচীর সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকল বিরোধীদলের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন। অন্যদিকে ১ ডিসেম্বর তারিখেই ঢাকায় ৬ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং ১৩ ডিসেম্বর প্রদেশব্যাপী 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৬ ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবসে' মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় এক বিরাট জনসভা। সভায় বক্তব্য রাখেন ন্যাপের সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা, শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদক সিরাজুল হোসেন খান ও কৃষক সমিতির সম্পাদক আবদুল হক। সভাপতির ভাষণে ভাসানী বলেন যে, জনগণের দাবিগুলো যদি মেনে নেয়া না হয় তাহলে দেশব্যাপী তীব্র গণঅসন্তোষ দেখা দেবে। 'পশ্চিম পাকিস্তানে'র ঘটনাবলিকে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন যে, জনাব ভুট্টোকে সংবর্ধনা জানানোর অপরাধে ছাত্রদের ওপর গুলীবর্ষণ করা হয়েছে। সভায় পরবর্তী ১২ তারিখে গোটা পূর্ব বাংলায় হরতাল পালনের ডাক দেয়া হয়। জনসভার পরে একটি বিরাট মিছিল নিয়ে ভাসানী গভর্ণর হাউস ঘেরাও করলে সেখানে পুলিশের সঙ্গে জনতার ইট-পাটকেল বিনিময় হয়।[১৭]

ইতিপূর্বে ১ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় অটোরিকশা চালকদের সঙ্গে লাইসেন্স ও ভাড়ার প্রশ্নে পুলিশের এক সংঘর্ষ হয়েছিলো। বিক্ষুব্ধ চালকরা পুলিশের মারধোরের প্রতিবাদে ২ ডিসেম্বর অটোরিকশা ধর্মঘট আহ্বান করেছিলো এবং মওলানা ভাসানী তাদের ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন। এরা ভাসানী আহুত ৬ ডিসেম্বর জুলুম প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচীগুলোতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। গভর্ণর হাউস ঘেরাওয়ের পর মিছিল বায়তুল মোকাররমে আসে ইফতার বিরতির জন্যে। সে সময় অটোরিকশার চালকরা দাবি তোলেন পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পরের দিন অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর হরতাল আহ্বান করতে। বায়তুল মোকাররমে উপস্থিত অপরাপর নেতৃবৃন্দ এভাবে হুট করে, প্রস্তুতিবিহীন অবস্থায় হরতাল আহ্বানের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেননা। কিন্তু মওলানা ভাসানী অটোরিকশার চালকদের দাবির সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং ঘোষণা দেন যে, ১২ ডিসেম্বর প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের কর্মসূচী বহাল থাকবে এবং সেই সঙ্গে আগামীদিন অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে সারা ঢাকা শহরে হরতাল পালিত হবে।[১৮] জনগণের মধ্যে যে আন্দোলনমুখী মনোভাব বিরাজ করছে তা ভাসানী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সেজন্যই তিনি কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই হরতাল পালনের আহ্বান জানাতে পেরেছিলেন। তাঁর এই অনুধাবন যে সঠিক ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরদিনই।

পরের দিন হরতালকে মোকাবেলা করার জন্য সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলেও পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং হরতাল পালিত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। নিউমার্কেট, পুরানা পল্টন, নয়া পল্টন, শান্তিনগর প্রভৃতি এলাকায় বেলা ন'টার দিকে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। নীলক্ষেত এলাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণে ওয়াপদার কর্মচারী আব্দুল মজিদ নিহত হলে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ খণ্ডযুদ্ধের রূপ নেয় এবং ঐ মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন থেকে মশিউর রহমান ও নরুল আমীনের নেতৃত্বে বিরোধী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ওয়াক আউট করেন।[১৯]

৭ ডিসেম্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ভাসানী ন্যাপের পক্ষ থেকে পরের দিন অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর গোট পূর্ব বাংলায় হরতাল পালনের আহ্বান জানানো হয়। ঐ হরতাল বিরোধী দলগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগে হতে পারে কিনা এ নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক হয়, কেননা বিরোধী নেতৃত্বের অনেকের অভিমত ছিলো যে ৮ ডিসেম্বরে হরতাল আহ্বান করলে এ আন্দোলন ন্যাপের নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবে। যাইহোক, আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি, নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলাম, মস্কোপন্থী ন্যাপ ও অন্যান্যের উপস্থিতিতে জনাব সালাম খানের বাসভবনে দীর্ঘ সাড়ে ছ'ঘন্টা আলোচনার পর রাত সাড়ে বারোটায় বিরোধী দলসমূহের পক্ষ থেকে যৌথভাবে ৮ ডিসেম্বরের হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[২০] ফলে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয় ঐ হরতাল। ৬ ডিসেম্বরের জনসভায় মওলানা ভাসানী জুলুম প্রতিরোধ উপলক্ষে ১২ ডিসেম্বর যে হরতাল পালনের ডাক দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী ১২ ডিসেম্বরে গোটা পূর্ব বাংলায় পালিত হয় হরতাল। এই হরতালকে সমর্থন করে তার আগের দিন বিবৃতি দিয়েছিলেন বিচারপতি মুর্শেদ ও অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খান। হরতালের দিনে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় বায়তুল মোকাররমে। জুম্মার নামাজ শেষে মওলানা ভাসানী গায়েবানা নামাজ পড়তে গেলে তাকে বাধা দেয় ই.পি.আর বাহিনী। কিন্তু ঐ বাধাকে তোয়াক্কা না করে অনুষ্ঠিত হয় গায়েবানা জানাজা। জানাজা শেষে এয়ার মার্শাল আসগর খান জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ শুরু করলে রায়টকারের সাহায্যে সরকার জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ঐদিন চট্টগ্রামের কাছে ফৌজদারহাট রেল ষ্টেশনে জনতা খাদ্যশস্যবাহী একটি মালগাড়ি আক্রমণ করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশ গুলী চালালে ৯ জন আহত হন। ১৩ ডিসেম্বর ৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগ আহুত 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' যথারীতি পালিত হয়।[২১] ১৪ তারিখে ভাসানী পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় ঘেরাও আন্দোলনের।

উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে আইয়ুবকে উৎখাতের জন্য যে চূড়ান্ত আন্দোলন ৬৮-৬৯ সালে সংঘটিত হয়েছিলো তার প্রাথমিক ঘটনাবলি 'পশ্চিম পাকিস্তানে'র ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হলেও তাকে 'আন্দোলনের রূপ প্রদান করেন মওলানা ভাসানী। তিনি 'পশ্চিম পাকিস্তান' ও পূর্ব বাংলার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে সংযুক্ত করে আইয়ুব বিরোধী একটি ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। বস্তুত ভাসানী যদি ৬ ডিসেম্বরের জুলুম প্রতিরো[illegible] দিবসের কর্মসূচী, গভর্ণর হাউস ঘেরাও এবং পরবর্তীতে কয়ে[illegible]টি উপর্যুপরি হরতাল আহ্বান না জানাতেন তাহলে রাওয়ালপিণ্ডির ছাত্র অসন্তোষ হয়তো স্থানীয়ভাবে খানিকটা বুদবুদের মতো আলোড়ন সৃষ্টি করেই নিঃশেষ হয়ে যেতো। কাজেই ঊনসত্তরে শুধু পূর্ব বাংলা নয়, পাকিস্তান কাঁপানো আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটানোর কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য।

ঘ. ঘেরাও আন্দোলনের সূত্রপাত এবং আন্দোলনের ধারাবাহিক অগ্রগতি

ঊনসত্তরের আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হিসেবে সংঘটিত হয়েছিলো ঘেরাও আন্দোলন। ১৪ ডিসেম্বর তারিখে মশিউর রহমান ঘোষণা করেন যে পরবর্তী ২৯ তারিখ থেকে মওলানা ভাসানী 'ঘেরাও আন্দোলন' শুরু করবেন। শ্রমিক-কৃষক, সাধারণ মানুষ সহযোগে থানা বা মহকুমা অফিসার অথবা ডি.সি-দের অফিস ঘেরাও করে শান্তিপূর্ণভাবে দাবিদাওয়া পেশ করার জন্য ন্যাপের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়।

নির্ধারিত ২৯ ডিসেম্বর ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা হয় পাবনাতে। এ উপলক্ষে আয়োজিত বিশাল জনসভায় বক্তৃতা প্রসংগে সেদিন মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন যে মৌলিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থা হিসেবে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন তার দল বর্জন করবে। তিনি নির্বাচনের স্বার্থে নয় বরং আন্দোলনের স্বার্থে বিরোধীদলের ঐক্য কামনা করে দাবি করেন যে, নৌবাহিনীর সদর দফতর 'পূর্ব পাকিস্তানে' স্থাপন করতে হবে। সভা শেষে এক বিরাট মিছিল জেলা প্রশাসকের বাড়ি ঘেরাও করে এবং এর মাধ্যমেই শুরু হয় ঘেরাও আন্দোলনের পথচলা।[২২] পরবর্তীতে এই আন্দোলন বিভিন্ন কলকারখানা ও অফিস আদালতে ছড়িয়ে পড়ে।

২৯ ডিসেম্বর ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা উপলক্ষে মাওলানা ভাসানী সারা পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলের হাটবাজারে হরতাল পালনের ডাক দিয়েছিলেন।[২৩] এই হরতাল পালনকে কেন্দ্র করে সারাদেশের দৃষ্টি নিপতিত হয় হাতিরদিয়ার প্রতি। এখানে পুলিশের বেপরোয়া গুলীবর্ষণে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক আবদুস সিদ্দিকসহ কৃষককর্মী চেরাগ আলী ও হাসান আলী নিহত হন।[২৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও কৃষক সংগঠক আসাদুজ্জামান এই সংঘর্ষে আহত হন, কিন্তু আহতাবস্থাতেই তিনি ঢাকা পৌঁছে সংবাদপত্রসমূহের অফিসে হাতিরদিয়ার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বিবৃত করেন। এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদে সারাদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হাতিরদিয়ার নাম সমগ্র পূর্ব বাংলায় শহর-গঞ্জ ও গ্রামে মানুষের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে।[২৫]

ঐদিন যশোরের নড়াইলেও জনতা-পুলিশে বড় ধরনের সংঘর্ষ বাঁধে এবং এতে কয়েকজন কৃষককর্মী মারাত্মকভাবে আহত হন। এ ছাড়াও অনেককে গ্রেফতার করা হয়।

হাতিরদিয়া নড়াইলের গণহত্যা, ধরপাকড় ও জুলুমের প্রতিবাদে ১ জানু ারি প্রকাশিত প্রচারপত্রে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রামে-গ্রামে জনসভা ও ঘেরাও মিছিল অনুষ্ঠানের আহ্বান জানায়। সমিতির যুগ্ম সম্পাদক আবদুল মতিন কর্তৃক প্রকাশিত এই প্রচারপত্রে সমিতির সভাপতি মওলানা ভাসানী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেন এবং শহরের আন্দোলনের সঙ্গে গ্রামের আন্দোলনকে সম্পর্কিত করার আহ্বান জানান।[২৬]

ঐ একই সময়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষে হাজী মোঃ দানেশ একটি পুস্তিকা বের করেন। পুস্তিকায় মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বর্জন করে সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার আহ্বান জানানো হয়।

সারাদেশের রাজনীতির চেহারা যখন মোটমুটি এই -- এক দিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে পথে নেমেছেন এবং অনেক জায়গাতেই জনসমর্থন পাচ্ছেন ; যখন আইনজীবী, শ্রমিক, অটোরিকশাচালক, সাংবাদিক, কবি ও লেখক থেকে শুরু ক'রে সংগঠিত কৃষকরা স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে উচ্চকিত, তখন রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে কেবলমাত্র ভাসানী ন্যাপই সোচ্চার – তারা মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন বর্জন করে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের দাবিতে কর্মসূচী হাতে নিচ্ছেন। অন্যদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারণে সাংগঠনিকভাবে বিপর্যস্ত আওয়ামী লীগ কেবলমাত্র 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' ছাড়া অপর কোনো কর্মোদ্যাগ গ্রহণে অপারগ এবং আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে অপরাপর বিরোধীদলগুলোর সমন্বয়ে একটি মোর্চা গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে – এরকম একটা অবস্থায় ছাত্ররা ঘোষণা করেন তাদের ১১ দফা কর্মসূচী, যা আন্দোলনে নতুন গতিবেগের সঞ্চার করে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ডাকসু কার্যালয়ে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনটি সংগঠন–পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)-এর নেতৃবৃন্দ বলেন–[২৭]

'শাসন শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র জনতা ছাত্র–গণআন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই অবস্থায় সরকার বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের দিকে আগাইয়া আসিতেছেন–আমরা ছাত্রসমাজ দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত দাবিসমূহের (১১ দফা) ভিত্তিতে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করিয়া ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিবার জন্য সকল সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।'

ছাত্রদের ঘোষিত ১১ দফার দাবিগুলি ছিলো নিম্নরূপঃ–[২৮]

১। (ক) সচ্ছল কলেজগুলিকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ইতোমধ্যে যেসব কলেজ প্রাদেশিকীকরণ করা হইয়াছে সেগুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চ ক্লাসে ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে হইবে। কারিগরি, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি ছাত্রদের দাবি মানিতে হইবে, ছাত্র বেতন কমাইতে হইবে, নারীশিক্ষার প্রসার করিতে হইবে এবং শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিহার করিয়া শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(খ) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে।

(গ) শাসকগোষ্ঠির শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' ও 'হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট' বাতিল করিতে হইবে এবং ছাত্রসমাজের ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি -স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে;

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশ রক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অংগ রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্যে একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার না হইতে পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে, দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভেনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সংগে সংগে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর পরীক্ষামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিতে হইবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌ-বাহিনী সদর দপ্তর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদানকরতঃ সাব ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫। ব্যাংক, বীমা ইন্স্যুরেন্স ও বৃহৎশিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০-০০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার , নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

ছাত্রদের উপস্থাপিত উপরোক্ত ১১দফার মধ্যে ছাত্র সমস্যা কেন্দ্রিক দাবি-দাওয়ার পাশাপাশি কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ সংক্রান্ত দাবি-দাওয়াকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এছাড়া অন্তর্ভূক্ত হয় আওয়ামী লীগ ঘোষিত ৬ দফা।[২৯] ১১ দফা প্রদানের মাধ্যমে ছাত্ররা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা ছিলো অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমরা দেখবো যে ছাত্রদের ঘোষিত এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করেই বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটি আন্দোলনগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া এই সময় থেকেই শেখ মুজিবের মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবি প্রাধান্যে আসতে শুরু করে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষিত হওয়ার পরপরই ৮ জানুয়ারি তারিখে, ৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগ, জমিয়াতুল উলেমা-ই-ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) এবং পি.ডি.এম-এর অঙ্গদল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও জামাতে ইসলামী সমন্বয়ে গঠিত হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC)। তারা শেখ মুজিবের বাসভবনে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার, প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, সকল কালাকানুন বাতিল এবং শেখ মুজিবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবি করেন এবং দাবিগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণআন্দোলন জোরদার করার সংকল্প ব্যক্ত করেন।[৩০]

১২ জানুয়ারি 'ডাক' এর প্রাদেশিক সমন্বয় কমিটির এক সভায় ১৭ জানুয়ারি দাবি দিবস পালন ও বায়তুল মোকাররমে জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

অন্যদিকে, যেদিন 'ডাক' গঠিত হয় সেদিনই ৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি মৌলিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থাধীনে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ থেকে দলীয় সদস্যদের পদত্যাগের আহ্বান জানায়।

এই সময় ছাত্রদের প্রণীত ১১ দফা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে 'ডাক' নেতৃবৃন্দের একাংশ 'ডাক' ঘোষিত কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। কিন্তু 'ডাক' নেতৃবৃন্দ ১১ দফার প্রতি সমর্থন জানাতে অস্বীকৃতি জানালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৭ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় আলাদাভাবে সভা আহ্বান করে।[৩১]

ফলে ১৭ জানুয়ারি ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত হয় দু'টি পৃথক জমায়েত। একটি গণজমায়েত বায়তুল মোকাররমে 'ডাক'– এর আহ্বানে, অন্যটি ছাত্র - জমায়েত বটতলায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে। জমায়েতগুলো যাতে মিছিলে পরিণত হতে না পারে সেজন্য সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। বটতলায় ছাত্রসভা থেকে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাস্তায় নেমে পড়লে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পরবর্তীতে রঙিন পানি ছিটানো ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়। পুলিশ আহত অবস্থায় ২৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। বায়তুল মোক - রমে অনুষ্ঠিত 'ডাকে'র জনসভাতেও জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ ঘ টে। এতে জনমনে ভীষণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। পরবর্তী দিন বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ব্যাপকতা পায়। এদিন সরকারপক্ষীয় ছাত্র সংগঠন এন,এস,এফ- এর অনেক সদস্য পুলিশের বিপক্ষে সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে। ছাত্ররা পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে ই.পি.আর. টি. সি'র একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দিলে ই.পি.আর বাহিনীকে তলব করা হয়। সন্ধ্যায় ই পি.আর বাহিনী

'দুষ্কৃতিকারী'দের দমন করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে হামলা চালায়।

১৯ জানুয়ারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পুলিশী হামলার বিরুদ্ধে মিছিল বের করলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। আন্দোলনের প্রকৃতি দেখে সাধারণভাবে সবাই, এমনকি এন.এস.এফ-এর কর্মীরাও উপলব্ধি করেন যে আন্দোলন ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে। প্রাক্তন এন.এস.এফ সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক দোলন ও ডাকসুর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরীর নেতৃত্বে এন.এস. এফ-এর একটি অংশ পরবর্তী দিন অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি প্রকাশ্যভাবে সরকার বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ঐদিন বিলিকৃত একটি প্রচারপত্রের মাধ্যমে তারা শিক্ষাসমস্যা ও রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া সম্বলিত সংগ্রামী ২২ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন।[৩২]

বিগত কয়েক দিনের পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি বটতলায় ছাত্রসভা ও প্রতিবাদ মিছিলের কর্মসূচী নেয়া হয়। এবং হাজার হাজার ছাত্র সেদিন লাঠিসোঁটাসহ বটতলায় উপস্থিত হন। সভার পর মিছিল রাস্তায় নামে। ফুলার রোড হয়ে শহীদ মিনারের সামনে দিয়ে মিছিল রশীদ বিল্ডিংয়ের কাছে পৌছলে পুলিশ হামলা চালায় এবং সতর্কতার কোনো রকম ঘোষণা ছাড়াই গুলি চালায়। গুলিতে মেনন গ্রুপের ছাত্র ইউনিয়নের অন্যতম নেতা আসাদুজ্জামান মৃত্যুবরণ করেন।[৩৩] তাঁর মৃত্যু পুরো আন্দোলনের অবয়বকে পরিবর্তিত করে দেয়। এতোদিনের গণআন্দোলন আসাদের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়।

আসাদের মৃত্যুর সংবাদ ছাত্র-জনতাকে একদিকে যেমন শোকাভিভূত করে, অন্যদিকে তেমনি নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষকে উদ্দীপ্ত করে দেয়। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই যে শোক মিছিল বের হয় তাতে নেতৃত্ব দেন মেয়েরা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে গোটা পূর্ব বাংলায় তিনদিন ব্যাপী শোক ঘোষণা করা হয় এবং কর্মসূচী হিসেবে ২১ জানুয়ারি হরতাল, ২২ জানুয়ারি শোকদিবস ও ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মশাল মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৩৪]

২১ জানুয়ারি কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। রাস্তায় নেমে আসে সর্বস্তরের মানুষ। এমনকি বহু ছাত্রী হরতাল সফল করার কাজে অংশগ্রহণ করেন। ঐদিনও পুলিশ ও ই.পি.আর কয়েক রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে। এই পরিস্থিতিতে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় শহীদ আসাদের গায়েবানা জানাজা। শেষে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে যে মিছিল বের হয় তাতে অংশগ্রহণ করেন সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আগত লক্ষাধিক মানুষ। আসাদের রক্তমাখা শার্টকে সামনে রেখে অগ্রসরমান এ মিছিল সম্পর্কে পরবর্তীদিন

দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়–[৩৫]

"মিছিলে অসংখ্য কালোপতাকা ও রক্ত আঁকা ফেস্টুন বহন করা হয়। মিছিলে ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর, মহিলা, শ্রমিক, কর্মচারী, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, রাজনীতিক, পরিষদ সদস্য ও শিল্পী–সাহিত্যিকসহ সকল নাগরিক যোগদান করেন। স্মরণকালের মধ্যে এতো বড় মিছিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়নি। এই বিশাল গণমিছিলের দৃপ্তপদভারে ও বজ্রনির্মোঘ আওয়াজে ঢাকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। মিছিল যতোই অগ্রসর হতে থাকে এর কলেবরও ততোই বৃদ্ধি পেতে থাকে।" বস্তুত গণজাগরণের এক অভূতপূর্ব জোয়ার উদ্বেল করে দেয় ঢাকা শহর তথা সারা দেশকে। আইয়ুবী নিপীড়নের বিপক্ষে পরিচালিত এতোদিনকার গণআন্দোলন আসাদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। ২২ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলা থেকে বের হয় ঐতিহাসিক শোকমিছিল। ২৩ জানুয়ারি নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী সন্ধ্যায় বের হয় মশাল মিছিল। এ মিছিলে যোগদান করার জন্য বিকাল থেকে দলে দলে ছাত্রছাত্রীসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় জমা হতে থাকেন এবং সন্ধ্যার আগেই এই জমায়েতের সংখ্যা লাখকে অতিক্রম করে। ২৩ জানুয়ারি এই মশাল মিছিলকে মাহফুজুল্লাহ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বৃহত্তম মিছিল বলে উল্লেখ করেছেন। ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই মিছিল পরবর্তী কর্মসূচী হিসেবে পরবর্তী দিন অর্থাৎ ২৪ জানুয়ারি হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।[৩৬]

২৪ জানুয়ারি হরতাল মোকাবেলা করার জন্য নামানো হয় সেনাবাহিনীকে। শহরের বিভিন্ন স্থানে গুলি চলে। মৃত্যুর ঘটনা ঘটে প্রথম সেক্রেটারীয়েটের সামনে। সেখানে ছুরিকাঘাতে নিহত হন রুস্তম। পরবর্তীতে গুলিতে নিহত হন নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিয়ুর। এদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় দুপুরে পল্টনে। ঐদিনই খুলনায় গুলীতে নিহত হন আরো তিনজন। সন্ধ্যার মধ্যে ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং গভর্ণর মোনায়েম খান রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত ভাষণে ঘোষণা করেন যে শহরের নিয়ন্ত্রণভার সেনাবাহিনীর ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সান্ধ্যআইন বলবৎ থাকবে।[৩৭]

২৫ জানুয়ারি সেনাবাহিনী ও ই.পি. আর বেপরোয়াভাবে গুলি চালায়। নাখালপাড়ায় আনোয়ারা বেগম নাম্নী এক মা ঘরের ভেতর তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। এইদিন গুলিবর্ষণে মোট ৬ জন নিহত ও ১৪ জন বুলেটবিদ্ধ হন। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় সান্ধ্যআইনের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভ। করাচী, লাহোর ও পেশোয়ারে তলব করা হয় সেনাবাহিনীকে এবং সান্ধ্যআইন জারি করা হয়। ২৯ জানুয়ারি গুজরানওয়ালায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ৩ জন নিহত হন, সেখানেও সেনাবাহিনীকে তলব করা হয়।

কিন্তু এতো নির্যাতনেও ছাত্র জনতার প্রতিবাদী কণ্ঠকে রোধ করতে না পেরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে বাধ্য হয়ে আলোচনার পথ ধরতে হয়। তিনি ১৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে গোলটেবিলে বসার প্রস্তাব করেন।[৩৮] মওলানা ভাসানী আন্দোলনকে মাঝপথে স্থগিত রেখে এই গোলটেবিলে যোগদানের তীব্র বিরোধিতা করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদেও এই প্রশ্নে বিতর্ক ওঠে। জঙ্গী ছাত্রকর্মীরা চাইছিলেন আন্দোলনের অগ্রগতি। এ সময় গোলটেবিল না রাজপথ-রাজপথ, বহুলভাবে প্রচারিত হয়।

ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খান ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।[৩৯] ৭ ফেব্রুয়ারি দেশরক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়[৪০] এবং সেই অনুযায়ী ৮ ফেব্রুয়ারি 'নিউনেশন' বিল্ডিং প্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। আইয়ুব খান কর্তৃক গণদাবির আংশিক মেনে নেয়ার এই ঘটনা জনগণের বৃহত্তর বিজয়কেই ইঙ্গিত করে। তাই ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ পালন করে শপথ দিবস। ঐ দিন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় এক বিরাট জনসভা, তাছাড়া সরকারী নীতির প্রতিবাদে ঐদিন মশিউর রহমান ও আরিফ ইফতেখার এবং পরবর্তী ১২ তারিখে বিরোধী দলীয় ৭ জন পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করেন।[৪১]

ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার না করলে তারা গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবে না। তাছাড়া তাদের নেতৃত্বাধীন 'ডাক' এর পক্ষ থেকে গণদাবির সমর্থনে ১৪ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে হরতাল আহ্বান করা হয়। মওলানা ভাসানী গণদাবির সমর্থনে ১৬ ফেব্রুয়ারি জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন।

'ডাক' আহূত ১৪ তারিখের হরতাল সাফল্যজনকভাবে পালিত হয়। কিন্তু ১৫ তারিখেই ঘটে জনমনে দারুণ অবিশ্বাস সৃষ্টি করার মতো আরেকটি ঘটনা। ঐদিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহরুল হক বন্দী অবস্থায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গুলিতে নিহত হন। সরকারীভাবে বলা হয় যে তিনি পালাতে গিয়ে প্রহরীর গুলিতে নিহত হন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা জনগণ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেনি। ফলে পরিস্থিতি এমন উত্তেজনাকর দাঁড়ায় যে বিকেলে জনসভায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। সভার শুরুতেই মওলানা ভাসানী সার্জেন্ট জহুরের মৃত্যুতে গায়েবী জানাজা পরিচালনা করেন। বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন যে দু'মাসের মধ্যে ১১ দফা কায়েম ও রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়া না হলে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হবে।[৪২] তিনি আরও বলেন যে প্রয়োজন হলে ফরাসী বিপ্লবের মতো জেলখানা ভেঙে শেখ মুজিবকে ছিনিয়ে আনবো।[৪৩] সভাপর্ব শেষে শব বহনকারী মিছিল

যখন আজিমপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো তখন প্রাদেশিক যোগাযোগমন্ত্রী সুলতান আহমেদের আবদুল গনি রোডস্থ সরকারী বাসভবন থেকে জনতার উপর গুলিবর্ষণের ফলে একজন নিহত হলে উত্তেজিত জনতা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা সুলতান আহমেদের সরকারী বাসভবনে আগুন লাগিয়ে দিয়ে। এ ছাড়া আগরতলা মামলার ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস, এ, রহমান যেখানে অবস্থান করছিলেন সেই রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা, কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের পরীবাগস্থ বাসভবন এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি খাজা হাসান আসকারীর বাসভবনেও অগ্নিসংযোগ করা হয়।[৪৪] চট্টগ্রামেও ক্ষিপ্ত মানুষ জেলা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এম, এন, এ-এর বাড়ি আক্রমণ করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে।[৪৫] পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সন্ধ্যাতেই সেনাবাহিনীকে তলব করা হয় এবং সান্ধ্যআইন জারি করা হয়। অন্যদিকে তিনদিন আগেকার ঘোষণা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট সারাদেশ থেকে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত আরেকটি ঘটনা গণঅভ্যুত্থানের ঊর্মিমালায় নতুন তরঙ্গ সংযোজন করে। ঐদিন রাজশাহীতে ই. পি. আর বাহিনীর বেয়নেটের আঘাতে নিহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ সামসুজ্জোহা।[৪৬] সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের একজন শিক্ষকের এই অপমৃত্যুর সংবাদ ছাত্র জনতাকে ক্রোধান্বিত করে তোলে এবং সেদিন রাতেই প্রথমবারের মতো সান্ধ্যআইনকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নেমে আসেন। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়–'কারফিউ মানিনা' 'সংগ্রাম চলবেই' জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' শেখ মুজিবের মুক্তি চাই' 'জাগো জাগো বাঙালী জাগো' প্রভৃতি শ্লোগান। কারফিউ ভাঙার অপরাধে রাতের অন্ধকারে গুলি করে সেনাবাহিনী বহু লোককে হত্যা করে।[৪৭]

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি উজ্জ্বল ২১ ফেব্রুয়ারি তখন আগত প্রায়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় সান্ধ্যআইন প্রত্যাহার করার। অবশেষে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল পাঁচটায় সান্ধ্যআইন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় একুশের প্রস্তুতি হিশেবে বের হয় এক বিরাট মশাল মিছিল।

এই মিছিল ২১ ফেব্রুয়ারি মানুষের সামনে স্বৈরাচার বিরোধিতার এক নতুন দ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত হয়। ১৯৬৯-এ বিশেষ আন্তরিকতা ও সমারোহ সহকারে উদযাপন করা হয় শহীদ দিবস। ব্যাপক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় একুশের সংকলন। প্রাদেশিক পরিষদের [illegible]স্য জনাব নিজামুদ্দিন আহমেদ 'শহীদ দিবস' স্মরণে বিশেষ [illegible] কটিকিট প্রকাশের দাবি উত্থাপন করেন।[৪৮] এছাড়া অধ্যাপক আবদুল হাই-এর সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।[৪৯] ঐদিন কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে পল্টনে আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে ১১ দফা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন

অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষিত হয়।[৫০] গণআন্দোলনের ক্রমবর্ধমান রূপ প্রত্যক্ষ করে ঐদিন জেনারেল আইয়ুব ঘোষণা করেন যে তিনি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।[৫১]

২১ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য অভিযুক্তরা মুক্তি পান। একই সংগে নিরাপত্তা আইনে আটক অপর ৩৪ জন আসামীকেও মুক্তি দেয়া হয়। রেসকোর্স ময়দানে বিশাল এক জনসভায় শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা জানানো হয়। স্বৈরশাসন ও নিপীড়নের বিপক্ষে একের পর এক কর্মোদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে যে গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়েছে, শেখ মুজিব তার শ্রেণীস্বার্থে সেই ঊর্মিমালার সংগে না থেকে আপোষের পথ বেছে নিতে পারেন–এই আশঙ্কা ছাত্রসমাজের অগ্রবর্তী অংশে তখন ছিল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাদের এ আশঙ্কার প্রতিধ্বনি করেন মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মাহবুবউল্লাহ। তিনি বলেন যে শেখ মুজিব যদি ১১ দফার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আইয়ুব খান প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন তা হলে জনগণ তাকে ক্ষমা করবে না।[৫২] কিন্তু শেখ মুজিব বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং বলেন যে তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। দেশের উভয় অংশের পক্ষ থেকে দেশবাসীর দাবি উত্থাপন করবেন এবং সে দাবি যদি গৃহীত না হয় তবে বৈঠক থেকে ফিরে এসে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবেন।[৫৩]

শেখ মুজিব যে আন্দোলনের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছেন তা আরও পরিষ্কার হয়ে যায় ঐদিনেরই আরো একটি ঘটনায়। ঐদিন বিকেলে রেসকোর্সের কাছে পুলিশের গুলিতে ৩ জন আহত হলে জনতা মারমুখী হয়ে ওঠে। অবস্থার বিশেষত্ব উপলব্ধি করে শেখ মুজিব শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং তার এই আহ্বান রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা থেকে পুনঃ পুনঃ প্রচার করা হয়।[৫৪] এই শান্তি অন্বেষায় যোগ দেয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন 'ডাক'–এর অপরাপর সংগঠনগুলোও। ফলে জনগণ যখন আন্দোলনমুখী হয়ে উঠেছেন, দীর্ঘদিনের নিস্পৃহতার জড়তাকে কাটিয়ে তারা যখন মারমুখী হয়ে উঠছেন তখন আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থার প্রধান সংরক্ষক সরকারের শান্তি অন্বেষার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও 'ডাক' নেতৃবৃন্দও শুরু করে শান্তির অন্বেষা। এমনকি 'ডাক' ভুক্ত বাম সংগঠন মোজাফফর ন্যাপের নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় (যেমন জামালপুর–শেরপর) প্রশাসনের সঙ্গে একযোগে গিয়ে সভা ও সমাবেশ আয়োজন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।[৫৫]

কিন্তু শেখ মুজিবের নিজ সংগঠন আওয়ামী লীগ কর্তৃক ঘোষিত ৬ দফা এবং ছাত্রসমাজের ১১ দফা আদায়ের জন্য যখন আন্দোলন প্রয়োজন এবং জনগণ যখন আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত–এরকম একটি সময়ে শেখ মুজিব শান্তির অন্বেষায় এতো ব্যস্ত হলেন কেন? এই

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে গণঅভ্যুত্থান ক্রমাগতভাবে বিশেষ যে রূপটি গ্রহণ করছিলো সেই রূপের ভেতর। সে সময় শ্রেণী রাজনীতির বিকাশের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিলো সেই সম্ভাবনার ভিতর খুঁজতে হবে দলের শান্তি অন্বেষার ব্যাখ্যা। প্রাসঙ্গিকভাবেই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শ্রেণী রাজনীতির যে সব উপাদান প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিলো সেসব উপাদানের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ঙ. আন্দোলনের জঙ্গীত্বপ্রাপ্তি ও শ্রেণী রাজনীতির উপাদান প্রসঙ্গ

আন্দোলনেব প্রস্তুতিপর্বে ১৯৬৮ সালের ৩ নভেম্বর মওলানা ভাসানী জনসভায় যখন পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করে জোর বক্তব্য রাখেন, তখন ঐ সভাতেই স্বাধীন 'জনগণতান্ত্রিক' পূর্ব বাংলার শ্লোগান ওঠে।[৫৬] গণতন্ত্রের দাবিতে স্বৈরশাসন বিরোধী এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে এসে গ্রামগঞ্জ ও শহরের খেটেখাওয়া মানুষ কেবল সরকারের বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেই থেমে থাকেননি, তাঁদের একটি অংশ স্ব-স্ব ক্ষমতাবলয়ে অধিষ্ঠিত শোষণকারী শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও জনমতকে সংগঠিত করতে শুরু করেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রের পাতা উল্টালে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে পাকিস্তানের গণতন্ত্র অর্জন সংক্রান্ত কতিপয় দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পূর্বাংশে তা ক্রমশ একটি র‍্যাডিক্যাল রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। এতদাংশের গঞ্জ, শহর ও কলকারখানাগুলোতে ঘেরাও আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে। গ্রামাঞ্চলে সহযোগী পুলিশদের বিপক্ষে জনগণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ কোথাও কোথাও বিক্ষোভে বিস্ফোরিত হতে শুরু করে। নিচের উদাহরণগুলো তৎকালীন অবস্থার বিশেষত্বকে বুঝতে সাহায্য করবে-

(ক) খুলনায় আশাশুনি থানার এক গ্রামে ধানকাটা নিয়ে সশস্ত্র জনতার সঙ্গে পুলিশের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটে। জনতা সেখানে একজন কনেষ্টবলকে আটকে রাখে এবং তার রাইফেল ছিনিয়ে নেয়।[৫৭]

(খ) সাধারণ কৃষকদেরকে বিভিন্ন উপায়ে জমি থেকে উচ্ছেদের ব্যাপারে গ্রামীণ উচ্চবিত্তের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিশেবে কাজ করে রাজস্ব বিভাগের বিভিন্ন স্তরের অফিসগুলো। জনতার রুদ্ররোষ অনেক জায়গায় তাই স্বাভাবিক এদের ওপর নিপতিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি খুলনার দৌলতপুরে সংগঠিত জনতা তহসিল অফিসে আক্রমণ চালায় এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করে।[৫৮]

(গ) ঐ একইদিন প্রকাশিত সাপ্তাহিক জনতা ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনারের বরাত দিয়ে এই মর্মে সংবাদ পরিবেশন করে যে-টাঙ্গাইল মহকুমার নাগরপুরের রাজস্ব বিভাগের সার্কেল অফিসার ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে ক্রুদ্ধ জনতার হাতে নিহত হন।[৫৯]

(ঘ) ঐ বছর ২১ ফেব্রুয়ারি মানুষের সামনে স্বৈরাচার বিরোধিতার এক নতুন চেতনা নিয়েই শুধু উপস্থিত হয়নি।, পাশাপাশি তা শ্রেণী চেতনার দ্যোতনাও নিয়ে আসে। ঐ বছরে প্রকাশিত একুশের সংকলনের ব্যাপক সংখ্যাধিক্য, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব নিজামুদ্দিন আহমেদ কর্তৃক 'শহীদ দিবস' স্মরণে বিশেষ ডাকটিকেট প্রকাশের দাবী, অধ্যাপক হাই এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত টি. এস. সি'র সভায় 'ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার সংগ্রাম' চালিয়ে যাবার সংকল্প ঘোষণা, ডঃ জোহার মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে উচ্চকিত জনতার কণ্ঠে 'জাগো জাগো–বাঙালী জাগো' শ্লোগান ইত্যাদি বাঙালীর জাতীয়তা চেতনা প্রত্যক্ষ উৎসারণকেই প্রতিনির্ধিত্ব করে। পাশাপাশি, আন্দোলনমুখর একুশ যে ঐ বছর শ্রেণী চেতনার দ্যোতনাও নিয়ে আসে তার প্রমাণ হিশেবে,আমরা দেখি পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন ও ঘোড়াশাল জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে কল-কারখানায় ছুটি ঘোষণার দাবি জানাতে।[৬০]

(ঙ) ফরিদপুরের ঝিলটুনী নির্বাচনী এলাকায় মৃত্যুজনিত কারণে বি. ডি. সদস্যপদ খালি হলে উপ-নির্বাচনের তারিখে দু'একজন মনোনয়নপত্র জমা দেবার চিন্তা করলে সংগঠিত ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের মুখে সে চিন্তা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।[৬১]

(চ) আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্রদলের একাংশ শ্রমিক-কৃষকসহ নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হন এবং কোনো কোনো এলাকায় তাদের মধ্যে সহমর্মিতার সম্পর্কও গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিশেবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ১৬ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরের জানাজা ও মওলানা ভাসানীর জনসভা শেষ হবার পর ক্ষিপ্ত জনতা মন্ত্রীদের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ শুরু করলে যে সান্ধ্য আইন জারি করা হয় তা পর পর কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে। ফলে দিনমজুর ও নগরীর প্রাত্যহিক খেটেখাওয়া মানুষের জন্য রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে এবং তারা অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থাকতে শুরু করেন। এমতাবস্থায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দু'বেলায় সংলগ্ন বস্তি এলাকার প্রায় ২২০০ বাসিন্দাকে আহার করান, চাঁদা তুলে এবং মাসিক ভোজ-উৎসব বাতিল করে আহরিত অর্থ থেকে অনাহারী বস্তিবাসীদের খাওয়ানো হয়। শুধু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, শান্তিনগর, সিদ্ধেশ্বরী, বাসাবোসহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় চাঁদা তুলে বস্তিবাসীদের খাওয়ানোর এই একই ঘটনা ঘটে।[৬২]

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের গ্রামীণ জনতার রুদ্রমূর্তির সম্মুখীন সবচেয়ে বেশি করে হতে হয় ইউনিয়ন কাউন্সিলকে-কেননা প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর তথা শ্রেণীশোষণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হিশেবে সেটাই ছিলো গ্রামীণ জনতার একেবারে কাছাকাছি। জনতার এই রুদ্রমূর্তির প্রকাশ ঘটে ফেব্রুয়ারিতেই। ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে কুষ্টিয়ায় গণপিটুনিতে একজন ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান নিহত হন।[৬৩]

(জ) সে সময় ২০ জানুয়ারি শহীদ আসাদুজ্জমানের মতো আরো কিছু ছাত্র ও পেশায় নিয়োজিত রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র বা পেশাভিত্তিক আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে সম্পর্কিত করতে এগিয়ে আসেন[৬৪] এবং শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদেরকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 'আমাদের মন্ত্র জনগণতন্ত্র' শ্লোগানটি এই সময় ছাত্রদের একাংশের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে[৬৫] এবং তা ছাত্রসমাজের অগ্রণী অংশের বিপ্লবী অভীপ্সাকেই প্রতিনিধিত্ব করে। ঊনসত্তরের আন্দোলনকালীন সময়ে শ্রেণী রাজনীতির বিকাশ যে সাধিত হচ্ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারপত্রে। ৩১ জানুয়ারিতে প্রকাশিত উক্ত প্রচারপত্রে 'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রেণী সংগ্রাম যে পরিমাণ তীব্র হয়েছে তাকে আরও জোরদার করার' আহ্বান জানানো হয়।[৬৬]

বস্তুতপক্ষে আন্দোলন ও অভ্যুত্থান ক্রমাগতভাবে আরও বেশি হারে শ্রমিক-কৃষকের অংশগ্রহণ ঘটতে শুরু করার ফলে ঊনসত্তরের বুর্জোয়া দলগুলোর পক্ষে আর আন্দোলনের লাগাম ধরে রাখা সম্ভবপর হচ্ছিলো না। আর গণজোয়ারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় তাদের স্থানে জনগণই ক্রমশ ঘটনাবলির নেতৃত্ব গ্রহণ করছিলো। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসা কৃষক-জনতা নিজেরাই, অথবা ছাত্রদের সহযোগিতা ও সমর্থনে অনেক জায়গায়, তাদের শত্রু-গ্রামীণ ক্ষমতাবলয়ে অধিষ্ঠিত শোষণকারী শ্রেণীসমূহে, ইউনিয়ন কাউন্সিল, তহসীল, ইজারাদারী এবং সকল প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও শক্তি প্রয়োগহীন তথা অচল হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি '৬৯ সালের মে মাসে গণঅভ্যুত্থানের পর্যালোচনা করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে উল্লেখ করা হয় যে 'শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র এরকম নাজেহাল, বিকল ও বিপর্যস্ত বৃটিশ শাসনের দু'শ বছরে এবং পাকিস্তানের ২২ বছরে আর কোনো দিন হয়নি।'[৬৭] তাদের এই মূল্যায়ন যে সঠিক ছিলো তা বোঝা যায় ঘটনাক্রমের নিম্নলিখিত উদাহরণসমূহ থেকে।

(ঝ) ৯ মার্চ তারিখের ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক জনাব মোকাম্মেল হক এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে-বিগত কয়েকদিনে জামালপুরের কয়েকটি স্থানে ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীদের হাতে ১৩ দাগী অপরাধী নিহত হয়। তিনি এই সংক্রান্ত বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, শ্রীবর্দি, নালিতাবাড়ী, শেরপুর দেওয়ানগঞ্জ ও মেলান্দ থানার বিভিন্ন স্থানে বিগত কিছুদিন ধরে ব্যাপক সংখ্যায় গৃহে অগ্নিসংযোগ, খুন, এমনকি মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটছে। এ সমস্ত অগ্নি সংযোগ ও হত্যার শিকার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধী ও গরু চোররা, তবে আশংকা করা হচ্ছে যে-কিছুসংখ্যক নিরাপরাধ লোকের গৃহও একই সঙ্গে ভস্মীভূত হয়েছে। এ পর্যন্ত যে ১৩ জন নিহত হয়েছে তার মধ্যে শ্রীবর্দিতে ৫ জন. নালিতাবাড়ীতে ২জন, দেওয়ানগঞ্জে ১ জন এবং শেরপুরে ৫ জন। থানাগুলোর বিভিন্ন

জায়গায় অপরাধীদের ৯৬টি বাড়ী জনতা কর্তৃক ভষ্মীভূত হয়েছে। খাদ্যশস্যবাহী নৌকা লুটের ঘটনাও ঘটেছে।[৬৮]

(ঞ) জামালপুরের মহকুমা প্রশাসকের বরাত দিয়ে পাকিস্তান অবজারভারে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, মাদারগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির সীমানাভুক্ত এলাকায় ৪ জন দাগী অপরাধী ক্রুদ্ধ জনতার হাতে নিহত হয়।[৬৯]

(ট) সরকারী দল কনভেনশন মুসলীম লীগের কর্মী ও কট্টর মোল্লারা মিলে বগুড়ায় শহীদ মিনার ভেঙে ফেললে বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এই সংঘর্ষ অনতিবিলম্বে ব্যাপকতা লাভ করে এবং এক পর্যায়ে ক্রুদ্ধ জনতা কোতোয়ালী পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে।[৭০]

(ঠ) গ্রামীন ক্ষমতা বলয়ে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা আজকালকার মতো তখনও সাধারণের সম্পত্তি (Public Property) কব্জা করতে চেষ্টা করতো অথবা তত্ত্বাবধানের নামে খবরদারী প্রয়োগ করে তা থেকে ব্যক্তিগত ফায়দা লুটতো। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় নিজেদের অধিকার চেতনায় শানিত জনগণ কোনো-কোনো জায়গায় ঐধরনের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। এ রকম একটি ঘটনা ঘটে সিলেটের হবিগঞ্জে। সেখানকার 'লাখী' নামক স্থানে একটি বিলের দখল নিয়ে বিশাল সংখ্যক জনতার সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও তার দলবলের এক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে চেয়ারম্যান গুলী চালালে জনতা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং চেয়ারম্যানের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।[৭১]

(ড) আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম যেটুকু অগ্রসর হয়েছে তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে পাকিস্তানের প্রখ্যাত বামপন্থী কবি ফয়েজ আহমেদ ১ মার্চ তারিখে পার্লামেন্টে Under priviledge community সমূহের (যথা-কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও নারী) জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানান।[৭২]

(ঢ) ঢাকা জেলার প্রশাসক জনাব খুরশীদ আনোয়ার ১৩ মার্চ তারিখে বার্তা সংস্থা এ.পি পিকে জানান যে মানিকগঞ্জ, শিঙ্গাইর, ধামরাই. জয়দেবপুর এলাকায় জনতার হাতে বিগত কয়েকদিনে ৩০ জন অভিযুক্ত অপরাধী নিহত হয়। তবে বেসরকারী সূত্রের বরাত দিয়ে এ পি পি নিহতের সংখ্যা ৪৫ বলে জানায়। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত অপরাধীদের ২২৫টি বাড়ি লুট করার পর তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

শিঙ্গাইরে নিহত হয় মোট ১৫ জন। তার মধ্যে একমাত্র জয়কন্টক গ্রামেই নিহত হয় ৯ জন। অভিযুক্তদের জোর করে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে কেটে টুকরো-টুকরো করে

নদীতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে কিছু মৃতদেহকে কবর দিতেও দেখা যায়।[৭৩]

(শ) ১জন মহিলাসহ ৬ জন কুখ্যাত অপরাধী ১৩ মার্চ তারিখে জামালপুরের বিভিন্ন স্থানে জনতার হাতে নিহত হয়। এরা হচ্ছে–জামালপুর থানার তোজা, মাদারগঞ্জের আবদুল খালেক ও খবীরুননেসা, মেলান্দাহের সুবেদ আলী ও সুবুদ আলী এবং শেরপুরের আবদুল হামিদ। এরা সবাই এলাকার দাগী আসামী এবং স্থানীয় থানায় এদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কেস রুজু করা ছিলো। এদের নিহত হবার ঘটনার বিশেষ দিকটি হচ্ছে এই যে এদের দেহাবশেষ পুলিশ উদ্ধার করে প্রজ্বলন্ত আগুনের মধ্যে থেকে। এদের বিরুদ্ধে জনমনে ঘৃণা এতো প্রচণ্ড ছিলো যে এদের কারো কারো অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ আগুন থেকে টেনে বের করে জনতা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে কেটে আবার তা আগুনে নিক্ষেপ করে। ১৪ মার্চের মধ্যেই জামালপুরে জনতার হাতে নিহত হয় মোট ৩৫ জন অপরাধী।[৭৪]

(ত) মার্চ মাসের ৮ তারিখে জামালপুরের নিকলী থানার পীরপুরের কাছে নারায়ণখোলায় জনতা ১৪টি ধান বোঝাই নৌকা লুট করে।[৭৫]

(থ) নারায়ণগঞ্জে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জুয়াড়ী উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন এবং ঢাকার বেশ্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়।[৭৬]

(দ) মুন্সিগঞ্জের লৌহজং বহর বাজারে অবস্থিত ধাইদা তহসীল কাছারীর তহসীলদারের বিরুদ্ধে জনতা ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ আনে এবং গলায় জুতোর মালা পরিয়ে নিয়ে বেড়ানোর মাধ্যমে তাকে নাজেহাল করে এবং সমবেত জনতার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে।[৭৭]

(ধ)'পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সকল সমস্যার সমাধান ইসলামী সমাজতন্ত্রে'–এই উক্তি করে মওলানা ভাসানী দাবি করেন যে 'পাকিস্তানে ধনী ও গরীবের বৈষম্য দূর করতেই হবে। রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মাসিক ৫০০ টাকার বেশি বেতন পাবেন না এবং একজন শ্রমিকের বেতন হবে কমপক্ষে ২০০ টাকা। কৃষক, শ্রমিক ছাত্রসহ স্বল্প আয়ের শতকরা ৯৫ জন মানুষ তাদের বুকের রক্ত দিয়ে পুঁজিপতি, সামন্ত প্রভু, ব্লাকমার্কেটিয়ার বা পুঁজিপতিদের জন্য পাকিস্তান অর্জন করেনি–উক্তি করে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের চলমান আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজিপতিরা–আদমজী, দাউদ ও গান্ধারররা।[৭৮]

(ন) দেওয়ানগঞ্জ পুলিশ ষ্টেশনে ১১/৩/৬৯ তারিখে দায়েরকৃত একটি মামলার বিবরণ থেকেও ঐ সময়ের গণজাগরণের একটি চিত্র পাওয়া যায়। তখন সেখানে O.C. ছিলেন আতিয়ার রহমান এবং এবং কেসটির বিষয়ে জামালপুরের S.D.O. এর কাছে প্রদত্ত এক

প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন যে আব্দুল মান্নাফ ওরফে মোনাকে হারুনার রশীদ ওরফে হীরাসহ আরো ১৮ জন ব্যক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে প্রথমে মারতে মারতে হত্যা করেছে এবং পরে বহু লোকের উপস্থিতিতে তার মৃতদেহকে পুড়িয়ে ফেলেছে।[৭৯]

শেরপুরে ও জামালপুরে বিস্তীর্ণ এলাকাসহ মানিকগঞ্জ ও জয়দেবপুর অঞ্চলে ঐ সময়ে চোর-পোড়ানোর বিষয়টি বস্তুত পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ততার রূপ পরিগ্রহ করে। চোর হিশেবে যারা ছিলো কুখ্যাত, চুরি করতে গিয়ে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে এবং ফলশ্রুতিতে হাজতবাস করেছে বা জেল খেটেছে এমন ধরনের দাগী চোররাই ছিলো এসব ক্ষেত্রে এ্যাকশনের লক্ষ্য। কিন্তু থানা পুলিশ থাকা সত্ত্বেও চোবদের শায়েস্তা করার দায়িত্ব জনগণ নিজেদের হাতে তুলে নিলেন কেন? কারণ তারা বছরের পর বছর ধরে প্রত্যক্ষ করেছেন যে দাগী অপরাধীদের ধরে কর্তৃপক্ষের হাতে সোপর্দ করলে শাস্তির বিধান হয় না। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অপ্রকাশ্যে কোনো আঁতাতের ফলে তারা দিনকতক পরেই ঠিক ছাড়া পেয়ে যায় এবং আগেকার পেশায় পূর্ণোদ্যমে নিয়োজিত থাকে। অর্থাৎ আইন প্রয়োগের প্রচলিত ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে যেহেতু তাদের আর কোনো মোহ ছিলো না সেহেতু তারা বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করে নিতে তৎপর হয়। আর যেহেতু সমাজকর্তাদের একটি অংশ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধীদের মদদ জোগাত, সেহেতু জনতার রুদ্ররোষ কোথাও কোথাও তাদের ওপরও নিপতিত হয়। বিশেষত কৃষকের প্রধান সম্বল গরু চুরির ব্যাপারে শেরপুর-জামালপুর এলাকায় সমাজকর্তাদের এই অংশটির বিশেষ একটি ভূমিকা থাকতো। ঐ এলাকার চোরেরা চোরাই গরু বিক্রি করে দেয়ার ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গেই উদ্যোগ নিতো না। গরু চুরি করে এনে তোলা হতো গ্রামীণ কোনো বিত্তবান প্রভাবশালী (জোতদার, মহাজন থেকে চেয়ারম্যান মেম্বর পর্যন্ত) ব্যক্তির গোয়ালে। তারপর দালালরা গিয়ে গরুর মালিককে জানাতো যে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ অর্থ দিলে তার গরু তাকে ফেরত দেয়া হবে। আর যেহেতু নির্ধারিত পরিমাণ টাকা প্রদান না করে মালিকের পক্ষে গরু ফেরত পাবার ভিন্ন কোনো উপায় ছিলো না। আর তার প্রদত্ত টাকাটা চোর, তার এজেন্ট ও মদদ দানকারী বিত্তবানের মধ্যে ভাগাভাগি হতো।[৮০] যেহেতু প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী বিত্তবানের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া দরিদ্র ও অসংগঠিত জনগণের পক্ষে কঠিন ছিলো সেহেতু ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে তারা প্রথমেই চোরদেরকে উৎখাত করতে সচেষ্ট হয়েছে।

কিন্তু কৃষকের ঘৃণা যেহেতু শুধুমাত্র চোরের ওপরই নিপতিত হয়নি, তা তাদের মদদদানকারী ব্যক্তিবর্গ–যারা অন্যবিধ বহু উপায়েও জনগণের ওপর শোষণ, নির্যাতনকে বিস্তৃত করতো–তাদের ওপরও নিপতিত হয়েছে এবং কোথাও কোথাও এই ঘৃণাবোধ প্রতিশোধ স্পৃহায় রূপান্তর লাভ করেছে। অর্থাৎ চোরদের পোড়ানো বা তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ ঐ পর্যন্ত এসেই ক্ষান্ত হয়নি, বিকশিত একটি পর্যায়ে এসে কোথাও কোথাও

তা শোষণের কেন্দ্রীভূত শক্তি চেয়ারম্যান বা মেম্বারদের (সাধারণত বড় জোতের মালিকরাই নির্বাচিত হতেন) বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছে এবং তারাও শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন অথবা তাদেরও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শেরপুরের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। বলায়ের চর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জসিমউদ্দিন সরকার একটি কাজের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক জোগাড় করেন, কিন্তু কাজ সম্পন্ন হবার পর তাদের পারিশ্রমিক হিসেবে প্রাপ্য গম যথাযথ পরিমাণে প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেন। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমজীবী মানুষরা এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। এই ক্ষোভকে আন্দোলনের রূপ প্রদানে এগিয়ে আসেন দারোগ আলী নামের একজন ছাত্র। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গরীব ঘরের সন্তান, নবম শ্রেণীর ছাত্র এবং মেধাবী হিসেবে সুপরিচিত। সে সময় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক চেয়ারম্যান-মেম্বারের পদত্যাগ করার জন্য যে ডাক দেয়া হয়েছিলো, সেই ডাকের প্রেক্ষিতে দারোগ আলীর নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক ছাত্র গিয়ে জসিমউদ্দিন চেয়ারম্যানের বাড়ি ঘেরাও করে। তাদের সঙ্গে যোগদান করে হাজারাধিক জনতা এবং ছাত্র-জনতার এই মিলিত শক্তি তার পদত্যাগ ও শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরির দাবিতে শ্লোগানে উচ্চকিত হন। তখন চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে বলা হয় যে তিনি বাড়িতে নেই। এই কথাটি জনতা মানতে অস্বীকার করে এবং এক পর্যায়ে বাড়ীতে প্রবেশ করতে উদ্যোগী হয়। সে সময় বাড়ির ভেতর থেকে গুলী চালানো হলে দারোগ আলী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এরপর ছাত্র-জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, তারা চেয়ারম্যানের বাড়িতে প্রবেশ করে তা তছনছ করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেন।[৮১] নালিতাবাড়ি থানার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবদুল মজিদের গৃহেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এছাড়া জামালপুরের মাদারগঞ্জ থানায় এলাকাবাসীদের হাতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের ৬টি গৃহও ভস্মীভূত হয়।[৮১(ক)]

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অভূতপূর্ব জঙ্গী রূপ এবং তার মধ্যেকার শ্রেণী রাজনীতির উপাদানসমূহকে প্রাথমিকভাবে তুলে ধরার জন্য উপরের উদাহরণগুলো যথেষ্ট। গণশক্তির ঐ অভূতপূর্ব জঙ্গী প্রদর্শনী গণবিরোধী শক্তিসমূহকে স্বাভাবিকভাবে আতঙ্কিত করে তোলে। তাই আমরা দেখি যে আওয়ামী লীগসহ 'ডাক' নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের গতিকে স্তব্ধ করার মাধ্যমে শ্রেণী রাজনীতির প্রসারকে রোধ করার উদ্দেশ্যে রাজপথের পরিবর্তে আইয়ুব প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠককে বেছে নেয়। গণজাগরণের জোয়ারকে স্তিমিত করার স্বার্থেই শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। আর শান্তির এই অন্বেষায় তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার জোটভুক্ত বামপন্থী সংগঠনসমূহকেও ব্যবহার করে নেন।

১১দফার আন্দোলন যখন সর্বোচ্চ ধাপে তখন আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টিগুলো

বিভক্ত। পার্টির মস্কো-পিকিং বিভক্তি ছাড়াও পিকিংপন্থী বলে পরিচিতরা তখন দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগ সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি অন্যভাগ আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন আহমেদ, দেবেন শিকদার ও আবুল বাসারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি নামে কাজ করছে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপের) মধ্যে তখন চলছে ত্রিমুখী রাজনৈতিক সংগ্রাম-এক অংশ কাজী জাফরের নেতৃত্বের প্রতি, অপর অংশ আবদুল মতিনের নেতৃত্বের প্রতি এবং আরেকটি অংশ মূল পার্টির নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল।[৮২] পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি তখন পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতি করছে এবং সামন্তবাদকে প্রধান শত্রু হিসেবে নির্ধারণ করে রণনীতি ও রণকৌশল সাজাচ্ছে। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতিকে পরিত্যাগ করে শ্রেণীশোষণমুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলার কথা বললেও মূল শত্রু হিসেবে নির্ধারণ করছে সামন্তবাদকেই। ফলে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। এমতাবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে তৃতীয় আরেকটি মত বিকশিত হয় সিরাজ সিকদার, মাহবুবুল্লাহ ও আবুল কাসেম ফজলুল হকের নেতৃত্বে। এরা পাকিস্তানভিত্তিক চিন্তাকে পরিত্যাগ করে পূর্ব বাংলাভিত্তিক চিন্তাকেই শুধু গ্রহণ করেননি, তারা পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠির দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৮৩] তাদের এই চিন্তা ছিলো বস্তুত ১৯৬৭ সালে সিরাজ সিকদার প্রতিষ্ঠিত মাও চিন্তা গবেষণা কেন্দ্র এবং ১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি গড়ে তোলার প্রস্তুতি কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের চিন্তার প্রতিফলন। কিন্তু তাদের এই রাজনৈতিক চিন্তা তখনো সংগঠনের রূপ পায়নি।

মুজিব মুক্তি পান এবং এরকম একটা অবস্থায় শেখ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার বিবেচনা থেকেই গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে লাহোরের পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন। কিন্তু ঈদুল আজহার কারণে পরবর্তীদিন বৈঠক ১০ মার্চ পর্যন্ত মূলতবী ঘোষণা করা হয়।

৪ মার্চ তারিখে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে এবং তা সাফল্যজনকভাবে পালিত হয়নি। তথাপি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিছুটা যে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ঐদিন বিকেলের পল্টনের জনসভায়। সেখানে ছাত্রলীগ ও মতিয়া গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়ন বার বার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের আহ্বান জানায় পক্ষান্তরে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্দোলনকে জোরদার করার কথা বলা হয়।[৮৪] ৮ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান সফরের জন্য ভাসানী ঢাকা ত্যাগ করেন। এই সফরেরই এক পর্যায়ে শাহীওয়ালে জামাতে ইসলামের পাণ্ডারা তাঁর জীবননাশের উদ্দেশ্যে আক্রমণ চালায়।

গোলটেবিল বৈঠক আবার শুরু হয় ১০ মার্চ তারিখে এ সময় বৈঠকে যোগদানের সপক্ষের সংগঠনসমূহ থেকে বলা হয় যে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে দেশে পুনর্বার সামরিক শাসন আসবে। বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান 'সত্যিকার ফেডারেল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার পক্ষে জোর বক্তব্য রাখেন। কিন্তু ১০ মার্চ আইয়ুব খান ঘোষণা করেন-বিভিন্ন নেতার বক্তব্য শোনার পর তার কাছে সর্বসম্মত দাবি হিসেবে দু'টি প্রতীয়মান হয়েছে ঃ (১) প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন, (২) দেশে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থাকরণ, অর্থাৎ 'সর্বসম্মত নয়' এই অজুহাতে ছাত্রদের ১১ দফা ও আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে অগ্রাহ্য করা হয়।

আওয়ামী লীগ ঐদিনই 'ডাকের' সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এই বলে যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বাতিলের দাবি সমর্থন করতে 'ডাক' সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিব এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মর্মে হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুস সালাম খান, মাহমুদ আলী এবং মৌলভী ফরিদ আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন যে তাদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনের অভাবেই পূর্ব বাংলায় দাবি-দাওয়া আদায় করা সম্ভবপর হয়নি।[৮৬]

এদিকে যখন গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়েছে, বা মূলতবী হয়ে আবার বসছে তখন ওদিকে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল, ছোট শহর ও শ্রমিক এলাকাগুলোতে ঘটনাবলি দ্রুত এগুচ্ছে। আন্দোলন ও অভ্যুত্থানে ক্রমাগতভাবে আরও বেশি হারে শ্রমিক-কৃষকের অংশগ্রহণের ফলে শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে কম যোগাযোগ সম্পন্ন বুর্জোয়া দলগুলোর পক্ষে আন্দোলনের লাগাম ধরে থাকা সম্ভবপর হচ্ছিলো না। আর গণজোয়ারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় তাদের স্থানে জনগণই ক্রমশ ঘটনাবলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করছিলেন। ছাত্রদের মধ্যেকার একটি অগ্রবর্তী অংশ আসাদের পথকে অনুসরণ করে শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছিলেন। মওলানা ভাসানীর ন্যাপ, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির তৎপরতায় সংগঠিত কৃষকরা এবং সর্বোপরি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসা কৃষক-জনতা নিজেরাই ছাত্রদের সমর্থন, সহযোগিতা বা নেতৃত্বে তাদের শত্রু গ্রামীণ ক্ষমতার বলয়ে অধিষ্ঠিত শোষণকারী শ্রেণীসমূহ, ইউনিয়ন কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ গ্রাম্য চোর-ডাকাতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন। তাদের আক্রমণের মুখে পুলিশ, ইউনিয়ন কাউন্সিল, তহসীল, ইজারাদারী এবং সকল প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাও শক্তি প্রয়োগহীন তথা অচল হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি '৬৯ সালের মে মাসে গণঅভ্যুত্থানের পর্যালোচনা করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে উল্লেখ করা হয় যে 'শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র এরকম নাজেহাল, বিকল ও বিপর্যস্ত বৃটিশ শাসনের দু'শ' বছরে এবং পাকিস্তানের ২২ বছরে আর কোনোদিন হয়নি।'

ঐ রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে 'বহু জায়গায় কৃষকরা ছাত্রদের সহযোগিতায় বা সমর্থনের ভরসায় গরুচোরদের হত্যা করেছে, পুড়িয়ে মেরেছে , তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, চোর-ডাকাতদের হাত-পা ভেঙে দিয়েছে, তাদের খুন করেছে। বহু জায়গায় ছাত্ররা কৃষকদের সহযোগিতায় নায়েব, তহসীলদার, পুলিশ, দারোগা, সার্কেল অফিসারদের বিচার করে গলায় জুতার মালা দিয়ে ঘুরিয়েছে। ঘুষ হিসেব করে ফেরত দিয়েছে, জরিমানা করেছে, চেয়ারম্যান-মেম্বারদের পদত্যাগ করিয়েছে, বেশ্যাবাড়ি তুলে দিয়েছে, মদ-গাঁজার দোকান ভেঙে দিয়েছে, চোর-ডাকাতদের শায়েস্তা করেছে। শেখ মুজিবের মুক্তির পর ও সামরিক শাসনের আগে পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান ছিলো।[৮৬] অর্থাৎ মাসখানেক সময়ের জন্য হলেও প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিপক্ষে এবং আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থাকে টিকিয়ে রাখার সপক্ষের সংগঠনগুলো নেতৃত্বের বিপরীতে দেশের অধিকাংশ জায়গায় জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এই অবস্থা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির মতোই এদেশের উঠতি বুর্জোয়া ও সামন্তাবশেষের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহকে আতঙ্কিত করে তোলে। তাই আমরা দেখি শেখ মুজিবকে ১৯ মার্চ তারিখে বিবৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি 'শান্তি বজায় রাখার জন্য' ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মজদুর ও আওয়ামী লীগের প্রতিটি সদস্যের প্রতি আহ্বান জানাতে।[৮৭]

এরকম পরিস্থিতিতে, ১০ মার্চ তারিখে গর্ভণর মোনায়েম খানের অপসারণ ও ১২ দফা আদায়ের দাবিতে পাকিস্তান ছাত্রশক্তি ২৫ মার্চ তারিখে হরতাল পালনের আহ্বান জানায় এবং পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান রাখে। কিন্তু ২৫ মার্চের হরতালের আগেই, সপরিবারে সঙ্গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন মোনায়েম খান এবং ২৫ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শেষ বেতার ভাষণে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব। সারা দেশে নতুন করে জারি হয় সামরিক শাসন।[৮৮]

সামরিক শাসন জারি করার পরদিনই পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম-উভয় অংশেই তা আংশিকভাবে অমান্য করা হয়। বিশেষভাবে চট্টগ্রামের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে দেন।[৮৯] কিন্তু সামরিক বাহিনী শিগগিরই ঘটনাবলির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। আর সেই সঙ্গে গণঅভ্যুত্থানের উত্তঙ্গ জোয়ার স্তিমিত হয়ে আসে। জনগণের গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অনুকূলে যে সম্ভাবনা দানাবেঁধে উঠছিলো, তাকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোটির তত্ত্বাবধায়করা ক্ষমতার শীর্ষে আসীন ব্যক্তির পরিবর্তন ঘটায়, বিনিময়ে টিকে থাকে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক।

উপসংহার

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রধান ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ছিলো ভাসানীপন্থী ন্যাপ, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও আওয়ামী লীগসহ অন্যান্যের সমবায়ে গঠিত 'ডাক'। আইয়ুবী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এদের গৃহীত একের পর এক পদক্ষেপ হচ্ছে উনসত্তরের গণআন্দোলন তথা গণঅভ্যুত্থানে একটি দিকের চিত্র এবং এযাবৎকাল এই চিত্রটিই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। কিন্তু এই চিত্র নয় বরং এর উল্টোদিকের চিত্রটিই হচ্ছে উনসত্তরের মৌলিক চিত্র। সরকারী নির্যাতনের বিরোধী একটি সাধারণ লড়াই হিসেবে শুরু হলেও উনসত্তরের গণআন্দোলন প্রাথমিক চরিত্রে দীর্ঘদিন সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্রমাগতভাবে শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনে সংযুক্ত হয়েছে নতুন উপাদান। ফলে আন্দোলনের চরিত্রে অভ্যন্তরীণভাবে সাধিত হয়েছে ক্রমাগত পরিবর্তন। পরিণতিতে উনসত্তরের আন্দোলন শ্রেণী রাজনীতির উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে যে নতুন চরিত্র অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়েছে তাতে করে পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক বড় পুঁজির প্রতিভূ ক্ষমতাসীন সরকার এবং তার পাশাপাশি এদেশের বিকাশোন্মুখ পুঁজি ও সামন্তবশেষের প্রতিনিধি আওয়ামী লীগসহ অপরাপর সংগঠনসমূহ শংকিত হয়ে উঠেছে। ফলে তারা হয়ে উঠেছে শান্তির অন্বেষায় তৎপর। মওলানা ভাসানী ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে তাদের যে সহযোগীকুল ও সামন্তবাদী শোষণ ছিলো তার বিরোধী। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিপ্লবী ছিলেন না সত্য, কিন্তু নির্যাতিত জনগণের প্রতি আন্তরিক ও সত্যিকার দরদ তার মধ্যে বিপ্লবী রাজনীতির সর্বশ্রেষ্ঠ সহযোগী হবার সমস্ত গুণকে সন্নিবেশিত করেছিলো। স্বীয় দর্শন অনুযায়ী উনসত্তরের জাগরণকে তিনি 'জালেম ও মজলুমে'র মধ্যেকার একটি সংঘাত হিসেবে রূপ দেয়ার জন্য সচেষ্ট হন। এতে তিনি আংশিকভাবে সফলও হন। অনেক জায়গাতেই জনগণের মধ্যে শোষণ ও নির্যাতনের স্থানীয় কেন্দ্রগুলোকে আঘাত করার এবং পরিশুদ্ধতার সপক্ষে একটি চেতনা জাগরিত হয়। আইয়ুব বিরোধী বিক্ষোভকে 'আন্দোলনে'র রূপ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখেন তিনিই।

বস্তুত আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটানো, আন্দোলনকে কয়েক ধাপ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা ও কোনো কোনো শ্রমিক এলাকায় কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সচেতন আন্দোলনমুখীনতার বিকাশ সাধন, পশ্চিম ও পূর্বাংশের মধ্যেকার আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর ভূমিকাই ছিলো এককভাবে উল্লেখযোগ্য। উনসত্তরের আন্দোলন সংগঠনে তিনি ছিলেন প্রধান ব্যক্তিত্ব, তবে ঐ আন্দোলনের 'নেতা' ছিলেন এমন কথা বলা যাবে না। যাবে না এই কারণে যে ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়কালে যে সমস্ত ধাপে ধাপে আন্দোলন এগিয়েছে তার প্রাথমিক কয়েকটির নির্মাতা তিনি হলেও পরবর্তী দিকের অনেকগুলো তার নির্মিত ছিলো না।

সর্বোপরি, জানুয়ারির গোড়ার দিকে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত না হলে ঊনসত্তরের আন্দোলন কতোদূর এগোতে পারতো বলা শক্ত। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষিত হবার পর ঐ ১১ দফাই পরবর্তীকালে আন্দোলনের আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। মওলানা ভাসানী তার ১৪ দফার বিপরীতে ১১ দফার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবও জেল থেকে ছাড়া পাবার পরপরই ১১ দফাকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর বলে ঘোষণা দেন। অর্থাৎ ঘোষিত হবার পরক্ষণ থেকে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা অন্যদিকে বিশেষত আসাদের আত্মাহুতি, মতিয়ুর ও রুস্তমের জীবনদান ও সার্জেন্ট জহুরের মৃত্যু এবং ডঃ জোহার শাহাদাৎ বরণের ঘটনাসমূহ একদিকে জনগণের সামনে করণীয় নির্দেশক শক্তি হিসেবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত করে। সে সময় হাজার হাজার জনতা প্রতিদিন বটতলা, মধুর রেস্তোরাঁ বা ইকবাল হলে আসতেন পরবর্তী কর্মসূচীর নির্দেশ পাবার আশায়। শত শত লোক বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে আসতেন বিচারের আশায়, ছাত্ররা যে নির্দেশ বা রায় দিতেন তাই তারা মাথা পেতে নিতেন।[৯০] তা হলে কি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ? এর উত্তর না। 'না' এই কারণে যে আন্দোলনের সূত্রপাত ও ক্রমাগত অগ্রগতির ফলশ্রুতিতে গঠিত হয়েছিলো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, এই আন্দোলনের নির্মাতা তারা ছিলো না। তাছাড়া গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রশ্নে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি, ফলে তারা ঐক্যবদ্ধ কোনো বক্তব্যও জনগণের সামনে হাজির করতে পারেনি। অন্যদিকে, ঘটনাবলির দ্রুত মোড় পরিবর্তন লক্ষ্য করে আওয়ামী লীগ যখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মতোই শান্তির অন্বেষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের গরিষ্ঠ সংখ্যক অংশ সেই শান্তি অন্বেষায় অংশগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য এ ব্যাপারেও তারা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। সর্বোপরি, শেখ মুজিবের মুক্তিলাভ থেকে আইয়ুবের পতন পর্যন্ত সময়কালে শিল্পাঞ্চল ও গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে গণ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, পরিষদগতভাবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তার সংগঠনে কোনো ভূমিকা রাখেনি। তাই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঊনসত্তরের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন একথা বলা যাবেনা। আর, শেখ মুজিব যে এই আন্দোলনে-নেতৃত্ব দেননি একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা আন্দোলন গড়ে ওঠা থেকে শুরু করে মোমেন্টাম প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পুরো সময়টা তিনি ছিলেন আগরতলা মামলার প্রেক্ষিতে কারাগারে রুদ্ধ। তার সংগঠন ৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন হয় জেলে নয়তো সরকারী নির্যাতনের মুখে আধাগোপন অবস্থায়। ফলে তাদের পক্ষেও আন্দোলন গড়ে পরিচালনা করার মাধ্যমে মুজিবকে নেতৃত্বে সমাসীন করানো সম্ভবপর ছিলো না। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় শেখ মুজিব ব্যক্তিগতভাবে অনুপস্থিত থাকলেও যেভাবে নেতৃত্বে সমাসীন ছিলেন, '৬৯-এর পরিবেশ তেমন ছিলো না। বস্তুত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার (যার মধ্যে তার ৬ দফাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো) সংগ্রাম জনপ্রিয়তা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিটি সামনে আসে এবং শেখ মুজিব একটি জনপ্রিয় নামে

পরিণত হন। কিন্তু তাই বলে তিনি আন্দোলনের নেতৃত্বে সমাসীন হতে পারেননি। কার্যত: ঊনসত্তর ছিলো তার জনপ্রিয় হবার কাল, নেতৃত্বের কাল নয়। সর্বোপরি ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে তার মুক্তির পরেও মাসাধিককাল আন্দোলন এগিয়ে চলে, কিন্তু ঐ সময় শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিলো গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের এবং তথাকথিত শান্তির অন্বেষায়– অর্থাৎ ক্রমাগতভাবে শ্রেণী রাজনীতির রূপ পরিগ্রহণকারী আন্দোলনের রশি টেনে ধরার। তাই ঊনসত্তরের আন্দোলনের নেতা ছিলেন মুজিব এমন কথা বলা যাবে না।

তাহলে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছেন কে? এর উত্তর –জনগণ নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যারা জনগণের মুক্তির পক্ষের শক্তি তারা কোনো কোনো এলাকায় (জোনে) এ জনগণকে সংগঠিত করা ও নেতৃত্বে পরিচালনার কাজে ভূমিকা রাখলেও তা ছিলো বস্তুত আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ, সারা দেশব্যাপী যে জনজোয়ারের উত্তাল তরঙ্গমালা সেদিন ফেনায়িত হয়ে উঠেছিলো তাকে নেতৃত্ব প্রদানের মতো কোনো সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক প্রস্তুতি জনগণের পক্ষেকার রাজনৈতিক শক্তিগুলোর ছিলো না। ফলে জনগণের আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ততার রূপ পেয়েছে এবং স্বতঃস্ফূর্ততাকে সংগঠনের সামনে বাঁধতে না পারলে যা হয় এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। স্বল্পসময়ের জন্য আপাতদৃষ্টে বহু অসাধ্য সাধন করলেও তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয়নি। জনগণের অগ্রবর্তী অংশ শ্রমিকরা তখন কারখানা ঘেরাও করে তাদের বহুদিনের কাঙ্খিত দাবিসমূহ আদায় করে নিয়েছে, কৃষকরা গণআদালতে স্থানীয় অপরাধীদের বিচার করে বহু মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিয়েছে, আঞ্চলিক ক্ষমতাবলয়ে অধিষ্ঠিত তার শ্রেণীশত্রুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অসংগঠিত এই জনতা সামরিক শাসনের সামনে সত্বর আবার নতি স্বীকার করেছে, তার বিরুদ্ধে কোনো স্থায়ী প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। তথাপি ঘটনাবলির নিয়ন্ত্রণভার এই আন্দোলনে বস্তুত জনগণই গ্রহণ করেছিলেন। আসাদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তারা লক্ষাধিক সংখ্যায় পথে নেমে এসেছেন, ১৬ ফেব্রুয়ারি গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে মন্ত্রীদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছেন, আবার ডঃ জোহার মৃত্যুর পর কারো নির্দেশের তোয়াক্কা না করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সান্ধ্যআইন ভঙ্গ করেছেন এবং অসংখ্য জীবন দিয়েছেন। বস্তুত এই আন্দোলনে নেতৃত্ব নিয়েছেন তারাই। ঊনসত্তরের গণআন্দোলন তথা গণঅভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খানের শাসনের অবসান হয়। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণের ফলে আমরা, পুলিশ ও মিলিটারী সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে আগে যে ভীতি বিরাজমান ছিলো তা বহুলাংশে হ্রাস পায়, তাদের গুরুত্বও হ্রাস পায়। পুলিশ ও আমলাদের প্রতিপত্তি খর্ব হয়। জনসাধারণের সকল অংশের চেতনা বৃদ্ধি ঘটে। এবার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে শ্রেণীচেতনার উন্মেষে শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আংশিক সাধিত হয়। কিন্তু এসব ছাড়াই জাতিগতভাবে বাঙালীর সবচেয়ে বড় যে লাভটি হয় তা হলো এই–স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালীদের বোধের যে বিকাশ ১৯৪৮ -এর ভাষা আন্দোলনের মধ্যেদিয়ে শুরু হয়েছিলো

তা পূর্ণতায় পৌঁছে। বামপন্থীদের মধ্যেকার একটি অংশ দেবেন শিকদার, আবুল বাসার, আবদুল মতিন ও আলাউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, এবং ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের মধ্যে থেকে সিরাজ শিকদার, মাহবুবউল্লাহ, আবুল কাসেম ফজলুল হক ও আহমেদ কামালের পথযুক্ত অংশ ১৯৬৮ সাল থেকেই স্বাধীন , সার্বভৌম, 'জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছিলো। পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৮ সালেই স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক 'পূর্ব বাংলা' রাষ্ট্রের খসড়া কর্মসূচী প্রণয়ন করে তা জনগণের মধ্যে বিতরণ করে। অন্যদিকে সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার 'বিপ্লবী পরিষদে' ১৯৬৮ সালে গৃহীত থিসিসে 'পূর্ব বাংলাব জনগণের সঙ্গে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের ' দ্বন্দ্বকে' জাতীয় দ্বন্দ্ব ও প্রধান দ্বন্দ্ব, হিসেবে উল্লেখ করে। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন তথা গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বামপন্থীদের একাংশের পাশাপাশি ডানপন্থী সংগঠনভুক্ত সদস্যদের মধ্যেও এবং সাধারণভাবে জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশের মধ্যে পূর্ব বাংলায় আলাদা রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। '৬৯-এর গণআন্দোলনের সময়েই সিরাজুল আলম খান, আ. স. ম. রব, মার্শাল মনি, কাজী আরেফ, আমিনুল হক বাদশা, বাবু স্বপন কুমার চৌধুরী ও শাহজাহান সিরাজসহ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একাংশ কৌশলে স্বাধীন বাংলার স্বপক্ষে শ্লোগান প্রচারের চেষ্টা নেয়। যেমনঃ তোমার আমার ঠিকানা/ পদ্মা মেঘনা যমুনা, পিণ্ডি না ঢাকা/ ঢাকা ঢাকা, জহুরের রক্ত/স্বাধীনতার মন্ত্র।[৯১] পরবর্তীতে প্রচারিত হয় জয় বাংলা শ্লোগানটি। ১৯৭০ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরের মৃত্যুবার্ষিকীতে ছাত্রলীগের উদ্যোগে বাহিনী গঠন করে সামরিক কায়দায় মার্চপাষ্ট করা হয়। এবং 'জহুরের রক্ত/স্বাধীনতার মন্ত্র' শ্লোগান দিয়ে জহুরের মাজারে অভিবাদন জানানো হয়। পরবর্তীতে, আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় বাবু স্বপন কুমার চৌধুরী উত্থাপিত 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের' প্রস্তাব ৫৫-৭ ভোটে পাস হয়ে যায়।[৯২] যদিও এর পর ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ প্রকাশ্য রূপ নিতে থাকে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও ছাত্রলীগ প্রায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তথাপি এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে স্বাধীন বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা বাম সংগঠনে অন্তভূক্ত এটা তাদের পাশাপাশি ডানপন্থী সংগঠনের একাংশ সদস্যের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ উনসত্তরের আন্দোলন তথা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শ্রেণী শোষণমুক্ত সামাজ প্রতিষ্ঠার যে অভীপ্সা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিলো, ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাবহির্ভূত শোষক প্রতিনির্ধিদের সমবেত প্রচেষ্টায় তাকে ব্যর্থ করে দেয়া সম্ভবপর হয়, কিন্তু শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে ছাত্রলীগে সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আওয়ামী লীগকে ১৯৭০-এর নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে সমাজতন্ত্রের পক্ষে বক্তব্য উল্লেখ করতে হয়। অন্যদিকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ একটি পরিণত রূপ লাভ করে যা পরবর্তীতে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করে।

তথ্য নির্দেশ

১. মেসবাহ কামাল, 'আসাদ ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান', ঢাকা ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-১০।

২. শ্রেণী সংগ্রামের বিষয়টিকে, স্বীয় দর্শন অনুযায়ী 'জালেম' ও 'মজলুমের মধ্যেকার সংঘাত হিসেবে বর্ণনা করতেন মওলানা ভাসানী।

৩. মেসবাহ কামাল, পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১০০।

৪. Tariq Ali, Can Pakistan Survive? The death of a state, London, 1983, p-41-45

৫. ঐ।

৬. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৮। আরও দেখুন Tariq Ali,op. cit, p–48-49.

৭. মেসবাহ কামাল, পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -২৫-২৬।

৮. Pakistan Statistical Year book ও Pakistan Economic Survey র বিভিন্ন বছরের সংখ্যাগুলোর উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক নির্দেশকটি প্রস্তুত করেছেন Tariq Ali, op, cit,p–86.

৯. 'স্বাধীন সার্বভৌম ও জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা রাষ্ট্রের কর্মসূচী' পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত রণনীতি ও কর্মসূচী সংক্রান্ত দলিল, প্রকাশকাল ১৯৬৮, পৃষ্ঠা-১, দলিলটির অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে মেসবাহ কামালের 'শ্রেণীদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ', ঢাকা, ১৯৮৪-গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে।

১০. সিরাজ শিকদার, রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা—৫-১৫।

১১. দৈনিক আজাদ, নভেম্বর ৯, ১৯৬৮। আরও দেখুন মাহফুজউল্লাহ, 'অভ্যুত্থানের ঊনসত্তর' ঢাকা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৯-১০।

১২. দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর ৯, ১৯৬৮।

১৩. The Pakistan Observer, November, 1968.

১৪. দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর, ২০, ১৯৬৮।

১৫. মাহফুজউল্লাহ, পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৭-১৮।

১৬. দৈনিক পাকিস্তান, ডিসেম্বর ২, ১৯৬৮।

১৭. ঐ, ডিসেম্বর ৭, ১৯৬৮।

১৮. আবুল কাশেম ফজলুল হকের সাক্ষাৎকার।
আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক ছিলেন। নীতিবান ও স্পষ্টবাদী হিসেবে তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, রাজনীতির

সাথে এখন আর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন।

১৯. দৈনিক পাকিস্তান, ডিসেম্বর ৮, ১৯৬৮।

২০. দৈনিক পাকিস্তান, ডিসেম্বর ৮, ১৯৬৮।

২১. দৈনিক পাকিস্তান, ডিসেম্বর ১৪, ১৯৬৮।

২২. দৈনিক পাকিস্তান, ডিসেম্বর ৩০, ১৯৬৮।

২৩. সাপ্তাহিক আওয়াজ, জানুয়ারী ১৪, ১৯৬৯।

২৪. 'আজিকর এই দিনে স্মরণে জাগে তারা', ইত্তেফাক, জানুয়ারী ২০, ১৯৭০।

২৫. নির্মল সেন,'খবর'(ঊনসত্তরের স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ), সাগর বড়াল সম্পাদিত 'উপদ্রুত পলাশ' ঢাকা, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা-৬।

২৬. পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির প্রচারপত্র। প্রচারপত্রটির ফটোস্ট্যাট কপি মুদ্রিত হয়েছে মাহফুজউল্লাহ'র পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে।

২৭. মাহফুজউল্লাহ, পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫২-৫৫।

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা-৪৮-৫০।

২৯. সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফা, জানুয়ারী ১৪, ১৯৬৯; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০৫-৮।

৩০. দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারী ৯, ১৯৬৯।

৩১. আবুল কাশেম ফজলুল হকের সাক্ষাৎকার। আরও দেখুন মাহফুজউল্লাহ, পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৬০-৬১।

৩২. প্রচারপত্রটি মাহফুজউল্লাহ তার পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে পুর্নমুদ্রন করেছেন।

৩৩. 'দৈনিক সংবাদ' প্রকাশিত সংবাদ, জানুয়ারী ২১, ১৯৬৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। আরও দেখুন, দৈনিক আজাদ, জানুয়ারী ২১, ১৯৬৯।

৩৪. দৈনিক আজাদ ও দৈনিক সংবাদ, জানুয়ারী ২১, ১৯৬৯।

৩৫. দৈনিক সংবাদ, জানুয়ারী ২২, ১৯৬৯।

৩৬. দৈনিক আজাদ ও দৈনিক সংবাদ, জানুয়ারী ২৪, ১৯৬৯।

৩৭. ঐ, জানুয়ারী ২৫, ১৯৬৯

৩৮. দৈনিক পাকিস্তান, ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৬৯।

৩৯. দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক আজাদ, ফেব্রুয়ারী ১৭, ১৯৬৯।

৪০. দৈনিক পাকিস্তান, ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৬৯।

৪১. দৈনিক আজাদ, ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯৬৯।

৪২. দৈনিক আজাদ ও দৈনিক সংবাদ, ফেব্রুয়ারী ১৭, ১৯৬৯।

৪৩. ঐ, ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৬৯।

৪৪. দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক আজাদ. ফেব্রুয়ারী ১৭, ১৯৬৯।

৪৫. দৈনিক আজাদ, ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৬৯।

৪৬. দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক আজাদ, ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯৬৯।

৪৭. দৈনিক আজাদ, ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯৬৯। আরও দেখুন মাহফুজউল্লাহ, পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা–৭৪।

৪৮. দৈনিক ইত্তেফাক, প্রকাশিত সংবাদ, ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৬৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

৪৯. দৈনিক পাকিস্তান, ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৬৯।

৫০. দৈনিক আজাদ, ফেব্রুয়ারী ২২. ১৯৬৯।

৫১. দৈনিক পাকিস্তান, ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৬৯।

৫২. মাহবুবউল্লাহ, 'ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি', (বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের ১৯৮০ সালের আসাদ দিবসের সংকলন'স্মরণ'-এ ঈদ সংখ্যা বিচিত্রা ১৯৭৭ থেকে পুনর্মুদ্রণ)। আরও দেখুন মাহবুবউল্লাহ, 'আসাদ স্মরণে' 'সাগর বড়াল সম্পাদিত পূর্বে উল্লেখিত পত্রিকা।

উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান চলাকালীন সময়ে মাহবুবউল্লাহ ছিলেন একজন প্রভাবশালী ছাত্রনেতা এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। রাজনীতির সাথে এখন আর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন।

৫৩. ঐ

৫৪. মাহফুজউল্লাহ, পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা–৭৭।

৫৫. রবি নিয়োগীর সাক্ষাৎকার, শেরপুর শহরের অধিবাসী রবি নিয়োগী প্রথম জীবনে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন এবং সেখানেই মার্কসবাদে দীক্ষা লাভ করেন। বর্তমানে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি(মস্কোপন্থী, আলতাফ গ্রুপ)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে জেল থেকে ছাড়া পান। অশতিপর বৃদ্ধ এই রবি নিয়োগী রাজনীতিতে এখনো সক্রিয়।

৫৬. আবুল কাশেম ফজলুল হক ও আবদুল মান্নান খানের সাক্ষাৎকার,

আবদুল মান্নান খান উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের শহীদ আসাদুজ্জামানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে শিবপুর-হাতিদিয়ার অঞ্চলে কৃষক ও ছাত্রদেরকে সংগঠিত করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজের অধ্যাপক।

৫৭. দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারী ২. ১৯৬৯।

৫৮. সাপ্তাহিক পূর্বদেশ ও সাপ্তাহিক আওয়াজ. ফেব্রুয়ারী ২৬. ১৯৬৯।

৫৯. সাপ্তাহিক জনতা, ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৬৯।

৬০. দৈনিক ইত্তেফাক, ফেব্রুয়ারী ১৯ ও ২১. ১৯৬৯ এবং দৈনিক পাকিস্তান, ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৬৯।

৬১. দৈনিক সংবাদ, ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৬৯।

৬২. দৈনিক ইত্তেফাক. ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৬৯।

৬৩. দৈনিক পাকিস্তান. ফেব্রুয়ারী ২২,১৯৬৯।

৬৪. আবুল কাশেম ফজলুল হকের সাক্ষাৎকার।

৬৫. হামিদুর রহমান, 'আসাদ একটি মৃত্যুঞ্জয়ী নাম', 'স্বাধীকার'. আসাদ স্মৃতি সংখ্যা, ঢাকা, জানুয়ারী ২০, ১৯৭০ পৃষ্ঠা–৪। হামিদুর রহমান ছিলেন শাহীদ আসাদের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী। আসাদের মৃত্যুর মাত্র ২/৩ ঘন্টা আগেও তিনি, আসাদ , কাদের, শফি, ইকবাল প্রমুখ একত্রে আজিমপুর ওয়েষ্ট এন্ড হাই স্কুলে ধর্মঘট পালন করানোর কাজে যৌথভাবে ভূমিকা রাখেন।

৬৬. মেঘনা সংঘের নামে প্রকাশিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ঐ প্রচারপত্রটি অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। এ ছাড়া মাহফুজউল্লাহ তার পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে এটি মুদ্রণ করেছেন।

৬৭. 'ডিসেম্বর-মার্চ (১৯৬৮-৬৯) আন্দোলনের পর্যালোচনা', পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক ২৮-৫-১৯৬৯ তারিখে প্রকাশিত দলিল, পৃষ্ঠা-৫, দলিলটি পরিশিষ্ট-১ হিসেবে মেসবাহ কামাল, 'আসাদ ও ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান' গ্রন্থের শেষাংশে পুর্নমুদ্রিত হয়েছে।

৬৮. Morning News, মার্চ ১১, ১৯৬৯।

৬৯. The Pakistan Observer, মার্চ ১৩, ১৯৬৯।

৭০. Morning News, মার্চ ৩, ১৯৬৯।

৭১. দৈনিক পাকিস্তান, মার্চ ১০, ১৯৬৯।

৭২. The Dawn, মার্চ ২, ১৯৬৯।

৭৩. দৈনিক পাকিস্তান, মার্চ ১৪, ১৯৬৯।

৭৪. The Pakistan Observer, মার্চ ১৪ ও ১৫, ১৯৬৯।

৭৫. দৈনিক পাকিস্তান, মার্চ ৮, ১৯৬৯।

৭৬. ঐ, মার্চ ১৪, ১৯৬৯ ও Morning News, মার্চ ১৭. ১৯৬৯।

৭৭. দৈনিক পাকিস্তান, মার্চ ১৬, ১৯৬৯।

৭৮. The Dawn, মার্চ ৯, ১৯৬৯।

৭৯. Case No 3, Dewangonj, P.S.,dated 11-3-1969.

৮০. রবি নিয়োগী, আবদুল মালেক মিঞা ও তোফাজ্জল হোসেনের টেপকৃত সাক্ষাৎকার।

টাঙ্গাইলের সদর থানাভুক্ত বাঘিল ইউনিয়নের সয়া-সুপ্রভাত গ্রামের অধিবাসী আবদুল মালেক মিঞা ছিলেন ১৯৬৯ সালে টাঙ্গাইলের যমুনা-ধলেশ্বরীর চরাঞ্চলে সংঘটিত কৃষক-জাগরণের পিছনে প্রধান ভূমিকা পালনকারী তিন নেতার একজন। অপর দু'জন ছিলেন কসিমুদ্দিন দেওয়ান ও তোরাব আলী ফকির। এরা তিনজনই ছিলেন বৃটিশ শাসনামল থেকে মওলানা ভাসানীর অনুসারী এবং ভাসানীর নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন সংগঠনের টাঙ্গাইলের বা বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ের প্রধান সংগঠক. তবে তাদের মূল সংগঠন ছিল কৃষক সমিতি। উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানকে টাঙ্গাইলের ব্যাপক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে 'জালেম' ও মজলুমে'র সংঘাত হিসেবে, তাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এরা পালন করেন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নবতিপর বৃদ্ধ আবদুল মালেক মিঞা এখন কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত নন, তবে কেন্দ্রীয়ভাবে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া হলে পুনরায় কৃষক সমিতিতে তৎপর হতে আগ্রহী।

তোফাজ্জল হোসেন হচ্ছেন মৃত তোরাব আলী ফকিরের দ্বিতীয় পুত্র এবং খাসকাতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তোরাবগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা। পিতার পাশাপাশি তিনি নিজেও উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন।

৮১.(ক) রবি নিয়োগী ও গঙ্গেস দে'র সাক্ষাৎকার

গঙ্গেস দে শেরপুর মহিলা কলেজের অধ্যাপক এবং পিতৃসূত্রে ঐ শহরেরই অধিবাসী। রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও রাজনীতি সচেতন এবং সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে বিশ্বাসী।

৮১.(খ) মোঃ আমানতউল্লার সাক্ষাৎকার। ইনি শেরপুরের নালিতাবাড়ীর বাসিন্দা এবং একজন ছোট ব্যবসায়ী।

৮২. মাহফুজউল্লাহ, পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা–৭০-৭১।

৮৩. আবুল কাশেম ফজলুল হক ও আহমেদ কামালের সাক্ষাৎকার।

উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান চলাকালীন সময়ে আহমেদ কামাল ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও একজন প্রতিশ্রুতিবান ছাত্রনেতা। তবে, পরবর্তীতে, রাজনীতির সাথে আর প্রত্যক্ষভাবে থাকেননি। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক।

৮৪.(ক) মাহফুজউল্লাহ. পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৭৮।

৮৪.(খ) দৈনিক ইত্তেফাক, মার্চ ১৪, ১৯৬৯।

৮৫. ঐ, মার্চ ২৬, ১৯৬৯।

৮৬. 'ডিসেম্বর-মার্চ (১৯৬৮-৬৯) আন্দোলনের পর্যালোচনা', পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বে উল্লেখিত দলিল, পৃষ্ঠা-৫

৮৭. The Pakistan Observer, মার্চ ২০, ১৯৬৯।

৮৮. দৈনিক ইত্তেফাক, মার্চ ২৬, ১৯৬৯।

৮৯. সিদ্দিকুল ইসলামের সাক্ষাৎকার।

উনসত্তরেব গণঅভ্যুত্থানের সময়ে সিদ্দিকুল ইসলাম ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-এর চট্টগ্রাম শাখার একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক, এছাড়া তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সাথেও যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের চট্টগ্রাম-জেলা শাখার সভাপতি ও চট্টগ্রাম পরিবহনের শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি।

৯০. আবুল কাশেম ফজলুল হক ও আহমেদ কামালের সাক্ষাৎকার।

৯১. শাজাহান সিরাজ, মাসিক 'নিপুন'-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকার, দশম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-২৮-২৯।

৯২. ঐ।

সাপ্তাহিক গণশক্তির দৃষ্টিতে কৃষক আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৭০-৭১)

ড. আহমেদ কামাল

উনসত্তরের গণজাগরণ পরবর্তী ও ১৯৭১-এর ২৫ মার্চে ঢাকার আন্দোলনরত নিরস্ত্র জনগণের উপর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সর্বাত্মক হামলার মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ব-বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস বিবৃত করা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। নিবন্ধটিতে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় গণশক্তি নামে পরিচিত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত একটি সাপ্তাহিকীকে টেকস্ট (Text) হিসাবে পড়ার চেষ্টা করা হয়েছে; যা সাপ্তাহিকীটির কোন পুংখানুপুংখ সমালোচনা হিসাবেও ধরা যাবে না। তার মানে এই নয় যে, এর পক্ষপাত বা একদেশদর্শিতাকে দূর করার কোন ইচ্ছার দ্বারা নিবন্ধটি অনুপ্রাণিত। আসলে সাপ্তাহিকীটির সাংগঠনিক সূত্রগুলি (Organising Principales) চিহ্নিত করে উল্লেখিত সময়ে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে উনসত্তরের অভ্যূদয় পরবর্তী কৃষকদের রাজনৈতিক চেহারা ও একাত্তরের ২৬ মার্চের পূর্ববর্তী জাতীয় প্রশ্নের অবতারণার ধরণটি বোঝা এবং সর্বোপরি পূর্ব বাংলার মার্কসীয় মতাদর্শভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এ অঞ্চলের কৃষকদের সম্পর্কটি অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে সাপ্তাহিকীটির অন্তর্গত বিষয়বস্তুকে অনেক সময় ছাড়িয়ে যেতে হয়েছে।

পূর্ববাংলার সমাজে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে উনসত্তরের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই একটি তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। অন্যদিকে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলা ভাষাভাষী জনগণের জন্য জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রশ্নের অবতারণা করেছিলেন। গণশক্তি নিঃসন্দেহে শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্নটিকেই বড় করে দেখছিল যার ফলে কৃষকের মধ্যে জাতীয় প্রশ্নের বিকাশটি তার চোখ এড়িয়ে যায়। তবে এ দু'টি আদর্শই কৃষকের কাছে বাইরে থেকে আসা। অন্যদিকে গণশক্তি তার আদর্শের আদলে কৃষককে গড়তে গিয়ে কৃষকের নিজস্ব চৈতন্যকে বুঝতে ব্যর্থ হয়। আমি গণশক্তির এই ব্যর্থতাকেই

ড. আহমেদ কামাল ঃ অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বোঝার চেষ্টা করছি। প্রথমেই বলে রাখা ভালো এই ব্যর্থতা পূর্ব বাংলার ইতিহাসের এই বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়, এ ব্যর্থতা গণশক্তির দৃষ্টিভংগির মধ্যেই নিহিত-যার রাজনীতির ইতিহাস 'emancipatory narrative' এর সমস্যারই অন্তর্গত।

মূল আলোচনায় যাবার আগে সাপ্তাহিক গণশক্তির জন্মক্ষণ আর লগ্নের একটি বিবরণ দেয়া যাক। বিবরণটি এমননিতে খুব চমকপ্রদ না হলেও গণশক্তিকে বোঝার চেষ্টায় কিছুটা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। পুরানো ঢাকার এক অন্ধকার গলিতে ১৯৭০-এর ৮ ফেব্রুয়ারী গণশক্তির জন্ম এবং অন্ততঃ ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের সেই ভয়াল রাতের আগের সপ্তাহ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় সাপ্তাহিকীটি তৎকালীন পূর্ব বাংলার অন্যান্য অনেক পত্রিকার মত স্বাভাবিক অকাল মৃত্যুবরণ করেনি। পঁচিশে মার্চের গণহত্যা শুরু হওয়ার পর সাপ্তাহিকীটির সংগঠকরা আত্মগোপনে চলে যান, যার ফলে পত্রিকাটি বের করা আর সম্ভব হয়নি। গণশক্তির সম্পাদক হিসেবে ছিলেন জনাব সাইদুল হাসান (তিনি পরবর্তীতে পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক অপহৃত ও নিখোঁজ) এবং কার্যকরী সম্পাদক হিসেবে ছিলেন জনাব বদরুদ্দিন উমর। তৎকালীন পূর্ব বাংলায় এ ধরনের একটি পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য একটি অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যা কিনা প্রকাশ্যে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও সেতুং চিন্তাধারা তুলে ধরে পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করতে চেয়েছিল।

১৯৫৮-এর সামরিক আইনের পরবর্তী দশ বছরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ও আধা নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পর ১৯৭০-এর ১ জানুয়ারী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের মত প্রকাশ ও কর্মসূচী পালনের সুযোগ পায়। ১৯৬৯-এর ২৩ মার্চ থেকে দেশটি তখন দ্বিতীয় দফা সেনা শাসনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের পরিণতি ঘটেছিল আইয়ুব ও তার 'সাংগপাংগের' শাসনের সমাপ্তি ও রাষ্ট্রকে 'স্বাভাবিক অবস্থায়' ফিরিয়ে আনার জন্য সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের সূচনার মধ্য দিয়ে। তখনকার উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিক খাতে প্রবাহিত করে জনগণের ভোটে একটি সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বৈধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৬৯-এর ২১ শে ডিসেম্বরে ৬০ নং সামরিক আইনের বিধি বলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সূচনার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতে করেই গণশক্তি প্রকাশের ক্ষেত্র তৈরী হয়। গণশক্তি প্রকাশের আয়োজনের ইতিহাস বা আব্দুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির যে ধারাটি গণশক্তি প্রকাশ করে তার পূর্ণাংগ ইতিহাস আলোচ্য নিবন্ধে দরকার নেই। যেহেতু, গ্রামাঞ্চলের কৃষক আন্দোলনই এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু তাই শহরের শ্রমিকদের 'শ্রেণী সংগ্রামের' কাহিনী এ নিবন্ধে আলোচিত হয়নি।

ছয় দশকের শেষ ও সাত দশকের শুরুতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটা যদি আমরা

মনে রাখি তাহলে বুঝতে পারবো কেন গণশক্তি অন্যান্য ধারা বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালী জাতীয়তাবাদী ধারার সাথে একটি তীব্র রাজনৈতিক মতাদর্শগত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। অনেকাংশেই গণশক্তি ছিল একটি নেতিবাচক ধারার প্রতিভূ ; কেননা বাঙালী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারা সে সময় সর্বেশ্বরতাকামী (Hegemonic) মূল শক্তিতে পরিণত হয়েছে। প্রথম সংখ্যাতেই গণশক্তির প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম ছিল 'আওয়ামী লীগের গুন্ডামীর বিরুদ্ধে সর্বত্র রুখে দাঁড়ান।' সত্যি বলতে কি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সাত-এর দশক ছিল বিপ্লবী সম্ভাবনায়পূর্ণ। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনাম ও ইন্দোচীনের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, চেয়ারম্যান মাও-এর নেতৃত্বে চীনে যুগান্তকারী সাংস্কৃতিক বিপ্লব, সর্বোপরি ছিল প্রতিবেশী ভারতে নকশালবাড়ী, শ্রীকাকুলামের কৃষকদের তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম। এসব লড়াইয়ের খবরে গণশক্তির পাতা ভরে থাকত। আর তাতে করে স্থানীয় খবর ও রিপোর্টের পরিমাণ কমে যেত। গণশক্তির জীবনকালে আমাদের রাজনৈতিক শক্তিগুলির টানাপোড়নের ছোঁয়া গণশক্তির গায়েও বেশ জোরেসোরেই লেগেছিল।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়-যা কিনা গণশক্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তৈরী করেছিল পূর্ববংগের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে কৃষকরা ট্যাক্স আদায়কারী সরকারী কর্মচারীদের অফিস আক্রমণ করেছিল। তাদের দাবী ছিল ট্যাক্সের রসিদ সংগ্রহ এবং খাজনা হিসেবে অতিরিক্ত যে টাকা তারা দিয়েছে তা ফেরৎ নেয়া। যখনই এ-দাবী অস্বীকার করা হয়েছে বিক্ষুব্ধ কৃষকরা সেই অফিসগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আবার উত্তর বঙ্গের কোন কোন এলাকায় 'গণআদালত' গঠন করা হয়েছে যারা স্থানীয় শোষকদের মধ্যে নিকৃষ্টদের বিচার করেছে। অনেক জায়গায় কৃষকেরা নির্ভরশীলতার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে জোতদার, অত্যাচারী সরকারী আমলা, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং গ্রামীণ টাউট ও দালালদের আক্রমণ করেছে। তৎকালীন সংবাদপত্র, তারিক আলী, মেসবাহ কামাল ও কামালউদ্দিন সিদ্দিকীর লেখায় এর বিশদ বিবরণ আমরা জানতে পারি। তাছাড়া 'ঝগড়াপুর'-এর রচয়িতা ওলন্দাজ দম্পতির কুষ্টিয়ায় জমি দখল ও উৎপাদন সংগঠনের কাহিনীও চোখে পড়ে। খবরের কাগজের তথ্য অনুয়ায়ী ১৯৬৯ এর পহেলা মার্চ থেকে ২৩ মার্চের মধ্যে উপরে উল্লেখিত শ্রেণীর প্রায় ২০০ জনকে হত্যা করা হয় এবং দুই হাজার বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আর কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সম্মিলিত এই কর্মকান্ডকে উচ্চবর্গের (Elite) বিবরণীতে একটি Chronic আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হিসেবে দেখা হচ্ছিল। আসলে ঘটছিলোও তাই। আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য নিয়োজিত উচ্চ বর্গের শোষণ ও শাসনের যন্ত্রটিতে কৃষকেরা তখন বেশ খানিকটা ঝাঁকি দিয়েছিল।

অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাবার আশংকায় আগ্রাসী রাষ্ট্র তখন তার 'নখ আর দাঁত' বের করতে বাধ্য হয়। ১৯৬৯-এর ২৩ মার্চ সেনা শাসন জারী করা হয়। সব রাজনৈতিক

তৎপরতা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। রাষ্ট্র সরাসরি শক্তি প্রয়োগের সীমানায় অবস্থান নেয়। কিন্তু এতে করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত উচ্চবর্গের সংকট মোটেই কমেনি, বরং উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। পূর্ব বাংলায় এই সংকট দ্বৈত চেহারা ধারণ করে। কৃষকদের সোচ্চার আন্দোলন যা কিনা গণশক্তি শ্রেণী সংগ্রাম হিসেবে অভিহিত করছিল আর অন্যদিকে বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর ধাক্কা-যা কিনা '৭০-এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে-এ দুয়ের চাপে দিশেহারা পাকিস্তানী রাষ্ট্রযন্ত্র সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগে অবতীর্ণ হয়। আর এটা ঘটে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের রাত্রে।

সাপ্তাহিক গণশক্তি এই দুই সন্ধিক্ষণের মাঝেই তার জায়াগা করে নেয়। উচ্চবর্গের দলিল দস্তাবেজ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যকামী শ্রেণী ও তার সহযোগীদের এই লড়াইকে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। শুধুমাত্র গণশক্তি এই সময়ে সংঘটিত জনগণের সাথে রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার সহযোগীদের লড়াইকে বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা করে আর সেই সাথে রক্ষা করে জনগণের বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কৃষকের লড়াই এর চৈতন্যকে। কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসবেত্তা রণজিৎ গুহ যাকে 'বিদ্রোহীচৈতন্য' বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু গণশক্তি আসলে কি করতে চায়? অর্থাৎ গণশক্তির রাজনীতি সচেতনভাবে কি রক্ষা করার চেষ্টা করে? সেটা কি বিদ্রোহী কৃষককের চৈতন্যের ছবি না এটা গণশক্তির নিছক রাজনীতি? আমরা ধীরে ধীরে সেই প্রশ্নের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি।

গণশক্তির প্রথম দিনের সম্পাদকীয় একটি কাঙ্খিত অবস্থান নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। এতে লেখা হয়, 'বস্তুত: বর্তমানে আমাদের দেশে শোষিত মেহনতি জনগণের খাঁটি সংবাদপত্র একটিও নেই'। এতে আরো লেখা হয়, 'তাঁদের (কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মেহনতী জনগণ) দুঃখ-দারিদ্র, সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের সত্যিকার পথ আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো।' 'শোষিতের খাঁটি সংবাদ পত্র' ও 'সমাধানের সত্যিকার পথ দেখানোর' ইচ্ছাটি গণশক্তির তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরীতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। গণশক্তির সমস্ত লেখাজোখাই তাৎক্ষণিকতায় প্রভাবিত। এধরনের সাপ্তাহিকীতে তা হতেও বাধ্য। ঘটনার প্রাথমিক বিবরণ, পত্রিকার প্রয়োজনে তার অবিনির্মাণ এবং তাকে পাঠকের কাছে পৌছানোর প্রক্রিয়ার পরতে পরতে মতাদর্শের ছোঁয়া লেগেই থাকে। তার থেকে প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা বেশ দুঃসাধ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাগজে যা স্থান পায় তা পড়তে পারলে পাঠক আর লেখকের অনুশীলনের সংঘাতের চেহারাটা ফুটে ওঠে। অনিবার্যভাবে এই নিবন্ধেও তাই হয়েছে।

গণশক্তি প্রথম দিনেই তার করণীয়কে ব্যক্ত করেছে স্পষ্টভাবে; 'আমরা সংগ্রাম করবো শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী ধনিকদের

নিয়ে এক জনগণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের জন্য'। আরো লিখেছে, 'যারা এই সংগ্রাম করবেন, এই সংগ্রামের পুরোভাগে থাকবেন, তাদের কথাই এই পত্রিকায় স্থান পাবে।' এই কারণেই পার্টির নেতৃত্বে সিলেটের নোয়াগড় ও আজমিরীগঞ্জে, কুষ্টিয়ার করা ইউনিয়নে, ঢাকার মুন্সিগঞ্জ ও সাভারে, রংপুরের লোহানীপাড়া ও রাজশাহীর শিবগঞ্জের কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামেরর কাহিনী গণশক্তিতে স্থান করে নিতে পেরেছে। এই সব সংগ্রাম ছিল মূলত মহাজন, জোতদার, ইজারাদার ও ছোট ছোট সরকারী আমলার বিরুদ্ধে। এই সকল সংগ্রামকে পত্রিকার পাতায় জায়গা করে দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের সমাজতন্ত্র ও মুক্তির জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে কৃষকের সংগ্রামকে অন্তর্ভূক্ত করা। এই উদ্দেশ্যের কারণে গণশক্তি emancipatory narrative এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে।

গণশক্তি তৎকালীন পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থাকে আধা সামন্ত ও আধা উপনিবেশবাদী হিসেবে চিত্রিত করে। যেহেতু বৃটিশরা এই সব সামন্ত ও দেশীয় পুঁজিপতিদেরকে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে মদদ জুগিয়েছিল তাই সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্তবাদের এই মিত্রদেরকে উৎখাতের একমাত্র উপায় ছিল চীনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুকরণে ভূমিহীন, ক্ষুদে কৃষকের ঐক্য তৈরী ও ভূমিহীন কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও শোষণের স্বরূপ অন্বেষণে লিপ্ত হওয়া। বোধ হয়, প্রথমবারের মত কোন বামপন্থী সাপ্তাহিকীতে এ ধরনের প্রচেষ্টার খবর আমরা পাই। চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির অনুকরণে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই অনুসন্ধান চালানো হয়। এই পর্যবেক্ষণের ফলে গণশক্তির পাতা জুড়ে বিভিন্ন জেলার অন্ততঃ বাইশটি রিপোর্ট আমাদের চোখে পড়ে। রিপোর্টগুলিতে মহাজনী, ইজারাদারী, জোতদার ও আমলাদের শোষণের এক করুণ চিত্র ফুটে উঠে। যার থেকে আশা করা হয় কৃষকেরা এই সকল শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। গণশক্তিতে ১৯ জুলাই সংখ্যায় 'খুলনার একটি গ্রামে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন' এই শিরোনামে লেখা হয় যেঃ

> স্বাভাবিকভাবেই এই চরম শোষণের ফলে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের অন্তরে জ্বলছে বিক্ষোভের আগুন এবং সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। এই রূপ কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের ঘটনা কিছুদিন আগেও এই গ্রামে ঘটেছে।

পূর্ব বাংলার কৃষকদের শোষণ-বঞ্চনার অবস্থা ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ১০ মে গণশক্তি ঘটনা প্রবাহ কলামে লেখেঃ

> সারা পূর্ব বাঙলায় আজ এক দারুণ অস্থিরতা বিরাজ করছে। এই অস্থিরতা এখনো পর্যন্ত কোন সুষ্ঠ রাজনৈতিক পথে পরিচালিত না হওয়ার ফলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে সমগ্র প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় নানা ঘটনা ঘটে চলেছে। এগুলির

মধ্যে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহাকুমার পাটকেলঘাটার চোর বদমায়েশদের উপদ্রব বহুদিন থেকেই সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছিলো। জোতদার মহাজন ও পুলিশের যোগসাজসে সেখানে এই উপদ্রব রীতিমতভাবে একটা সাংগঠনিক চরিত্র লাভ করেছিলো এবং এর ফলে সেই এলাকায় কৃষকদের উপর এই নির্যাতনের কোন প্রতিকার ছিলো না। কাজেই কৃষক শ্রমিকেরা 'গণ আদালত' গঠন করতে বাধ্য হয়।

এতে আরো বলা হয় ঃ

> গ্রামাঞ্চলের আসল সমস্যাকে এইভাবে এড়িয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে আজ স্থানীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেখা যাচ্ছে স্থানীয় তৎপরতা। স্থানে স্থানে গড়ে উঠছে সংস্কারবাদী ছোট ছোট এলাকা ভিত্তিক সংগঠন।

এবং শেষে তারা বলে যে 'এ সংগঠনগুলির কোন রাজনৈতিক চরিত্র নেই।' এ বক্তব্যে পাটকেলঘাটার সংগ্রামকে অবজ্ঞা করার প্রবণতাও দেখা যায়।

কিন্তু পরের সপ্তাহেই পাটকেলঘাটার বিশদ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টটি যেন সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের প্রচলিত কাহিনীর সামিয়ানা ছিঁড়ে মঞ্চের মাঝখানে হাজির হয়। রাষ্ট্রযন্ত্র ও অন্যান্য শক্তির বিরুদ্ধে কৃষকের নিজস্ব উদ্যোগের কাহিনী এই রিপোর্টটি গণশক্তি দুই পৃষ্ঠা জুড়ে ছেপেছে। এই আন্দোলনটি গণশক্তির রাজনৈতিক কর্মসূচীর বহির্ভূত। তাই নিঃসন্দেহে এতে 'রাজনৈতিক চরিত্রের' অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যুক্তি বিস্তারের প্রয়োজনে রিপোর্টটির একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল যা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মাও সেতুং-এর হুনান রিপোর্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পার্থক্য শুধুমাত্র হুনানের কৃষকেরা পার্টির নৈকট্যে থেকে নয়াগণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছিল আর পাটকেলঘাটার কৃষকেরা নিজেরাই এ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি সেখানে হতবাক দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এ আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল। রিপোর্টটি নিম্নরূপ ঃ

> তালা থানার উত্তরাংশ ও কেশবপুর থানার দক্ষিণাংশে বিগত কয়েক বৎসর যাবত চোর ডাকাতের উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তালা থানার ধানবাড়িয়া, তেরছি, আড়ংপাড়া, কাল্মপাতা, গৌরিপুর, কেশবপুর থানার মমীনপুর, ফতেপুর, হিজলডাংগা, সাগরদাড়ী প্রভৃতি স্থানের চোরেরা চুরি করতো। যশোর জিলা এলাকায় চুরি হলে খুলনা এলাকায় পাচার করা হতো। মমীনপুর, গৌরিপুর, আড়ংপাড়া, ফলপোতা প্রভৃতি কয়েকটি স্থান চোরের ঘাটিতে পরিণত হয়েছিল। এই গরু চুরির পূর্ব ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় কয়েক

বৎসর পূর্বে এই এলাকায় কালোবাজারীরা সর্বপ্রথম গরু চুরি আরম্ভ করে। কালোবাজারীরা একে অপরকে ঠকাতে চেষ্টা করলে প্রথম দল সামনা সামনি না পারলে রাতের আঁধারে শেষোক্ত দলের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদের ও তাদের প্রতিবেশীদের গরু রাতের আঁধারে সীমান্তের অপর পারে পাঠিয়ে দিত।

ধরুণ এক গৃহস্থের সম্বল মাত্র দুটি গরু রাত্রে চুরি হয়ে গেল। গৃহস্থ নিরুপায় হয়ে ছুটে গেল গ্রাম্য মেম্বর অথবা মাতব্বরের কাছে। তিনি তাকে খোঁজবার আশ্বাস দিলেন এবং খোঁজার ভান করে সমস্ত দিন ঘুরে সন্ধ্যা বেলায় বললেন, যে, গরু পাওয়া যাবে বটে তবে ২০০.০০ (দুই শত) টাকা লাগবে। গৃহস্থ নিরুপায় হতাশাগ্রস্ত। সুতরাং বাধ্য হয়ে সে শেষ পর্যন্ত মেম্বার অথবা মাতব্বরের হাতে টাকা অথবা জমি লিখে দিতে বাধ্য হল। মেম্বার অথবা মাতব্বর সাহেব উক্ত টাকার ভেতর থেকে নিজেও একটা অংশ রেখে বাকীটা চোরদের ভেতর ভাগাভাগি করে দিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা জানি যে একটা গরু চুরির ব্যাপারে চোরেরা ৩০০.০০ (তিন শত) টাকা পায়। একজন চোরকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কত পেয়েছ? সে বলেছিল আমরা তিনজনে চুরি করেছিলাম এবং প্রত্যেকে ১০.০০ (দশ) টাকা করে তিনজনে ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা পেয়েছি। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম ৩০০.০০ (তিন শত) টাকার ভিতর আরগুলি কোথায়? তারা প্রথমে আমাকে সে বিষয়ে বলতে রাজী হয়নি। পরে অবশ্য বলেছিল যে, আমাদের ভাগ শতকরা ১০.০০ (দশ) টাকা, যেখানে মাল লুকিয়ে রাখা হয় সেখানে কিছু লাগবে। ইহা ব্যতীত থানা, ইউনিয়ন কাউন্সিল, পুলিশ চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতির জন্য ধরা থাকবে। সর্বোপরি আইনের রক্ষক পুলিশের সঙ্গে চোরদের পাকাপাকি বন্দোবস্ত থাকার ফলে চোরদের বিরুদ্ধে কোন এজাহার নেয়া হয় না। পুলিশ, চোর, থলেদার, দালাল, মেম্বার, চেয়ারম্যান প্রভৃতির যোগে গ্রামের গরীব ও মধ্যবিত্তদের উপর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। দিনে দুপুরে পুলিশের নজরের উপর চুরি ডাকাতি আরম্ভ হয়। এই দারুণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য জনগণ সচেষ্ট ও সংঘবদ্ধ হতে থাকে। যশোর জেলার কেশবপুর থানার কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোক এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দুর্নীতি দমন কমিটি বা দুরমুজ পার্টি গঠন করেন। দুরমুজ পার্টি স্থানীয় চোর ডাকাতদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তার ফলে চোরেরা তাদের আসল মুরুব্বীদের নাম প্রকাশ করতে থাকে। জনতার অফুরন্ত শক্তির নিকট প্রতিক্রিয়াশীলরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার ভেতর দিয়ে জনগণ গণআদালত গঠন-পূর্বক অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করতে থাকে। পুলিশের সহায়তায় যে চোর দস্যুর দল এতদিন অপ্রতিহত গতিতে বিচরণ করছিল

জনতার আদালতে জনতার বিচারে তারা সন্ত্রস্থ হয়ে কেহবা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল, কেহবা জনতার আদালতে আত্মসমর্পন করল। অনেকে পূর্বাপরাধ স্বীকার করে ভবিষ্যতে ভাল হয়ে চলবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। বড় বড় কয়েকজন ডাকাত তাদের মুরুব্বী পুলিশের পরামর্শে গণ-আদালতে হাজির হতে অস্বীকার করে এবং গণ-আদালতের তরফ থেকে যারা তাদের সমন দিতে গিয়েছিল তাদের কয়েকজনকে প্রহার করে। এতে জনগণ ভীষণভাবে উত্তেজিত হয় এবং হিজলতলা গ্রামে উক্ত ডাকাতদের বাড়ী ১০/১২ হাজার লোকে আক্রমণ করে। ৯টা ঘর মাটির সংগে মিশিয়ে দেয়। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এর প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসে। কিন্তু প্রতাপপুর মাঠে সুশৃঙ্খল ও বিরাট জনতা দেখে সরকার পিছু হটে। দুরমুজ পার্টি আপাতত রক্ষা পেল। ডুমুরিয়া থানার চুকনগরের নিকটবর্তী চাকন্দী গ্রামে বল্লাসাজ্জাত ও তাদের যারা এ অঞ্চলের বড় বড় নরহত্যাকরী, বড় বড় ডাকাতদের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ শুনা যায়, পুলিশ এ যাবত তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। গ্রামের লোক শেষ পর্যন্ত উক্ত বল্লাসাজ্জাতকে ধরে এবং গণ আদালতে হাজির করে কঠোর শাস্তি প্রদান করে। বল্লাসাজ্জাতের ডাকাতি বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে। অবস্থার এতদূর উন্নতি হয়েছে আজ তিন মাসাধিক কাল যাবত কেশবপুর, ডুমুরিয়া ও তালার যে যে অঞ্চলে দুরমুজ পার্টি হয়েছে সেখান থেকে কোন কেস থানায় যায়নি। তালা থানায় প্রথমে লাউতাড়া, শুভাসিনী, শিরাগুশিম, তেরছি, কালাপাতা, ধলবাড়িয়া, পরে কুমিরা ও ইসলামকাঠি ইউনিয়নের দুরমুজ পার্টি গঠিত হয়, এরও পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। (গণশক্তি, ১৭/৫/৭০, পৃঃ ৩,১০-১১)।

কিন্তু রাষ্ট্র এই 'অরাজনৈতিক' গণসমাবেশকে সহ্য করতে অস্বীকার করে। আমলারা কৃষকদের এই বিপ্লবী অনুশীলনে 'রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব' খুঁজে পায়। ফলে তড়িৎ গতিতে বড় আকারের শক্তি সমাবেশ করে একে দমন করা হয়। পুলিশের গুলিতে ছয়জন কৃষক মারা যায় এবং ২৩ জন আহত হয়।

আঠার শতকের ফরাসী দেশের গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের বিদ্রোহের কথা মিশেল ফুঁকো তাঁর Dicipline and Punish বইতে উল্লেখ করেছেন। গ্রামের সমাজ-বিরোধী শক্তি আর পুলিশের যোগসাজসের বিরুদ্ধে তখন জনগণের বিদ্রোহ ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এই সব অবস্থায় জনগণ delinquent দের শাস্তি দেয়ার জন্য নিজেদের হাতেই আইন তুলে নিত। এই প্রক্রিয়া ফরাসী সমাজে ক্ষমতার সম্পর্কের বিবর্তনে কি প্রভাব বিস্তার করেছিল ফুঁকো তার ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু গণশক্তি একে সংগঠন-বহির্ভূত জনগনের স্থানীয়

স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের নমুনা হিসেবেই শুধু দেখেছে। বুঝতে চেষ্টা করেনি এ বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে জনগণ নিজেদের সমাবেশ ও চৈতন্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কি ধারণা দিয়েছে।

যে রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা অর্থাৎ যে বিশেষ বিপ্লবী রাজনৈতিক চর্চায় গণশক্তি তখন লিপ্ত ছিল তাতে এ ধরনের অবস্থার সম্যক উপলব্ধি হয়ত সম্ভব ছিল না। যে প্রশ্ন আমি উত্থাপনের চেষ্টা করছি তা হচ্ছে গণশক্তির মার্কসবাদ চর্চার দার্শনিক ভিত্তি কি ছিল?

গণশক্তি সংগঠন বহির্ভূত কৃষকের 'স্বতঃস্ফূর্ত' অনুশীলনীকে বুখারিন-এর ম্যানুয়াল অনুযায়ী অনুধাবন করার চেষ্টা করেছে। বুখারিন পার্টি কর্মীদের মধ্যে মার্কসবাদ অনুশীলনের জন্য সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সমালোচনাকে মখ্য করে তুলেছিলেন, কিন্তু-শ্রমিকশ্রেনীর নিজস্ব চিন্তা, চেতনা ও কর্মকাণ্ডকে পাত্তা দেননি, আসলে যে পৃথিবীটা শ্রমিকেরা চেনে সেই পৃথিবীটাকে একেবারেই অবজ্ঞা করা হয়েছে বুখারিনের ম্যানুয়্যালে। এই ম্যানুয়ালের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণীকে শিক্ষিত করা। ইউরোপে মার্কসবাদ চর্চার এই ভ্যানগার্ড ঐহিত্যের একটি সমালোচনামূলক আলোচনা এখানে করা সম্ভব না। তবে এই ঐতিহ্যকে লেনিন ও স্ট্যালিন আরো অনেক জোরালো করে তুলেছেন তাদের কাজে ও চিন্তায়। জনগণের বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত কর্মোদ্যোগকে লেনিন জোরেসোরে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। তাঁর 'কি করনীয়' গ্রন্থে লেনিন লিখেছেন 'Hence our task, the task of social democracy, is to combat spontaneity' লেনিন জোর দিচ্ছেন সংগঠনের উপর-It is a struggle for power ; the proletariat has no other weapon but organization. সংগঠনই হচ্ছে সর্বহারার মুক্তির সংগ্রামের 'Knowing subject'. সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে গণশক্তি সেই দায়িত্বই পালন করেছে। ইউরোপীয় ঐতিহ্যের আর একজন শক্তিধর স্রষ্টা ইতালীর অ্যান্টোনিও গ্রামসী মনে করতেন কৃষকেরা as a mass are incapable of giving a centralised expression to their aspirations and needs বাইরের নেতৃত্ব ছাড়া নিম্নবর্গের (Subaltern বা নিম্নবর্গ কমসেপ্টটি গ্রামসী ব্যবহার করেছিলেন 'শ্রমিক শ্রেণী' ব্যবহারের পরিবর্তে ফ্যাসিষ্ট কারাগারের সেনসরশীপ এড়াবার জন্য। তবে এখন কনসেপ্টটি তার নিজস্বতা অর্জন করেছে।) আন্দোলন 'anarchic turbulance' হতে বাধ্য। তবে লেনিনের চিন্তা ও গ্রামসীর চিন্তার যে পার্থক্য সেটা আলোচনার তেমন সুযোগ এখানে নেই। মনে রাখা প্রয়োজন যে, নিম্নবর্গের সৃষ্টিশীলতার এলাকাটি গ্রামসীর চোখে অনেক বেশী ধরা পড়েছিল লেনিনের চাইতে।

লেনিন অন্যান্য মতাদর্শ ও ধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক পার্টি লাইনের উপর অনেক জোর দিয়েছেন এবং সর্বোপরি পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণীর স্থলাভিষিক্ত করেছেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড উদ্ভাবন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে। গ্রামসী ভেবেছিলেন শ্রেণী সচেতনতা যা

বিপ্লবী কর্মকান্ডের মৌলিক উপাদান, কেবলমাত্র একটি সামাজিক শক্তির (Social force) ভেতর থেকে আসতে পারে। এটা বাইরে থেকে চাপানোর ব্যাপার নয়। সেই কারণেই নিম্নবর্গের 'স্বতঃস্ফূর্ত' ও 'মৌলিক' আবেগকে অবহেলা করার পরিবর্তে বুঝতে হবে, এমনকি বিকশিত করতে হবে; নিম্নবর্গের বিশ্বাস ও চৈতন্যকে গ্রামসী অনুমোদন করেছেন; সেটা ঠিক এই জন্য নয়, বরং এগুলি জনগণের জীবনের চেহারা ও প্রকাশ বলে–যা কিনা কোন বিপ্লবীই উপেক্ষা করতে পারেন না। যে সব মার্কসবাদী সঠিক আন্দোলনের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগ সচেতনতা খুঁজতেন 'প্রিজন নোটবুকে' গ্রামসী তাদেরকে অনেকবার সমালোচনা করেছেন। গ্রামসীর রাজনৈতিক জ্ঞান তাকে শিখিয়েছিল যে, 'reality produces a wealth of the most bizzare combinations of beliefs and expectations'

গণশক্তি যে ভাবে পাটকেলঘাটার কৃষক আন্দোলনকে 'অরাজনৈতিক ও স্বতঃস্ফূর্ত' আখ্যা দিয়ে বিপ্লবী কর্মকান্ডের জন্য অপ্রয়োজনীয় বলতে চেয়েছেন, গ্রামসী এটাকেই 'absurd' বলেছেন। গ্রামসীর মতে, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের কাজই হচ্ছে ঐ সকল অশুদ্ধ কর্মকান্ডের জটিলতা উন্মোচন করা এবং ঐতিহাসিক জীবন প্রক্রিয়াকে তাত্ত্বিক কাঠমোর মধ্য নিয়ে আসা, নিম্নবর্গের উদ্যোগকে খুঁজে বের করা এবং সর্বোপরি লুকিয়ে থাকা শ্রেণী চেহারাটা খোঁজা যাকে বিকশিত করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা যাবে। সেই উদ্যোগ ও সচেতনতা না থাকলে মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণা ও বিপ্লবী কর্মকান্ড বিফল হতে পরে। আসলে হয়েছেও তাই।

গণশক্তির দৃষ্টি অনেকটা অর্থনীতিবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন। পাকিস্তানের জাতিগত নিষ্পেষণ যুগে প্রচলিত বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলির সাহায্যে তখনকার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে সমগ্রভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, এবং সম্ভব নয় বলেই নিম্নবর্গের ভূমিকা উপেক্ষিত হতে থাকে। কৃষকের শোষণের চেহারা ধরতে গিয়ে গণশক্তি সরাসরি অভিজ্ঞতালব্ধ অনেকগুলি বিবরণ হাজির করেছেন–কৃষকের অর্থনৈতিক শোষণের রূপ ও শোষকের বর্ণনা কৃষকের অবস্থা বোঝার এই তাগিদটা জরুরী এবং এই জরুরী কাজটি গণশক্তি করেছে, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু একাজটি যে কোন আধিপত্যকামী অথবা সর্বেশ্বরতাকামী শ্রেণী বা গোষ্ঠীও করে থাকে। ইংরেজের আগমনের প্রায় প্রথম যুগ থেকেই কৃষকের অবস্থা জানার তাগিদ পরিলক্ষিত হয়। Colebrooke, Buchanan-Hamilton-এর লেখাতে বুর্জোয়া সমাজ-বিজ্ঞানের প্রয়োগও দেখতে পাই। প্রয়োজনটা বেন্টিক যখন মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জের গভর্নর তখনই অনুভূত হয়েছিল। অন্ততঃ জেমস মিল সে কথাই ১৮১৭-এর The History of British India-তে উল্লেখ করেছেন।

ভারতের উচ্চবর্গের নেতৃত্বে স্বাধীনতার লড়াইয়ে জনগণের অর্থনৈতিক শোষণের রূপরেখা জানার চেষ্টা হয়েছে। দাদাভাই নরৌজী, রাধা কমল মুখার্জী এবং আরো অনেকে এ কাজ

করেছেন। সর্বেশ্বরতাকামী শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে তার সর্বেশ্বরতার বা ক্ষমতার পরিধি বাড়ানোর জন্য এ কাজটি করতে হয়। শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি গণশক্তিকেও একাজটি করতে হয়েছে।

তবে গণশক্তির পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্য কি? এই বৈশিস্ট্য আলোচনায় রণজিং গুহ-র যুক্তি ধার করা যেতে পারে। যে সমাজে জাতিগত নিপীড়ন চলে সে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে প্রভু ও অধীনস্থের সম্পর্কটি যে বিশিষ্টরূপে প্রকট হয় তা শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। অর্থনীতির যে কাঠামোটা আশ্রয় করে সেই সম্পর্ক প্রধানতঃ গড়ে উঠে তা হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থা। আর শোষক-শোষিতের সম্পর্কটি অর্থনৈতিক জীবনে প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্কের বিশিষ্ট প্রয়োগ মাত্র। মনে রাখা দরকার জাতিগত নিপীড়ন যেখানে বিদ্যমান সেখানে নিম্নবর্গের ইতিহাসে নিছক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলে কিছু নেই। ধনতন্ত্রের পূর্ববর্তী অন্য যে কোন সমাজের মতো সেখানেও অর্থনীতির অন্তর্গত সব সম্পর্কই আসলে ক্ষমতার সম্পর্ক বা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে রাজনীতির সম্পর্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। মজুরীর হার, খাজনার হার, সুদের হার, সেখানে অবাধ কেনাবেচা চাহিদা যোগানোর নিয়ম অনুযায়ী চলেনা। চলে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় সমাজে মালিক জমিদার মহাজনের প্রতিপত্তি ও শাসনের নিয়ম অনুযায়ী।

গণশক্তি'র দৃষ্টি এই রাজনীতি বাদ দিয়ে অর্থনীতির মধ্য আটকে ছিল। সামন্ত শোষণের চিত্র, পাইকগাছার আমাদি ইউনিয়নের, মুন্সীগঞ্জের বজ্রযোগীনির, রংপুরের গাইবান্ধার, কুষ্টিয়ার কয়া ইউনিয়নের রিপোর্টে এসেছে। কিন্তু প্রাধান্যে এসেছে অর্থনৈতিক শোষণ, অর্থনীতির মাপকাঠি ভিত্তিক শ্রেণী-বিন্যাস এবং অবশ্যম্ভাবীভাবেই এসেছে সংগ্রামের কর্মসূচী। জাতিগত নিপীড়ণের মূল যন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করেই সে তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, আর তত্ত্ব ভিত্তিক শ্রেণী খোঁজার কাজটিও সমাধা হয়েছে। খেয়াল করা হয়নি যে, কৃষকের কত জমি আছে, কত খাজনা বা কর তাকে দিতে হয়, সুদে আসলে তার কাছে মহাজনের কত পাওনা, ফসলের দর ও লাভ-লোকসানের হিসেব তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একপেশে, সুতরাং অর্থহীন বর্ণনায় পর্যবসিভ হতে পারে। কারণ কৃষক জীবনের সত্য এ তথ্যগুলির মধ্যে বিদ্যমান নয়। প্রভুত্ব ও অধীনতার যে বিশিষ্ট সম্পর্ক এ সব তথ্যের ধারক তারই মধ্যে কৃষক জীবনের সত্যকে সন্ধান করতে হবে, সেই সত্যের আলোকেই ঐ সব তথ্য অর্থময় হয়ে উঠবে।

তৎকালীন পূর্ব বাংলার গ্রাম জীবনে সেই সম্পর্কের মূল কথা জমির মালিক, মহাজন ও সরকার-এই ত্রিশক্তির সংগে কৃষকের ক্ষমতার সম্পর্ক। এই ত্রিশক্তির একটি শক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রের সংগে কৃষকের ক্ষমতার সম্পর্কের দিকটিকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জনগণের আত্মবিকাশের প্রধান অন্তরায় হিসেবে তাদের রাজনীতিতে তুলে

ধরতে পেরেছিল। একই সময়ে গণশক্তির রাজনীতি অর্থাৎ অন্য দুই শক্তির সাথে কৃষকের সম্পর্কের বৈরীতার দিকটি পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে প্রধান হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এ ব্যর্থতার গভীর কোন অনুসন্ধান গণশক্তির পাতায় নেই। যদিও ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার স্বীকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়, আর এটা করতে অবশ্য গণশক্তিকে ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরতে হয়েছে।

আওয়ামী লীগকে রোখার যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে গণশক্তির যাত্রা শুরু হয়েছিল ডিসেম্বরের পর স্বীকার করতে হয় আওয়ামী লীগের গ্রহণযোগ্যতার কথা পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে। এবং ৬ ডিসেম্বরের গণশক্তি উপলব্ধি করে পূর্ব বাংলার জাতি নিপীড়নের প্রশ্নটি আর ১৩ ডিসেম্বর স্বীকৃতি দেয় পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির আকাংখাকে। আওয়ামী লীগ কিভাবে জনগণকে তার নেতৃত্বের প্রভাবে আনতে সক্ষম হয় সেটা আরো গবেষণার বিষয়। তবে যে গণশক্তি কৃষক, শ্রমিককে 'সত্যিকার পথ' দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সে কেন পথ দেখাতে পারলো না? জনগণ কেন গণশক্তির রাজনীতির মধ্যে দেখতে পেল না তাদের মুক্তির পথ?

আসলে গণশক্তি একটি বিপ্লবী সাপ্তাহিক হিসেবে নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেনি। উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে সংগঠিত করা, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও সেতুং এর চিন্তাধারার ভিত্তিতে। এই কারণেই পূর্ব বাংলার কৃষক তার মনোযোগের মূখ্য বিষয় আর থাকেনি। সে নিজেই হয়ে উঠেছে Subject । সংগ্রামী কৃষকের বিচিত্র জীবনের বাইরে অবস্থান নেয়া সেই কারণেই সম্ভব হয়েছিল। সংগঠক হিসেবে গণশক্তিকে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। বড় বড় রিপোর্টের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী কৃষককে আফ্রো-এশিয়া, লাতিন আমেরিকার কৃষকের বিজয় গাঁথা শোনাতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার কৃষকের সৃষ্টিশীল অভিজ্ঞতাকে গণশক্তি তার সর্বেশ্বরতার প্রক্রিয়ায় আত্মীকরণ করতে ব্যর্থ হয়.। কৃষকের জীবনে অর্থনীতিকে দেখতে পেলেও তার রাজনীতিকে গণশক্তি দেখতে ব্যর্থ হয়। কারণ গণশক্তি জানত রাজনীতি তো কৃষকের জীবনের বাইরে থেকে আসবে। তাই পূর্ব বাংলার সমাজে সর্বেশ্বরতার প্রতিযোগিতায় গণশক্তির রাজনীতি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে আর অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিত্ব করে বিকাশমান বাঙালী জাতির। কৃষকের মধ্যে জাতির অবয়ব দেখতে ব্যর্থ হয় গণশক্তি। আর এই ব্যর্থতার কাহিনী গণশক্তির পাতা জুড়ে প্রতিফলিত হয়েছে। হেরে যায় গণশক্তি। এই প্রতিযোগিতার প্রতিদিনকার tension ই গণশক্তির মূখ্য বিষয়বস্তু। এ প্রসঙ্গে মার্কস এর উক্তির যথার্থতা লক্ষণীয়– 'It is by no means sufficient to investigate : who is to emancipate? who is to be emancipated? Criticism had to investigate a third poin' : It had to enquire what kind of emancipation is in question? Wha' condition follow from the very nature of the emanciption that is demanded.

তথ্য নির্দেশ

১. গণশক্তি, ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ থেকে ১৪ মার্চ, ১৯৭১।

২. মেসবাহ কামাল, আসাদ ও উনসত্তুরের গণ-অভ্যুত্থান, ঢাকা, ১৯৮৬।

৩. Tariq Ali, Pakistan : Military Rule or People's Power. New York, 1970.

৪. Badruddin Umar, Weekly Holiday, Dec 21, 1969

৫. ইয়েনেকা আরেন্স ও ইওস ফান ব্যুরদেন, ঝগড়াপুর,গণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০

৬. N Bukharin. Theory of Historical Materialism A Popular Manual of Marxist Sociology

৭. কামাল সিদ্দিকী, বাঙলাদেশে ভূমি-সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, বি আই ডি এস, ১৯৮১।

৮. Arun K. Patnaik, Gramsci's Concept of Common-sense : Towards a Theory of Subaltern Consciousness in Hegemony Process.

৯. রণজিৎ গুহ, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' এক্ষণ, বর্ষা ১৩৮৯, কলিকাতা।

১০. Ranjit Guha, 'Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India' in R. Guha (ed) Subaltern Studies, Vol.1.OUP 1983.

১১. Dipesh Chakraboty, Rethinking Working Class History . Bengal 1880-1940, OUP Delhi, 1989.
Womenhood, Home and the Domestic Order . Figures of the Modern in the Bengali-Indian Colonial Thought, (Unpublished Article)

১২. Antonio Gramsci, Selections From Prison Note Books, London,1982

১৩. V I Lenin, What is To be Done, Moscow.

১৪. Karl Marx. On the Jewish Question.

১৫. David Arnold, Gramsci and Peasant Subalternity in India, J.P.S, Vol 11. (No 4) July 1984

১৬. H.T Colebrooke, Remarks on the Husbandry and the Internal Commerce of Bengal, Calcutta, 1884

১৭. Mao Tse Tung, Selected Works of Mao Tse Tung. Vol. 1 Peking. 1967.

১৮. James Mill. The History of British India. 1817.

১৯. Michel Foucault. Discipline and Punish

২০. Radhakamal Mukherjee. Economic History of India. 1600- 1800

২১. Dadabhai Naoroji. Poverty and Un-British Rule in India. New Delhi Ministry of Information and Broadcasting 1962

(১)

১৯৬৮ সালে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত রণনীতি ও কর্মসূচী সংক্রান্ত দলিলের অংশ বিশেষ

স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা রাষ্ট্রের কর্মসূচী

এ রাষ্ট্রের নাম ও মূলনীতি

- রাষ্ট্রের নাম হবে পূর্ব বাংলা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।
- এ রাষ্ট্র হবে পিণ্ডি ও ওয়াশিংটনের আওতামুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলা।
- এ রাষ্ট্র হবে সকল জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত বিপ্লবী একনায়কত্বমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
- এ রাষ্ট্রে শত্রু শিবিরে অন্তর্ভূক্ত কারও প্রথম দিকে কোন ভোটাধিকার থাকবেনা। এ রাষ্ট্রের একনাযকত্ব খাটবে তিন শত্রুর উপর, অন্যদিকে জনগণের থাকবে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার।

১। পূর্ব বাংলার মাটি হতে (ক) সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ (খ) সমস্ত বৃহৎ ধনী বিশেষ করে আমলা-মুৎসুদ্দী ধনী (গ) সমস্ত সামন্ত প্রথা বিশেষ করে জোতদারী মহাজনীর উচ্ছেদ করে এদের সমস্ত শিল্প-কারখানা, জমি ব্যাঙ্ক, বীমা, চা-বাগান, ফলের বাগান, চাষের যন্ত্রপাতি, অতিরিক্ত বাড়ীঘর ইত্যাদি বিনা খেসারতে বাজেয়াপ্ত করা হবে। সাম্রাজ্যবাদের থেকে নেওয়া বৈদেশিক ঋণ বাতিল ঘোষিত হবে। তিন শত্রুর রাষ্ট্র কর্তৃক সমস্ত সামরিক, বেসামরিক চুক্তি বাতিল করা হবে, তার জায়গায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বৈদেশিক নীতি চালু করা হবে।

১। বৈদেশিক সম্পর্কের মূলনীতি হবে ঃ

(ক) যে রাষ্ট্র কম মূল্যে টেকসই যন্ত্রপাতি ও কম বেতনে কারিগর দেবে সে রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্রয় এবং যে রাষ্ট্র বেশী দামে পূর্ব বাংলার কাঁচা মাল ক্রয় করবে তার নিকট বিক্রয়,

(খ) যে রাষ্ট্র শর্তহীন সাহায্য দেবে তার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।

২। কৃষক ও কৃষি ক্ষেত্রে ঃ

(ক) জোতদারী উচ্ছেদ করে ও সরকারী খাসের যে জমি রয়েছে তা এবং বাজেয়াপ্ত চাষের যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে বিতরণ।

(খ) ব্যক্তিগত মহাজনী প্রথার বিলোপ সাধন এবং বড় বড় মহাজন ও সরকারী ব্যাঙ্ক থেকে, ক্ষেত মজুর সহ মাঝারি কৃষক পর্যন্ত, যে ঋণ নিয়েছে তার থেকে তাদের সম্পূর্ণ অব্যহতি দান।

(গ) যে সব অকৃষক, বিধবা, মাস্টার, গরীব ডাক্তার, মোক্তার আইনজীবী , শ্রমিক ছোট দোকানদার ও দোকান কর্মচারী, কুটির শিল্পী ইত্যাদির হাতে বর্তমানে যে জমি যেভাবে আছে তা সে ভাবেই থাকবে।

(ঘ) ধনী কৃষকের যে সব বাড়তি জমি বর্গা প্রথায় লাগিয়ত করা হয় কেবলমাত্র তাহাই খাস করে ভূমিহীন কৃষকদের দেওয়া হবে। অবশ্য এ সব জমির জন্য তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

(ঙ) সকল কৃষককে চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি – গরু, বীজ, সার ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য স্বল্প সুদে (বিনা বন্ধকীতে) ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হবে।

(চ) যে সব কৃষক ইচ্ছুক তাদের সমবায়ে যৌথ খামার বা কমিউন গঠনে সরকার সর্বপ্রকার জমি, যন্ত্রপাতি, গরু, বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করবে।

(ছ) বিপ্লবোত্তর পরিবর্তিত সমাজে জোতদার মহাজনদের জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তাদের নিশ্চয়তা বিধানে সাহায্য করবে।

(জ) জমির খাজনা প্রথার বিলোপ সাধন করে তার জায়গায় উৎপাদনের উপর আয়কর প্রথা চালু করা হবে। ফসল না হলে আয়কর দিতে হবেন।। ৫ একর পর্যন্ত জমি (বাড়ী ভিটা ও তৎসংলগ্ন বাগান ও পুকুরের) খাজনা মওকুব করা হবে।

(ঝ) বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বের সকল দেশের সহযোগিতায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। আমদানী রপ্তানী ব্যবসা-সংক্রান্ত

(ক) খাদ্যদ্রব্যের সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যবসা বিলুপ্তি, 'সকল মানুষের জন্য খাদ্য'– এ নীতির ভিত্তিতে ধান, চাল, আটা, নুন, তেল যে যা বিক্রী করবে তা সরকার উচিত মুল্যে কিনে নেবে এবং সরকারী খাদ্য ভাণ্ডার থেকে প্রত্যেক মানুষের কাছে নির্ধারিত অলাভজনক মূল্যে বিক্রী করবে।

(খ) পাট, তুলা, চামড়া আখ, তামাক, হলুদ ইত্যাদি কৃষিজাত পণ্যের যাতে কৃষকেরা উচিত মূল পায় তার জন্যে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) সমস্ত বৈদেশিক আমদানী-রপ্তানী ব্যবসার যাবতীয় দায়িত্ব সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করবে।

(ঘ)সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য স্থিতিশীল রাখা হবে এবং তার মূল্য জনগণের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে অবশ্যই নিয়ে আসা হবে।

৪। শিল্প মালিকানা ও শ্রমিকের ক্ষেত্রে ঃ

(ক) বাঙালী যত শিল্পপতি রয়েছে, তারা যদি তিন শত্রুর সাথে সহযোগীতা না করে তবে তাদের কলকারখানার মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা হবে না।

(খ) কলকারখানার মালিক সহ যারা উক্ত তিন শত্রুর সহায়তা করবে, তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাদের উপর কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

(গ) তিন শত্রু বিরোধী পূর্ব বাংলার সমস্ত কারখানার মালিকদের সর্বোচ্চ মুনাফা ও সুদের হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে; নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে তাদের অধীনে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সর্বনিম্ন মজুরী।

(ঘ) তিন শত্রু বিরোধী শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক, বীমা ও লগ্নী পুঁজি ফেরত দেওয়া হবে এবং ঐসব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে।

(ঙ) দেশকে আধুনিক উন্নতমানের শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

(চ) সকল মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের নতুবা বেকার ভাতা–এ নীতির ভিত্তিতে শ্রম কল্যাণ ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(ছ) খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যের সাথে সমতা রেখে শ্রমিকের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ।

(জ) সকল শ্রমিকের জন্য প্রয়োজনীয় ফেমিলী কোয়ার্টার সহ বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঝ) ট্রেড ইউনিয়ন করা, ধর্মঘট করা, প্রয়োজনবশতঃ বিক্ষোভ প্রকাশের স্বাধীনতা শ্রমিকদের থাকবে।

(ঞ) মানুষের হাতে ময়লা টানার কাজ সহ সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজের স্থলে ক্রমান্বয়ে যন্ত্রের প্রবর্তন করা হবে।

(ট) প্রত্যেক শ্রমিকের জন্যে বৃদ্ধ বয়সে পেনশান ও বার্ধক্য বীমা ও অঙ্গহানী বীমা চালু করা হবে।

(ঠ) কাজের ঘন্টা সর্বোচ্চ আট ঘন্টা, তার অতিরিক্ত কাজের জন্যে ডবল ওভার টাইম্, এক নাগাড়ে ৬ ঘন্টার বেশী কাজ নয়–সপ্তাহে পুরা বেতনে দেড় দিন ছুটি বছরে একমাস পুরা বেতনে বিশ্রাম, অসুস্থ ও প্রসুতিকালীন পুরা বেতন।

৫। শিক্ষা, সংস্কৃতি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ঃ

(ক) প্রত্যেক মানুষের জন্যে যথোপযুক্ত উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা।

(খ) শ্রমিক কৃষক ও নিম্নবেতনভোগী কর্মচারীদের সন্তানসন্ততির জন্যে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা।

(গ) প্রত্যেকটি শিল্প-কারখানা, কৃষি মৎস চাষ, নৌযান, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান, বনবিভাগ, রাজমিস্ত্রির কাজ, সূতার মিস্ত্রির কাজ, দর্জি কাজ, ইলেকট্রিক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিভিশন, মেকানিজম ইত্যাদি যাবতীয় কাজের জন্যে যথোপযুক্ত বয়সে রাষ্ট্রে শিল্পপতিদের সহযোগিতায় ট্রেনিং স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রের লক্ষ্য থাকবে যাতে কোন মানুষ অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ না থাকে।

(ঘ) উপযুক্ত মেডিক্যাল কলেজ, হোমিও, কবিরাজী কলেজ ও ঐ সব চিকিৎসার হাসপাতাল স্থাপন এবং কারিগরী ও বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

(ঙ) প্রচলিত সকল শিক্ষা কোর্সকে রাষ্ট্রের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাজানো হবে। সিলেবাসের বোঝা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কমানো হবে। ঘনঘন সিলেবাস রদবদল ব্যবস্থা বাতিল করা হবে।

(চ) পাঠ্য বই-এর উপর ব্যক্তিগত ব্যবসা বাতিল করে তার জায়গায় প্রত্যেকটি যোগ্য লেখককে রাষ্ট্রের আনুকূল্যে লেখার, গবেষণার সুযোগ দেওয়া হবে।

(ছ) অষ্টম শ্রেণী ও মেট্রিকের পর, যারা খেলাধুলা, নাচগান, শিল্প সংস্কৃতিতে মেধাবী,

তাদের রাষ্ট্র ঐ সব কাজে পরিপূর্ণ সুযোগ দিবে। সুযোগের অভাবে যেন কোন প্রতিভার বিকাশে বিঘ্ন না ঘটে রাষ্ট্র সে দিকে বিশেষ নজর দিবে।

(জ) বাংলাভাষা হবে রাষ্ট্রভাষা। তবে অন্যান্য ভাষাভাষীর, উপজাতীয় এবং ধর্মীয় ভাষার বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকবে।

(ঝ) প্রত্যেকটি জাতি ও উপজাতির জাতীয় সত্বার স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তাদের সংস্কৃতির বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকবে।

(ঞ) প্রত্যেকটি লোকসংস্কৃতি–অবলুপ্তি বন্ধ ও বিকাশের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।

(ট) কৃষক ও শ্রমিকের পরিবারের জন্য বিনা মূল্যে চিকিৎসা।

(ঠ) প্রত্যেক মেয়ের জন্য প্রসূতিকালীন ছুটি, চিকিৎসার ব্যবস্থা।

(ড) প্রত্যেক ইউনিয়নে কমপক্ষে ৫০ বেডের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হবে এ রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

(ঢ) রোগের চিকিৎসার চাইতে রোগ উৎপত্তির মূল দূর করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া।

(ণ) মশা, মাছি, ইঁদুর ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক জীব ধ্বংস করে সমাজকে সুখী ও সুন্দর করে গড়া হবে।

৬। ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার এবং সামাজিক অনাচার দূরীকরণ ঃ

(ক) প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালন ও আচরণ ইত্যাদির পূর্ণ অধিকার থাকবে। কোন ধর্মের উপর কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবেনা।

(খ) প্রত্যেকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে অবস্থান করবে। প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় খরচায় তার মেরামত করা হবে।

(গ) ওয়াক্ফ ও দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে।

(ঘ) প্রত্যেক অন্ধ, আতুর ও অক্ষম ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় খরচায় হয় নিজ বাড়ীতে, স্বাস্থ্যনিবাস বা ক্লিনিকে যত্নসহকারে রাখা হবে। ভিক্ষাবৃত্তির সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো হবে।

(ঙ) ভিখারী, মিসকিন, বেশ্যা ইত্যাদিকে যথোপযুক্ত চিকিৎসা করে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যবস্থা সরকার করবে।

(চ) বেশ্যাবৃত্তি, চুরি, ডাকাতি, রাহাজনি , বলৎকার, ছেলেধরা, গাঁজা, জুয়া, মদ–মাতলামী. ফটকাবাজী, স্বজনপ্রীতি, যুদ্ধ, দুর্নীতি, সরকারী সম্পদের আত্মসাৎ ইত্যাদি যাবতীয় অসামাজিক কাজ চিরতরে উৎখাত করা হবে।

(৭) দেশ রক্ষা ঃ

(ক) বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে সেনাবাহিনী গড়ে উঠবে প্রধানতঃ তাদের নিয়ে দেশরক্ষা

বাহিনী গড়ে তোলা হবে।

(খ) বিপ্লবের মাধ্যমে পরীক্ষিত ও যোগ্য অফিসারদের নিয়ে সেনাপতিমণ্ডলী গঠন করা হবে।

(গ) প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও ইচ্ছুক নারীদের সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে;

(ঘ) কৃষক শ্রমিকের সন্তানসন্ততিদের সেনাবাহিনীতে অগ্রাধিকার থাকবে।

(ঙ) নৌ, বিমান, স্থলবাহিনী ও অস্ত্র কারখানা সহ উপযুক্ত দেশরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

আসুন। উপরোক্ত মুক্তি সনদকে (কর্মসূচী) বাস্তবায়িত করার জন্য বিপ্লবের মূল পরিচালিকা শক্তি শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে জোরদার শ্রেণী সংগঠন গড়ে তুলি ; বিপ্লবী ছাত্র, যুব ও নারী সমাজকে সংগঠিত করি। সর্বোপরি, সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে পূর্ব-বাংলা জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে সুসংগঠিত করি এবং একাজগুলি সমাধা করার জন্য পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টিকে ইস্পাতদৃঢ় সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলি। আমরা আশা করি, পূর্ব বাংলা সকল বিপ্লবী শক্তি দৃঢ় পদক্ষেপে এপথে এগিয়ে আসবে এবং এ কর্মসূচীতে ভুলভ্রান্তি থাকলে তা নিঃসংকোচে সমালোচনা করে একটি নির্ভুল কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা করবে।

পরিশেষে ঃ

এক কথায়, এরাষ্ট্র সকলের জন্য খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান–জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্য সম্মুখে রেখে সকল মানুষের জন্যে সুন্দর, সুখী, স্বাধীন, সার্বভৌম একটি দেশ হিসেবে পূর্ব বাংলাকে গড়ে তুলবে।

জয় জনগণের– গণতান্ত্রিক বিপ্লবের।

জয়–মার্ক্সবাদ ও মাও এর চিন্তাধারার।

ধ্বংস হোক তিন শত্রু–নিপাত যাক সংশোধনবাদ, নয়া সংশোধনবাদ।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি–দীর্ঘজীবি হউক !

(২)

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক ১৯৬৮ সালে গৃহীত থিসিসের অংশবিশেষ।

দ্বন্দ্ব সমূহের বিশ্লেষণ ঃ

পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব ঃ

মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদের মাঝে পাঞ্জাব, সিন্ধু সীমান্ত প্রদেশ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বৃটিশ সমর্থক বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা বাঙ্গালী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের (যারা খুবই সংখ্যাল্প) চেয়ে বহুগুণ বিকশিত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে।

পূর্ববাংলার হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণী ও সামন্তবাদীরা মুসলিম বুর্জোয়া, সামন্তবাদী, কৃষক-শ্রমিকের উপর অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও ধর্মীয় নিপীড়ণ চালাতো। বঙ্গভঙ্গ আইনের মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলা একটি আলাদা প্রদেশ হলে অর্থনৈতিক শোষণ ও ধর্মীয় নিপীড়নের কিছুটা লাঘব হবে জেনে বাঙ্গালী মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা তা সমর্থন করে। কিন্তু নিজ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে বলে হিন্দু বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা এ বিভাগের বিরোধীতা করে ; ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। কাজেই মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণীর বিকাশের দুটি বাধা ছিল, একটি হলো বৃটিশ উপনিবেশবাদের আর একটি হিন্দু বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ধর্মীয় নিপীড়ন। কাজেই স্বাধীনতা আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত না হওয়ায়, পূর্ব বাংলার সৃষ্টি ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন ছিল।

পূর্ববাংলার বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা পাকিস্তানের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেণী বিকাশ ঘটাতে সক্ষম মনে করে পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন এবং মুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের পাকিস্তান দাবীর পিছনে ঐক্যবদ্ধ করে। তারা পাকিস্তানে যোগ দেয় এবং এভাবে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের প্রদেশে পরি-ত হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব অবাঙ্গালী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের হাতে থাকায় বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদের নিকট হস্তান্তর করে। কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচীতে স্থাপন, বৃটিশ উপনিবেশবাদের সামরিক আমলা দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান উপাদান সশস্ত্র বাহিনী গঠন এবং বেসামরিক আমলা দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যান্য অংশ চালু করা (এই সকল সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের অধিকাংশই বৃটিশ উপনিবেশবাদ সমর্থক অবাঙালি ছিল) প্রভৃতির মাধ্যমে এই অবাঙালি বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা রাষ্ট্রযন্ত্রের একচ্ছত্র মালিকানা লাভ করে এবং নিজেদের শ্রেণী বিকাশের জন্য অবাধ সুযোগ পায়।

এ শাসক শ্রেণী পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র জাতীয় ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য স্বায়ত্বশাসন কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রনাধীকার প্রদানের পরিবর্তে একে অবাধ শোষণের জন্য প্রথম থেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসে। এ শাসকশ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া, প্রভৃতির অর্থ দ্বারা বিকাশ লাভ করে এবং এ বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সিয়াটো, সেন্টো প্রভৃতি সামরিক চুক্তি ও বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে। এভাবে পাকিস্তান আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়। সম্প্রতি এ শাসকশ্রেণী সংশোধনবাদ বিশেষতঃ সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে নানা প্রকার অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেছে।

পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া, কাগজ প্রভৃতির অর্থ দ্বারা, সস্তা শ্রম-শক্তি দ্বারা প্রায় সাত কোটি মানুষের বাজার এবং সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে পাকিস্তানী বুর্জোয়া শ্রেণী একচেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হয়। তারা পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণের একটি স্থায়ী ক্ষেত্রে পরিণত করে।

পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণের একটি বিরাট বাধা হলো তার স্বতন্ত্র জাতিস্বত্ত্বা এবং ভাষা এ স্বতন্ত্রের প্রধান উপাদান। জাতি হিসেবে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র মুছে দেয়ার জন্য এ পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা প্রচলনের হীন প্রচেষ্টা চালায়। এ হীন প্রচেষ্টাকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নস্যাৎ করে দেয়। বর্তমানেও এ শাসকশ্রেণী বাংলা ভাষা পরিবর্তনের হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

এ পাকিস্তানী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শ্রেণীর বিকাশের জন্য ক্রমশঃ পূর্ব বাংলার সম্পদ, সস্তা শ্রমশক্তি ও প্রায় সাত কোটি মানুষের বাজার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে বৃটিশ উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ উপনিবেশ থেকে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে কিছু কালের জন্য আধা উপনিবেশে পরিণত হলেও এখানে প্রথম থেকেই পাকিস্তানী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শাসকগোষ্ঠীর জাতীয় নিপীড়ন ও শোষণ বিদ্যমান ছিল। এ শাসকশ্রেণী নিজেদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার উপর জাতীয় নিপীড়ন বৃদ্ধিকরে এবং তাদের বিকাশ একচেটিয়া রূপ গ্রহণের পর্যায়ে এলে তারা শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য তাদের

শাসন ব্যবস্থাকে ক্রমেই অধিকতর সমরবাদী করে এবং এভাবে পূর্ব বাংলার উপর জাতীয় নিপীড়ন উপনিবেশিক শোষণের রূপ নেয় এবং পূর্ব বাংলা পাকিস্তানী উপনিবেশিক শ্রেণীর উপনিবেশে পরিণত হয়। এ উপনিবেশিক শাসকশ্রেণী নিজেরাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের স্বার্থ রক্ষা করছে। এ কারণে পাকিস্তান নিজেই একটি আধা উপনিবেশিক ও আধা সামন্তবাদী দেশ।

এই পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসক শ্রেণী পূর্ববাংলার 'পাকিস্তানবাদী দালাল বুর্জোয়াদের' মাধ্যমে এবং গ্রামে সামন্তবাদকে জীবিত রেখে এদেশে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এ উপনিবেশিক শোষণের ফলে পূর্ববাংলার মাঝারী ও ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ব্যাহত হয়েছে এবং গ্রামে সামন্তবাদী শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষতঃ বর্তমানে বিদেশী ঋণ পরিশোধের জন্য, বিদেশী ঋণ হ্রাসের ফলে কলকারখানার পুঁজি সংগ্রহের জন্য গ্রাম্য শোষণ প্রকট আকার ধারণ করেছে। কাজেই পূর্ববাংলার শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদে বুর্জোয়া ও মাঝারী বুর্জোয়া শ্রেণীর এক অংশ তথা সমগ্র পূর্ববাংলার জাতি এ শোষণে শোষিত। এ পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসক শ্রেণী অখণ্ড পাকিস্তান, ধর্মের ভিত্তিতে এক জাতি, তথাকথিত ইসলামী সংস্কৃতি, পূর্ববাংলা একটি প্রদেশ প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যমে শোষণের উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশিক শক্তি শোষণের উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করার জন্য এক দেশ, এক জাতি প্রভৃতি প্রচারের প্রচেষ্টা চালায়; কিন্তু ইতিহাস তার ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে। পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় ঃ পূর্ব বাংলার বিশাল কৃষকজনতার সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব ঃ

গ্রামে সরকারী কর্মচারী (পুলিশ, সার্কেল অফিসার), মৌলিক গণতন্ত্রী (বি.ডি), জমিদার, ধনীচাষী, অসং ভদ্রলোক (টাউট) ও মাঝারী চাষীর উপরের স্তর, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও মাঝারী চাষীর ব্যাপক অংশের ওপর সামন্তবাদী শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানী উপনিবেশিক শ্রেণী গ্রামের সামন্তবাদীদের জিইয়ে রেখেছে এবং তাদের বিকাশের সর্বময় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ শাসক শ্রেণী তাদের বিকাশের নিমিত্তে পুঁজি ও সস্তা শ্রমশক্তি সংগ্রহের জন্য সামন্তবাদী শোষণ তীব্রতর করেছে।

গ্রামে সামন্তবাদী শোষণের প্রকাশ হলো ভূমিকর ও অন্যান্য খাজনা বৃদ্ধি, গ্রামে রেশম চালু না করা, বুনিয়াদী গণতন্ত্র সৃষ্টি করা, মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রদান করা, বর্গা, পত্তনি, ঠিকা ও সুদ ব্যবস্থার অবসান না করা, ঋণ প্রভৃতির মাধ্যমে চাষীদের শৃংখলে আবদ্ধ করা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ না করা, সেচ প্রকল্প কার্যকরী না করা, বিভিন্ন ধরনের ইজারাদারী প্রথা, পোকা ধ্বংসের ব্যবস্থা না করা, অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না করা, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা প্রভৃতি।

তৃতীয় ঃ পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব ঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একদিকে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় রাখছে, অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের এক অংশের সাথে আঁতাত রাখছে এবং এদের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। তারা ঋণ, প্রত্যক্ষ ব্যবসা প্রভৃতির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণকে শোষণ করছে। তারা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিয়ে চীন বিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী ঐক্যজোট গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীরা নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থেই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে বর্তমানে আঁতাত করতে পারছেনা এবং নিজেদের শ্রেণী বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে সমাজতান্ত্রিক দেশ বিশেষতঃ চীনের সাথে বন্ধুত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে।

অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব বাংলার উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের সুযোগ নিয়ে তাদের সমর্থক পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের সাহায্য ও সমর্থন করছে। সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক এই দালাল বুর্জোয়ারা উপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলন করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এ আন্দোলনকে মূলধন করে দুইভাবে ব্যবহার করছে- একদিকে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে চীন বিরোধী পাক-ভারত যৌথ চুক্তি সম্পাদন করার জন্য, অন্যদিকে এই দালাল বুর্জোয়াদের দ্বারা পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে চীন বিরোধী পূর্ব বাংলা-ভারত যৌথ চুক্তি সম্পাদন ও পূর্ব বাংলাকে প্রত্যক্ষ মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। বর্তমানে মার্কিন সমর্থক পূর্ব বাংলার দালাল বুর্জোয়ারা ছয় দফা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব করছেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এদেশের সামন্তবাদীদের স্বার্থ-রক্ষাকারী ধর্মীয় পার্টিগুলোকে সাহায্য ও সমর্থন করছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র।

খ। পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সংশোধনবাদ, বিশেষতঃ সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব ঃ

পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের নিয়ে চীন বিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তারা সমর্থন করবেনা। কারণ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের সাথে আঁতাত রেখে পাকিস্তানসহ তার উপনিবেশকে শোষণ করাই তাদের লক্ষ্য। এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নস্যাৎ করার জন্য তারা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের সাহায্য করবে যাতে পূর্ব বাংলাকে শোষণের একটা ভাগ তারা পায়।

প্রসঙ্গক্রমে বায়াফ্রা, বার্মা, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশের কথা উল্লেখযোগ্য : বায়াফ্রার

জনগণ সংগ্রাম করছে জাতীয় অত্যাচার , নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির জন্য । সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা নাইজেরীয় সামরিক সরকারকে অস্ত্র, অর্থ ও লোক সরবরাহ করে বায়াফ্রার জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে ধ্বংস করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে তারা সমগ্র নাইজেরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে শোষণ চালাতে পারে । তারা বার্মার মুক্তি সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখার, ভিয়েতনামের মহান সংগ্রামকে মুছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে ।

গ । পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব ঃ

ভারতীয় বৃহৎপুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী সরকার সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করবেনা । কারণ তার উদ্দেশ্য হলো বুর্জোয়ার নেতৃত্বে স্বাধীন পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা এবং চীন বিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী একটি মিত্র পাওয়া । কিন্তু সর্বহারার নেতৃত্বে মুক্ত পূর্ব বাংলা সহায়ক হবে আসাম, পশ্চিম বাংলা, বিহার, ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারতের শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির । এ কারণে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ শ্রমিক-কৃষকের পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বানচাল করার চেষ্টা করবে ।

চতুর্থ ঃ পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ঃ

পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকদের শোষণ করে এবং এদের মাঝে একটি অংশ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের দালাল হয়ে পূর্ববাংলাকে শোষণ করছে, অপর অংশ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল । একটি অংশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ উভয়েরই বিরোধী, যারা সত্যিকার জাতীয় বুর্জোয়া । পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের প্রথম অংশ দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক । দ্বিতীয় অংশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা ভারতের সাথে আঁতাত রেখে নিজস্ব শ্রেণী বিকাশের জন্য যতটুকু জাতীয় অধিকার প্রয়োজন তার জন্য সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক । পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের ব্যাপক অংশ বর্তমানে এদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ । এদের সাথে জনগণের শত্রুতার সম্পর্ক ছাড়াও তারা যতক্ষণ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের বিরোধীতা করে ততক্ষণ জনগণের সাথে একটা মিত্রতার সম্পর্কও রয়েছে ।

বর্তমানে জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক দালাল বুর্জোয়াদের হাতে । এ নেতৃত্বের অবসান তিন প্রকারে হওয়া সম্ভব । (ক) সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি দৃঢ়ভাবে জাতীয় পতাকা উর্ধ্বেতুলে ধরে কৃষক জনতাকে উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করলে, (খ) উপনিবেশিক শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে চীন বিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী জোট স্থাপন করলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাহায্য ও সমর্থনে দালাল বুর্জোয়াদের জাতীয় সংগ্রাম ধ্বংস করতে সক্ষম হবে, (গ) উপনিবেশিক শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়াদের সাথে আপোষে আসলে এই দালাল

বুর্জোয়াদের আসল বিশ্বাসঘাতকতা ও গণবিরোধী চরিত্র প্রকাশ পাবে।

প্রধান দ্বন্দ্ব

উপরোক্ত দ্বন্দ্বগুলো ছাড়াও পূর্ব বাংলার সমাজে আরো দ্বন্দ্ব রয়েছে, কিন্তু এই চারটি মূল দ্বন্দ্ব। সভাপতি মাও বলেছেন, "কোনো প্রক্রিয়াতে যদি কতকগুলো দ্বন্দ্ব থাকে তবে তাদের মধ্যে অবশ্যই একটা প্রধান দ্বন্দ্ব থাকবে যা নেতৃস্থানীয় ও নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে। অন্যগুলো গৌণ ও অধীনস্ত স্থান নিবে। তাই দুই বা দু'য়ের অধিক দ্বন্দ্ব বিশিষ্ট কোন জটিল প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই তার প্রধান দ্বন্দ্বকে খুঁজে পাবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই প্রধান দ্বন্দ্বকে আঁকড়ে ধরলে সব সমস্যাকেই সহজে মীমাংসা করা যায়।" পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক, ক্ষুদে-বুর্জোয়া, মাঝারী বুর্জোয়ার এক অংশ এবং দেশপ্রেমিক ধনী চাষী ও জমিদারদের অর্থাৎ সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। কাজেই বর্তমান সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব।

কিন্তু উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছলে পাকিস্তানী উপনিবেশিক শ্রেণীকে রক্ষার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ একযোগে অথবা আলাদাভাবে নিজেদের সৈন্য দ্বারা পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামকে নসাৎ করার প্রচেষ্টা চালাবে। এ অবস্থায় পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ গণসংগ্রাম বিরোধীর প্রধান ভূমিকা থেকে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিংবা সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অথবা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ পূর্ব বাংলার গণবিরোধী সংগ্রামের গৌণ ভূমিকা থেকে ক্রমশঃ মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিংবা সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অথবা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হবে। এই প্রধান দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে নতুন করে ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে সঠিক মুক্তি সংগ্রামের পথে পরিচালিত করতে হবে।

(৩)

ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর ১১ দফা

[২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০]

স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১-দফা কর্মসূচী

দু'টি কথা

পূর্ব বাংলার জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, মুৎসুদ্দি পুঁজির শোষণ ও সামন্তবাদী শোষণ। পূর্ব বাংলার জনগণের শতকরা ৮৫ জন কৃষক। যেহেতু তারা সামন্তবাদী শোষণে জর্জরিত সেহেতু পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সামন্তবাদী শোষণের দ্বন্দ্ব প্রধান। যদিও এই কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক প্রচারিত হইতেছে তবুও ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়–এই কর্মসূচীর বাস্তবায়ন হইতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শনিষ্ঠ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, গরীব ও মাঝারি কৃষককে সংগঠিত করিয়া বিপ্লবী, বুদ্ধিজীবী, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবী, ছোট-মাঝারি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করার মধ্য দিয়া, গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর করিয়া, শ্রেণী সংঘর্ষে রূপান্তরিত করিয়া দীর্ঘ সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়া পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে মুক্ত এলাকা গঠন এবং শ্রেণী শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করার মধ্য দিয়াই স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ছাত্র সমাজ জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করিতে সক্ষম–যদি ছাত্র সমাজ নিজেদের আরাম, আয়েশ, ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়া বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রমিক এবং কৃষকের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করিয়া নিজেরা শ্রেণীচ্যুত হইয়া পূর্ব বাংলার জনগণের শ্রেণী শত্রুকে খতম করার দৃষ্টিভংগী লইয়া কাজ করে।

১। সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির (যাহার চরিত্র আমলা, মুৎসুদ্দিএককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিয়া পূর্ব বাংলায় স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলার দেশরক্ষা, অর্থনীতি, শাসন ব্যবস্থা, সংস্কৃতি তথা সর্বময় কর্তৃত্ব পূর্ববাংলার জনগণের হাতে থাকিবে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির জাতীয় নিপীড়ন ও শ্রেণী

শোষণের কবলমুক্ত এই ব্যবস্থায় জনগণের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে ও জনতার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২। (ক) আঠারো ও তদূর্ধ বয়স্ক-বয়স্কা নর-নারীর ভোট ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে জনগণ-পরিষদ নির্বাচিত হইবে। কোন নির্বাচনী এলাকার জনগণ ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় তাদের প্রতিনিধি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(খ) জনতার গণতান্ত্রিক অধিকার নিরঙ্কুশ কবিরার জন্য সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির দালাল ও সমর্থক যে কোন শ্রেণী ও ব্যক্তিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

৩। (ক) হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বাংগালী-অবাংগালী, জাতি-উপজাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জনগণের সমান রাজনৈতিক অধিকার থাকিবে।

(খ) নারী জাতির সমান অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(গ) জনগণের সকল প্রকার মৌলিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মতাদর্শের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে।

(ঘ) জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারের সম্পর্ক হইবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার ভিত্তিতে। ধর্মের ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার শোষণ উচ্ছেদ করা হইবে।

৪। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে একটি গণবাহিনী থাকিবে। শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনতার সমবায়ে এই গণবাহিনী গঠিত হইবে। ইহা ছাড়াও সমগ্র জাতি বিশেষ করিয়া শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনতাকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে এবং তাহাদের লইয়া গণ-মিলিশিয়া গঠন করা হইবে।

৫। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিরঙ্কুশ করিবার জন্য আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিয়া প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগকে আমূল পরিবর্তন করা হইবে। জনগণেব নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জড়িত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হইবে। বিচার বিভাগের মূল ভিত্তি হইবে গণ-আদালত।

৬। পবরাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পিণ্ডি, ওয়াশিংটন, মস্কো, নয়াদিল্লীর সরকারের বিরোধিতা করা হইবে। যে কোন বন্ধুদেশের বশ্যতা স্বীকার করা হইবে না। সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইবে পারস্পরিক লাভ ও মুনাফার ভিত্তিতে।

পৃথিবীর দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সকল প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হইবে।

৭। জোতদার, মহাজনী, ইজারাদারী তথা সকল সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো হইবে। "কৃষকদের হাতে জমি" এই নীতির ভিত্তিতে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে জোতদার, মহাজনদের উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত জমি বন্টন করা হইবে।

(খ) টাকা ও পণ্যে আদায়কৃত খাজনা প্রথার অবসান করা হইবে।

(গ) কৃষকের অর্থকরী ফসল ধান, পাট, ইক্ষু ইত্যাদির ন্যায্যমূল্য প্রদান করা হইবে। এই সকল ফসলের মূল্য নির্ধারিত হইবে চাউলের সংগে বিনিময়ের ভিত্তিতে।

(ঘ) কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদেরকে বিনাসুদে ঋণ দেওয়া হইবে। কৃষককে বকেয়া খাজনা ও ঋণের বোঝা হইতে মুক্ত করিয়া উন্নত চাষাবাদ করিবার জন্য সকল প্রকার উৎসাহ ও সুবিধাদি প্রদান করা হইবে।

৮। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং জল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সেচ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইবে।

৯। (ক) বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত সমস্ত শিল্প ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বাজেয়াপ্ত করিয়া জনগণের সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হইবে।

(খ) বৃহৎ পুঁজির শোষণ হইতে জনগণকে মুক্ত করিবার জন্য বৃহৎ বাইশ পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(গ) ব্যাংক, বীমা, পাটশিল্প, পাট ব্যবসা ও অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসাসমূহ জাতীয়করণ করা হইবে।

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(ঙ) সকল প্রকার পরোক্ষ কর প্রথা বাতিল করা হইবে। আয়ের হারের ভিত্তিতে কর ধার্য করা হইবে।

(চ) জনগণ বিরোধী অসৎ ব্যক্তি ও আমলাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(ছ) পুঁজি নিয়ন্ত্রণ নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিকদের শিল্প ব্যবসায়ে আনুকূল্য প্রদান করা হইবে।

১০। (ক) প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং সার্বিক সুবিধাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করা হইবে। শ্রমিকদের সন্তান-

সন্তুতির শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

(খ) দেশে ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে সকল প্রকার বেকার লোকদের কর্মসংস্থান করা হইবে।

১১। (ক) সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করিয়া গণমুখী, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হইবে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর হইবে।

(খ) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণসংস্কৃতিকে সর্বাধিক মর্যাদা দেওয়া হইবে এবং কুসংস্কারাচ্ছান্ন ও সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণার কবল হইতে জনগণকে মুক্ত করা হইবে।

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ পল্টন ময়দানের জনসভায় পঠিত ও গৃহীত।

প্রকাশকালঃ ৭ই মার্চ, ১৯৭০

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে মাহবুবউল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

মওলানা ভাসানীর সমর্থক এই ছাত্র সংগঠনটি 'মেনন গ্রুপ' নামে পরিচিত ছিলো। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক আদালত কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননকে সাত বৎসর এবং মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুবউল্লাহকে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।

সূত্র ঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৪৯০-৯২

(৪)

জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর ডাক

'পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন'

[১৯৭০ সালের ৩০ নভেম্বর প্রদত্ত মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর এই ঐতিহাসিক ভাষণটি পাঠকের জ্ঞাতার্থে নিম্নে পত্রস্থ হলো]

"আজি আমি পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি বাঙালীকে তাহাদের জীবন-মরণ প্রশ্নের বিষয়টি পুনর্বার এবং শেষবারের মতো দল- মত নির্বিশেষে ভাবিয়া দেখিতে আকুল আবেদন জানাইতেছি। বিগত ২৩ টি বছরের তো বটেই, এমনকি চলতি ১৯৭০ সালটিকেই শুধু যদি আমরা যাচাই করিয়া দেখি, তবে নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবো। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট হইতে আমাদের, পূর্ব পাকিস্তানীদের আজাদীর লড়াই নতুনতম এবং শেষ পর্যায়ের রূপ লাভ করিবার অপেক্ষায় আছে মাত্র। সেই পর্যায়ে, আর কোন যুক্তি ও শক্তি দ্বারা ধামাচাপা কিংবা দাবাইয়া রাখিবার প্রয়াস সহ্য করা হইবে না। মরণ কামড়ে আর গগণবিদারী হুংকারে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। দুই যুগ ধরিয়া বৈষম্য আর বঞ্চনার যে লড়াই শুরু করিবার প্রচার ও প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহারই সফল সংগ্রামী রূপায়ণে, আমাদের জীবনের বিনিময়ে হইলেও, ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। আজ হইতে ১৩ বৎসর পূর্বেই ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, শোষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে 'আচ্ছালামু আলায়কুম' বলিয়াছিলাম, হয়তো বঙ্গবাসী সেইদিন নাটকের সব কয়টি অংক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ আশা করি সচেতন ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোন বাঙালীকে বুঝাইতে হইবে না যে, মানবতাবর্জিত সম্পর্কের মহড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিয়াছে। এইবার নেমিসিসের অন্যায়ের সমুচিত শাস্তি বিধানের অপেক্ষায়ই আমরা আছি। যাহা হইবার তাহাই হইবে।

আমরা ভাবিয়াছিলাম ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পাকিস্তানীদের নূতন শপথের সন্ধান দিবে। পূর্ব পাকিস্তানের বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রগুলি সেই পথ লক্ষ্য করিয়া যাবতীয় সার্ভিস দান করিয়াছিলেন। সরকারও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পুস্তক প্রকাশনার ও দেশী-বিদেশী সাহিত্যিক সাংবাদিকদের সফরের আয়োজন করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সরকারের সকল প্রকার প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তান,

কোন ক্ষেত্রেই সমগ্র পাকিস্তান নহে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। যুদ্ধ তহবিলে কোটি কোটি টাকা সাহায্য, কওমী গানের আসর,সাংবাদিকের ফিচার, সাহিত্যিকের রচনা সবই ধীকৃত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা হইল, বরাবরই আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলা অফিসারদের তরফ হইতে যে আচরণ পাইয়া আসিতেছিলাম আজ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক সাংবাদিক এক কথায় সকল মহল হইতেই সেই উপেক্ষা ও উদাসীনতা লাভ করিতেছি। ইহাতেও কি আমাদের চেতনার উদ্রেক হইবে না?

অতীতের ইতিহাস না আওড়াইয়া শুধু চলতি সালের ঘটনাবলী বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের লক্ষ্য শক্তির সংগ্রামে না পৌঁছাইয়া পারে না। পুনঃপুনঃ বন্যা ও ঘূর্ণিবার্তায় পূর্ব পাকিস্তান বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং এইবার একই বৎসরে আমরা দুইটি বন্যা ও দুইটি ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছি। প্রথমবারের বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চারিশত কোটি টাকা মূল্যের ফসল, ঘর-বাড়ী, গবাদী পশু পানিতে ভাসিয়া গিয়াছে দ্বিতীয় দফা বন্যায় আমরা হারাইয়াছি অতি কষ্টে রোপণ করা ধান, কলাই,তরিতরকারী ইত্যাদি। গত ২৩ অক্টোবরের ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব পাকিস্তানের আটটি জেলার ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা নির্ণয়াতীতভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর সর্বশেষে দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস যে ধ্বংসলীলা ও প্রাণহানি সংঘটিত করিয়াছে এবং বন্যা ও ঘূর্ণিবার্তার পর পুনঃপুনঃ কলেরা-মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া সহস্র সহস্র লোক অকালে প্রাণ হারাইয়াছে ও হারাইতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ, ক্ষমতালোভী নেতৃবর্গ আর উদাসীন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকবর্গকে তারা নাড়া না দিলেও বিশ্বের তিনশত কোটি মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

সরকার বরাবরের মতো এই ধ্বংসলীলা ধামাচাপা দিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত সত্যের বিজয় হইয়াছে। আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না যে, আমাদের এহেন দুর্দিনে সরকার কি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে। মানুষের হৃদয় নিঃসৃত ভালবাসা আর প্রজ্ঞাপ্রসূত বিবেচনার সম্মুখে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছুই নহে; কিন্তু এই দুইটিরই অভাব আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি। সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিকট হইতে সেই ভালবাসা ও বিবেচনা পূর্ব পাকিস্তান পায় নাই বলিয়াই যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগটি শতগুণ আঘাত হানিয়াছে। ইহার নতিজা সরকারকে ভোগ করিতেই হইবে। একজন মন্ত্রী মারা গেলে বেতার টেলিভিশন ও অন্যান্য সরকারী প্রচারযন্ত্র কিভাবে মাতম শুরু করে তাহা আমাদের ভালো ভাবেই জানা আছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার ও টেলিভিশন ১২ লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানিতে কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমাহীন ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছে তাহা আজ সাত কোটি বাঙালীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। লন্ডন, পিকিং, ওয়াশিংটন, তেহরান, আম্মান, সিডনি, টোকিও ও কলিকাতার বেতার যখন বিশ্ববাসীর

নিকট সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসের বিশদ বিবরণ তুলিয়া ধরিয়াছে. সাহায্য সামগ্রী পাঠানোর আবেদন জানাইতেছে. তখনও পাকিস্তানের কে ভাব. টিভি বিশ্বাসঘাতক ও চরম মিথ্যাবাদীর ভূমিকা পালন করিতেছে; তখন তাহাদের আহলাদমাখা অনুষ্ঠানের কমতি হয় নাই; বারো লক্ষাধিক কয়ের মাগফেরাতও কামনা করা হয় নাই। লক্ষ লক্ষ লাশের দাফন কাফনের কর্তব্যের ধা স্বীকার করা হয় নাই। এর চেয়ে অফসোসের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আজ তাই আমাদের সম্মুখে কর্মসূচী পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিয়াছি। অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, অনেক কোরবানী দিয়াছি। আজ আমাদের হাতে যাহাই অবশিষ্ট আছে, সব কিছুই উৎসর্গ করিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এই সংগ্রাম ভাষণ বিবৃতি নয়, প্রত্যক্ষ মোকাবেলা। এই মোকাবেলা আপোষ নিষ্পত্তিকল্পে চাপ সৃষ্টি করার সংগ্রাম নয়, পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি শোষিত নির্যাতিত বাঙালীর মুক্তির সংগ্রাম। দল-মত নির্বিশেষে আজ সবাই আসুন, আমরা এক ও অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করি এবং ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে মিছিল ও জনসভার আয়োজন করুন। তাই মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠান করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট জরুরী আবেদন করিতেছি- এইদিন আপনারা আওয়াজ তুলুন: পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে এবং আমাদের আজাদী রক্ষা করিতে আমরা সর্বস্ব কোরবান দিতে সদা প্রস্তুত। সেই সাথে আপনারা বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুন: আমরা স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল এবং শৃঙ্খলমুক্ত হইতে চাই। আমরা বিশ্বাসঘাতক আমলাদের শায়েস্তা করিতে চাই।

আমি বিশ্বাস করি মানবতার নামে আজাদীর লড়াইয়ে আমাদের সাফল্য অনিবার্য। সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছবো, আশা করি বিশ্ববাসীরও ইহাই বিশ্বাস। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি একটি হুশিয়ারীও উচ্চারণ করিতে চাই-আমাদের দুর্যোগ ও দুর্দিনকে সম্বল করিয়া যাহারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোন চাল চালাইতে চায়, তাহাদিগকে আমরা বরদাস্ত করিবো না। আমাদের প্রয়োজনে যাহারা সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিতেছেন তাহাদিগকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই; কিন্তু সেবার নামে কেহ যদি ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আমাদিগকে আটকাইতে চায়, তবে তাহাকেও তল্পী-তল্পাসহ আমরা তাড়াইতে বাধ্য হইবো। বাঙালী কোন দিন শিকলের বন্ধনকে মানিয়া লয় নাই আর লইবেও না। বিদেশী সৈন্যই হউন, কূটনীতিকই হউন, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া কাজ করিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বাঙালী জাতির মুক্তিসংগ্রামকে রুখিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।"

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৩০ নভেম্বর ১৯৭০

(৫)

ভাসানীর ১-দফা ঃ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান

[১ জানুয়ারী, ১৯৭১]

আপোষ নহে-সংগ্রাম
ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে
স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলন

স্থান ঃ-সন্তোষ (টাংগাইল), তারিখঃ-৯ই জানুয়ারী-১৯৭১ ইং

২৩শে পৌষ, ১৩৭৭ বাং, রোজ শনিবার।

১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সম্মেলনে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার সভাপতিত্বে সর্বসম্মতিক্রমে "লাহোর প্রস্তাব" নামে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই লাহোর প্রস্তাবে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সেই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের ১০ কোটি মুসলমান পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করিতে চায় কিনা? তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালে গণভোটের মাধ্যমে জনগণ সর্বসম্মত রায় প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু জনগণের উক্ত রায় অনুযায়ী দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমন্বয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী শাসন ও পশ্চিমা শোষক-শাসকদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শোষিত-নির্যাতিত হইতে চয় কিনা, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার ঐতিহাসিক নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তারারই সুস্পষ্ট জবাব প্রদান করিযাছিল।

ঠিক একইভাবে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আর একবার এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদী স্বৈরাচারী শাসক, আমলাতন্ত্রের শাসন, শোষণ ও চক্রান্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন কোরবানী দিতে পূর্ব পাকিস্তানের বাংগালী জনগণ প্রস্তুত রহিয়াছে।

বিগত ২৩ বছরের শোষণ-শাসনের মর্মান্তিক ইতিহাস ও তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বারে বারে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে, বৃটিশ ও ভারতের সংখ্যাগবিষ্ঠদের শোষণ-শাসন হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব পাকিস্তানের বাংগালী জনগণ সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় শাসক ও শোষক চক্রের শোষণ ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হইয়াছে।

এবারকার ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচন কোন ব্যক্তি ও দলের জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন নহে, ৬ দফা ৯দফার প্রশ্ন নহে–এই দেশের বাংগালী জনগণ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান চায় কিনা ভোটের মাধ্যমে সেই প্রশ্নেরই মীমাংসা করিয়া দিয়াছে।

আপোষ আলোচনার মাধ্যমে কেবল মাত্র গদি দখল করিয়া মন্ত্রী বানাইবার জন্য নয় বরং পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি বাংগালী জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতার একক দাবীই এবারকার নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

আজ ইহাও দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, কেবল মাত্র রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হইলেই জনগণের সমস্যার সমাধান হইবে না। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯৫ জন কৃষক, শ্রমিক, সর্বহারা মেহনতী মানুষের মৌলিক সমস্যা, খাদ্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, সর্বাংগীন কল্যাণ, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা-"সমাজতন্ত্র" কায়েমের উপর। অন্যথায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের মতই সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এখন জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নারী-পুরুষের কর্তব্য হইলঃ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে "স্বাধীন-পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগদান করিয়া মাতৃভূমিকে পশ্চিমা শোষকদের কবল হইতে মুক্ত করা।

এই উপলক্ষে আগামী ৯ই জানুয়ারী, ১৯৭১ ইং, ২৩শে পৌষ, ১৩৭৭ বাং রোজ শনিবার সন্তোষে (টাংগাইল) স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলন আহবান করা হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনে সংগ্রামী কর্মীগণ দলে দলে যোগদান করিবেন।

এই মহতী সম্মেলনে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করা হইবে। পরদিন

১০ই জানুয়ারী রবিবার সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ঢাকার পল্টন ময়দানে বিরাট জনসভায় সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচী ঘোষণা করা হইবে।

দেশপ্রেমিক সংগ্রামী কর্মীদের নিকট আমার অনুরোধ-গ্রামে গ্রামে, শহরে বন্দরে, হাটবাজারে সভা, পথসভা, মিছিল, বৈঠক, পোষ্টার, ফেস্টুন, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্য চালাইয়া এই সর্বদলীয় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন।

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়াজ ঃ

* স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান-জিন্দাবাদ।
* ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ রিলিফের ব্যবস্থা কর।
* দুর্গতদের অবিলম্বে পুনর্বাসনের জন্য গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা কর।
* গোটা পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা কর।
* ইংগ-মার্কিন বিদেশী সৈন্য-বাংলা ছাড়।
* রাজবন্দীদের মুক্ত কর।
* গণসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়-পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন কর।

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

** সূত্রঃ মুদ্রিত প্রচারপত্র।*

** মওলানা ভাসানীর আহ্বানে ১৯৭১ সালের ৯ জানুয়ারী সন্তোষে অনুষ্ঠিত 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলনে' ১৪-দফা কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে '৭১-এর ৯ মার্চ পল্টন ময়দানের সমাবেশেও মওলানা ভাসানী সে ১৪ দফা-উপস্থাপন করেন।*

(৬)

মওলানা ভাসানীর ১৪-দফা
[৯ মার্চ, ১৯৭১]

[১৯৭১ সালের ৯ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে মওলানা ভাসানী নিম্নোক্ত ১৪-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন ঃ]

১। বিগত ৯ই জানুয়ারী সন্তোষ সম্মেলনে এবং ১০ই জানুয়ারী পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষিত মুক্ত পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন;

২। উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ও সুষম বন্টন এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম এবং ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা;

৩। পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত পণ্যের বিকল্প সকল বিদেশী পণ্য বর্জন;

৪। পূর্ব বাংলার সর্বস্তরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন;

৫। শেখ মুজিবুর রহমান খাজনা, ট্যাক্স বন্ধের যে আহ্বান জানিয়েছেন তা যাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় তজ্জন্য সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে লবণ শুল্ক, নগর শুল্ক, হাট বাজারের তোলা, খাজনা, ইনকাম ট্যাক্স, কৃষি ট্যাক্সসহ সমুদয় ট্যাক্স প্রদান সুসংগঠিতভাবে বন্ধ রাখা;

৬। নিরস্ত্র নিরপরাধ জনগণকে গুলী করে হত্যা করার অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সামরিক সৈন্য, কর্মচারী ও সরকারী কর্মচারীদের নিকট নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি বন্ধ রাখা;

৭। পূর্ব বাংলার বর্তমান খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে যাতে কোন দ্রব্য সামগ্রী সীমান্তের অপর পারে চোরাচালান না হতে পারে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

৮। ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পতিত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা;

৯। পূর্ব বাংলায় অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংকসমূহে কোন টাকা জমা না রাখা;

১০। দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখার জন্যে কালোবাজারী ও আড়তদাররা যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মওজুত করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেয়া;

১১। বাংগালী-অবাংগালী, হিন্দু-মুসলমানের দাংগা বাঁধিয়ে গণসংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করার ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করা;

১২। বাংগালী জাতির মুক্তির আন্দোলনের নামে টাউট ও প্রবঞ্চকরা যাতে চাঁদা তুলতে না পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

১৩। বিদেশী সৈন্য যাতে পূর্ব বাংলার মাটিতে অবতরণ করতে না পারে, তজ্জন্য চট্টগ্রাম ও খুলনার সামুদ্রিক বন্দরগুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা;

১৪। গণবিরোধী শাসক চক্রের তঘমা, খেতাবসহ বিভিন্ন উপঢৌকন বর্জন করা।

সূত্রঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র', দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৭২৩-২৪

মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি

মণি সিং

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম। দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থেকে কাজ করাব পর ১৯৬৭ সালে আমি গ্রেপ্তার হই এবং ১৯৬৭ সালের মহান গণঅভ্যুত্থানের সময় জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, আমার এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি দেশের আনাচে কানাচে ধ্বনিত ক'বে তোলে, সেই পটভূমিতে ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা মুক্তি পাই। কিন্তু সামরিক শাসন জারি ও ইযাহিয়া খান ক্ষমতায় আসার পর ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আমাকে আবার গ্রেফতাব করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর বন্দীরা রাজশাহী জেল ভেঙ্গে আমাকে বেব ক'রে নেয়ার আগ পর্যন্ত আমি আটক ছিলাম। কাজেই উল্লিখিত সময়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে পার্টি ও জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামে সরাসরি যোগ দিতে পারিনি। তবে আমাদের পাটির তখনকার ভূমিকা আমার জানা আছে, সেটা সংক্ষেপে বলছি।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলেব বিশ্লেষণ ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন আমাদের পার্টিব কেন্দ্রীয কমিটির পক্ষ থেকে করা হয়। আমরা নির্বাচনের ফলাফলকে পূর্ব বাংলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান এবং একটি আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ রূপে দেখি। আমাদের বিশ্লেষণে বলা হয়েছিল যে, নির্বাচনে আওযামী লীগের ৬ দফার পক্ষে বায়ের মধ্য দিযে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা আবও বিকাশ লাভ করেছে এবং বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের আকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের পার্টি নীতিগতভাবেই সকল জাতির আত্মনিযন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠাকে ন্যায্য মনে করে এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের পার্টিই প্রথম বাংলাদেশের জনগণেব পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রনের দাবি ধ্বনিত করে।

নির্বাচনেব ফলাফল মূল্যাযন ক'বে আমবা আবও দেখেছিলাম যে আওয়ামী লীগ কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণেরই সর্বাত্মক সমর্থন পায়নি, তৎকালীন পাকিস্তানেব জাতীয সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোবে গোটা পাকিস্তানের সবকাব গঠনের অধিকাবও লাভ করেছে। কিন্তু আমবা মূল্যায়নে বলেছিলাম যে, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো এবং এই শাসকদেব মদদকারী সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই নির্বাচনের এই ফলাফল মেনে নেবে না

মণি সিং, প্রযাত কামউনিস্ট নেতা, বাংলাদেশেব কমিউনিস্ট পার্টিব সাবেক সভাপতি

এবং তা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করবে। বিশেষত ৬ দফার সঙ্গে 'ছাত্রসমাজের ১১' দফাও তখন জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল এবং বিজয়ী দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১১ দফাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। ১১ দফায় সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়েছিল, ফলে তারা ঐ নির্বাচনের দাবি কিছুতেই মানতে পারে না। এ কারণে পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন ছিল অনিশ্চিত এবং এমতাবস্থায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকেই অগ্রসর হবে এবং সে সংগ্রামের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।

১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের পার্টির এই বিশ্লেষণ পরবর্তী ঘটনাবলীতে সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ নির্বাচনের ফলাফল বানচালের জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং ভুট্টো প্রমুখের ষড়যন্ত্র পরিস্কার হয়ে ওঠে এবং জাতীয় সংসদে যে অধিবেশন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী ৩ মার্চ হওয়ার কথা ছিল তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ঐ সময় ২৫ ফেব্রুয়ারি আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাবে রাজনৈতিক দাবি হিসেবে ঘোষণা মোতাবেক জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সেখানে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারের স্বীকৃতি সম্বলিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঐ শাসনতন্ত্র অনুমোদন ও ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি উত্থাপন করে। সে সঙ্গে ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, নির্বাচনের রায়কে কার্যকরী করতে না দেয়া হলে বাংলাদেশের জনগণের আন্দোলন একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দিকে যেতে পারে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হবে বাঙালীদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনের নীতি অনুসারে ঐ সংগ্রামে শরীক থাকা এবং ঐ নীতি অনুসারে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে এই সংগ্রামকে সঠিক পথে চালিত করতে চেষ্টা করা।

১ মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন হবে না- এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে আমরা শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র কার্যকর হতে দেখলাম। ঐ দিন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে স্বাধীনতার আওয়াজ তুললো। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন ছিল যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালী জাতির এই অভ্যুত্থান দমন করার জন্য সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করবে এবং স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। সে জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।

এ ছিল পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। কিন্তু এটা ক'রেই আমরা বসে থাকিনি। আমাদের পার্টি বেআইনী এবং আত্মগোপনে ছিল। ছাত্র,শ্রমিক,কৃষক প্রভৃতি গণসংগঠনের মাধ্যমে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে আমাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রচারকার্য চালিয়েছি। পার্টির নামোল্লেখ না ক'রে আমরা 'একতা' নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছিলাম, তার মাধ্যমেও আমরা দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণকে প্রস্তুত করার জন্য প্রচার চালিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আমরা

সম্ভাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো আমাদের পার্টি ও জনগণকে প্রস্তুত ক'রে তুলছিলাম।

১ মার্চের পর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের জনসমাবেশ থেকে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম' বলে ঘোষণা দিয়ে যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন, আমরা তার পুরোপুরি সমর্থক ছিলাম। ইয়াহিয়া খান যখন ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসেন, তখন আলোচনার বিরোধিতা করাকে আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করিনি। কিন্তু আমাদের পার্টির মূল্যায়ন ছিল যে, ঐ আলোচনায় কোন আপোসরফা হবে না, কেননা জনগণ স্বাধীনতার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে এবং পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদীরা এটা মেনে নিতে পারে না। আমাদের পার্টি তখন জনগণের সচেতনতা জাগরুক রাখার জন্য এবং আসন্ন যে কোন ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে ঢাকাসহ সম্ভবমতো দেশের সব জায়গায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, তাদের কুচকাওয়াজ ও ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। তখন ছাত্রসমাজের শক্তিশালী সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে' আমাদের পার্টির প্রভাব থাকায় তাদের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউ.ও.টি.সি'র সহায়তায় তরুণ-তরুণীদের রাইফেল ট্রেনিং ও কুচকাওয়াজের আয়োজন করেছিল। ডেমরা এলাকার কিছু সংখ্যক শ্রমিকও আমরা স্বেচ্ছাসেবক ক'রে এ ধরণের ট্রেনিংয়ে যুক্ত করেছিলাম। এসব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে দেখিয়ে উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে মানসিকভাবে সচেতন ও প্রস্তুত ক'রে তোলা। এক কথায় ঐ সময়টাতে আমাদের পার্টির ভূমিকা ছিলো অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ, জনগণকে সচেতন ও প্রস্তুত ক'রে তোলা। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ২৫ মার্চের আগেই বুঝতে পেরেছিল যে, অবস্থা ক্রমেই সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ করা যায় যে, ৯ মার্চ ঢাকায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের এক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের যথাসম্ভব প্রস্তুতির জন্য একটি সার্কুলার প্রচার করা হয়েছিল। তবে তখনকার পরিস্থিতিতে কোনো কোনো জেলায় সার্কুলারটি বিলম্বে পৌঁছে এবং পার্টির তখনকার শক্তি সামর্থ সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যাপক প্রস্তুতির উপযুক্তও ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে ২৫ মার্চ জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হয়।

সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ছিল এই যে, জনগণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে এবং বিশেষত সমগ্র পাকিস্তানে আওয়ামীলীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং বাঙালীদের জাতীয় অধিকারের দাবির সঙ্গে ১১দফায় সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী আকাংক্ষা ব্যক্ত হওয়ায় পাকিস্তানে একটি সরকার গঠন এবং বাঙালীদের দ্বারা শাসিত হওয়ার অবস্থা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই মেনে নেবে না।

কাজেই বাঙালীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যাবে। সে জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও প্রস্তুত করাই মুখ্য কাজ এবং তা খুব দ্রুত করতে হবে। সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়নের আরও একটি দিক আমাদের পার্টির ছিল। তা হচ্ছে, আমরা সচেতন ছিলাম যে, আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কতোগুলো দুর্বলতা থাকবে। মধ্যস্তরের জনগণের যে দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করেছিল, তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও তার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনার ঘাটতি ছিল এবং শ্রমিক -কৃষক মেহনতি-মানুষের সংগঠন শক্তি ছিল দুর্বল। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আওয়ামী লীগের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আমরা অনিবার্য ঘটনা ধারায় পিছনে পড়ে না থেকে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রামের গতিধারায় অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের সচেতন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় ঐ দুর্বলতাগুলো কাটানো প্রয়োজন বলেই তখন সিদ্ধান্ত করেছিলাম। তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের জন্য জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় মুক্তির সমর্থক আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সমর্থন সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তাও আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। উল্লেখ্য যে, ২৫ মার্চের আগেই ঢাকায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন দেশে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা ক'রে পত্র পাঠায়।

স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা ও প্রচার চালানোর মাধ্যমে প্রতিরোধের শক্তিগুলোকে প্রস্তুত করার চেষ্টার কথা আগেই বলেছি। ২৫ মার্চ পাকবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হলে আমাদের পার্টির ছাত্র-যুবক -শ্রমিক-স্বেচ্ছাসেবকরা যেখানে যতটুকু সম্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ প্রভৃতি দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে মিলিতভাবে প্রতিরোধরত বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর বাহিনীর সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ এই প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে প্রথমে শহর থেকে গ্রামে এবং পরে বাধ্য হয়ে আমাদের কর্মীরা ভারতে চলে যায়। তাঁরা আমাদের পার্টি ও গণসংগঠনের সমর্থক তরুণদেরও সংগঠিত ক'রে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং-এর জন্য ভারতে যেতে থাকেন। অনেক বিপন্ন পরিবারও ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

সীমান্ত অতিক্রম করার প্রাক্কালে আমি রাজশাহী জেলে বন্দী ছিলাম। বাইরে সমগ্র জাতি যে মুক্তির জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারতাম। বুঝতে পারতাম সামনে অপেক্ষা করছে এক নিদারুণ রক্তাক্ত সংগ্রাম। রাজশাহী শহরে ইপিআর-এর ক্যাম্প ছিল। পাকবাহিনীর ক্যাম্পও ছিল। ২৫ মার্চ পাকবাহিনী ইপিআর ক্যাম্পে আক্রমণ করে। ইপিআর প্রতিরোধ করে। আমি গোলাগুলির আওয়াজ শুনি এবং কিছু কিছু গোলাগুলি জেলখানার কাছে এসে পড়তে থাকে। ফলে বন্দীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। গোলাগুলির মাঝে পড়ে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু ঘটতে পারে। অন্য সকলে আমাকে এসে বলে যে, আপনি ডিআইজি-কে বলুন জেলের গেট খুলে সকলকে মুক্ত ক'রে দিতে। ডিআইজি- কে বললাম,

কিন্তু তিনি রাজি হননি। তখন বন্দীরা ও জনতা মিলে জেলের ময়লা ফেলার দরজা ভেঙ্গে ফেলে। আমরা বের হয়ে আসি। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। জনতাই আমাদের পদ্মা নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে নৌকায় উঠিয়ে দেয় এবং বলে যে, শহরে থাকা আপনাদের জন্য নিরাপদ নয়, আপনারা নদীর ওপারে চলে যান। নৌকাযোগে নদী পার হয়ে বুঝতে পারি যে, আমরা ভারতের মাটিতে পা দিয়েছি কারণ পদ্মার ওপারেই ভারত।

এই সময়ে জেলের ভেতরের বিচিত্র কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু মার্চ মাসের একটি অসাধারণ ঘটনা ছিল। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে ডাক দেয়ার পর ঐ ভাষণ ও ঘোষণার জন্য আমি বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন ও সমর্থন জানিয়ে রাজশাহী জেল থেকে একটি টেলিগ্রাম করতে চাই। জেল কর্তৃপক্ষ বলে যে, 'আপনি তো টেলিগ্রাম করতে পারবেন না, কারণ আপনি ডেটিনিউ। আপনার টেলিগ্রাম পাঠাতে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অনুমোদন লাগবে।' আমি বললাম, 'তবে অনুমোদন নিয়ে আসুন।' তারা বললেন যে, 'এখন অনুমোদন আনা যাবে না, কারণ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে কেউ কাজ করছে না, তারা অসহযোগ আন্দোলনে শরীক হয়েছে' এমন অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক জীবনে ইতোপূর্বে আর ছিল না। তখন জেলের ভেতর থেকে আমি বুঝতে পারি যে, সমগ্র জাতি স্বাধীনতার জন্য কতোখানি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

প্রতিরোধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে আমাদের আত্মগোপনরত পার্টির সম্পর্ক ছিল; বিশেষত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর) সাথে আমাদের পার্টির ঐতিহ্যগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ন্যাপের অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সমাজতন্ত্রের সমর্থক ভূমিকার জন্য আমাদের পার্টির সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ও নীতিগত মিল ছিল বেশী। অসহযোগ আন্দোলন, প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে এই দুই পার্টি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ন্যাপের (এবং ছাত্র ইউনিয়নের) সঙ্গে মিলিতভাবে আমাদের পার্টি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। অনেক স্থানে একত্রে ক্যাম্প করা হয়।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে ১৯৬০-৬১ সাল অর্থাৎ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা থেকেই আমাদের পার্টির সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ছিল। আমাদের পার্টি আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হলেও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব সময়টাতে আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের মতবিনিময় ও পরামর্শ হয়েছে। ১৯৭১-এর নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানী শাসকরা যে মেনে নেবে না এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রাম হতে পারে এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের পার্টি ঐকমত্যে পৌঁছে ছিল। বঙ্গবন্ধু আমাদের বলেছিলেন যে, সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং

স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থনের জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা তাঁর জন্য মূল্যবান হবে, কেননা আওয়ামী লীগের এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের অভাব রয়েছে। বঙ্গবন্ধু আজ বেঁচে নেই। তিনি ঘাতকের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর স্মৃতিকে স্মরণ ক'রে আমি বলতে চাই যে, কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তিনি যে মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে আমরা তা পূরণ করতে পে'ছি।

১৯৭১ সালের এপ্রিলে আওয়ামী লীগ প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী ঘোষণা করার পরই দেশের ভেতরে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সম্পাদকমন্ডলীর উপস্থিত সদস্যরা এক বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাগত জানায় এবং প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা ঘোষণা করে। আমাদের পার্টির ঐ প্রথম প্রকাশ্য বিবৃতি বিদেশে সংবাদপত্রে ও বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্টির ভূমিকা দেশে-বিদেশে জনগণ জানতে পারে। আমাদের পার্টির বহু সদস্য-সমর্থক বাংলাদেশ সরকারের অধীনে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং গ্রহণ করে। তবে এক্ষেত্রে সরকার ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের পার্টির কিছু কিছু দ্বিমত ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্যান্য দলের মধ্যে কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননদের দলের সঙ্গেও আমাদের দেখা-সাক্ষাত হয়। এরা মাওবাদী নীতি অনুসরণ করলেও ২৫ মার্চের পর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যায়। এরা স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন দিলেও আওয়ামী লীগের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, স্বাধীনতার শক্তিগুলোর ঐক্য এবং স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক শত্রু-মিত্র সম্পর্কে এঁদের নীতির সঙ্গে আমাদের প্রভূত পার্থক্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে এঁরাসহ কিছু মাওবাদী শক্তি আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে একটি 'বামপন্থী ফ্রন্ট' গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তাকে আমরা বিভেদাত্মক ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করার প্রয়াসী বলে ভ্রান্ত মনে করে প্রত্যাখ্যান করি এবং আওয়ামী লীগসহ জাতীয় ঐক্য গঠনের নীতি অনুসরণ করি। স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী দলগুলোকে আমরা শত্রু ব'লে চিহ্নিত করি।

২৫ মার্চের পরে জেল ভেঙ্গে মুক্ত হওয়ার পর কয়েকজন সহকর্মীসহ আমার নিরাপত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন উপলব্ধি করে জনতাই আমাদের ঠেলে নিয়ে পদ্মা পার করিয়ে দেয়, একথা আগেই বলেছি। কাজেই দেশের ভিতরে আমাদের পার্টির সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকতে পারিনি।

আমাদের পার্টির অন্য নেতারা ২৫ মার্চের পর সঙ্গে সঙ্গেই দেশত্যাগ করেননি। তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী ভেতরে থেকে প্রতিরোধ সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। অচিরেই ঢাকায় থাকা অসম্ভব এবং সকলের থাকা অপ্রয়োজনীয় মনে হলে আমাদের পার্টির নেতৃবৃন্দ তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, খোকা রায়, মোহাম্মদ ফরহাদ,

জ্ঞান চক্রবর্তী, সাইফউদ্দিন মানিক, মঞ্জুরুল আহসান প্রমুখ ঢাকা জেলার বেলাবো থানার রায়পুরায় ঘাটি করে অবস্থান করেন। কিন্তু কমরেডকে অধিকৃত রাজধানীতে রেখে যাওয়া হয়। রায়পুরা এলাকা পাকবাহিনীর পদানত হলে আমাদের নেতৃবৃন্দ ভৈরবের দিকে আশুগঞ্জে সরে গিয়ে অবস্থান নেন। নেতৃবৃন্দ দেশে থেকে পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং পুনর্গঠিত হয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধে ভূমিকা পালনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। আশুগঞ্জে বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে নেতৃবৃন্দের থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে এলাকার জনগণ তাঁদেরকে ক্রমে সীমান্তের দিকে নিয়ে যায়। সীমান্ত অতিক্রম করার আগেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন জেলা সংগঠনের জন্য নির্দেশ দিয়ে ক্যাডার পাঠাতে সক্ষম হন।

পাকবাহিনীর আক্রমণ, নির্বিচার গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতির মুখে সীমান্ত এলাকার জেলাগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ ভারতে চলে যায়। আমাদের পার্টির বহু কর্মী-সমর্থক সপরিবারে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। অন্যান্য দলের রাজনৈতিক কর্মীরাও চলে যায়। আমাদের হিসেবে আমাদের পার্টির নেতা, সমর্থক ও কর্মীগণ এবং তাদের পরিবারবর্গ মিলিয়ে প্রায় ৬ হাজার নরনারী পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মেঘালয় এই তিনটি ভারতীয় রাজ্যে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় গোটা পার্টির সংগঠন সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জেলায় দেশের মধ্যেও আমাদের কিছু কমরেড থেকে গিয়েছিলেন। প্রবাসে সকলের জন্য আশ্রয়, খাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, ভেতরে-বাইরে সকল পর্যায়ের পার্টির সংগঠনের সাথে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করা, সংগঠন গুছিয়ে নেয়া এবং সর্বোপরি কালবিলম্ব না করে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা প্রভৃতি অত্যন্ত দুরূহ কাজ তখন পার্টির সামনে ছিল। আমাদের নেতা-কর্মীদের সবকিছু দৃঢ়তার সাথে হাসিমুখে সহ্য করা, অসম সাহসিক প্রয়াস এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির সাহায্যের ফলে অতি অল্প সময়ে আমরা কাজগুলো গুছিয়ে তুলি। এ পর্যায়ে আমাদের সংগঠিত হওয়ার কাজের ধারাগুলো ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ : (ক) কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ ক্যাম্প স্থাপন; ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের সহায়তায় সীমান্তবর্তী ভারতের তিনটি রাজ্যেই তাদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা। (খ) দু'ধরনের ক্যাম্প ছিল: পার্টির বয়স্ক সদস্যদের পরিবারবর্গসহ আশ্রয়ের জন্য এবং তরুণদের জন্য, যাদেরকে লড়াইয়ের উপযুক্ত মনে করা হবে ও ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো হবে। (গ) ক্রমশ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা গ্রহণ এবং আমাদের ক্যাম্পে সংগঠিত তরুণদের সরকারের মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং-এ প্রেরণ। (ঘ) আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের মিলিত একটি নিজস্ব গেরিলা বাহিনী গঠন। এতে প্রথমে ট্রেনিং দানে প্রভৃত 'টেকনিক্যাল' অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু পরে ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে তা গঠন করা সম্ভব হয়। (ঙ) আগরতলায় এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে কোলকাতায়ও কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যালয় গঠন করে কাজ করা। (চ) আমাদের নিজস্ব

গেরিলা বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই দেশের ভেতরে যুদ্ধ করতে পাঠানো। (ছ) দেশের ভেতরের কমরেডদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং অনুপ্রবিষ্ট গেরিলাদের তাদের সহায়তা গ্রহণ। (জ) আমাদের ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা তরুণদের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা। (ঝ) কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে তা সকল ক্যাম্পে, শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ও দেশের ভেতরেও প্রচারের ব্যবস্থা করা।

আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনীতে ৫ হাজার তরুণকে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পাঠানো হয়। এছাড়া আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা ১২ হাজার তরুণ সংগ্রহ ও সমাবেশ করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিবাহিনীতে পাঠাই। অর্থাৎ আমরা মোট ১৭ হাজার তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং ও যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করি। তবে যুদ্ধের পরে এই তরুণরা অনেকে লেখাপড়া, অনেকে চাকরি, কৃষিকাজ ও ব্যবসা প্রভৃতি নিজ নিজ পেশায় ফিরে যায় এবং এরা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ছিল না।

ভারতে যাওয়ার পরই ১৯৭১ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি মিলিত হয়ে এর প্রথম বৈঠকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক চরিত্র, সংগ্রামের শক্তি এবং শত্রু-মিত্র প্রভৃতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করে একটি দলিল গ্রহণ করেছিল। ঐ দলিলে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক ধরনের শাসন- শোষণের স্বরূপ নির্দেশ করে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামকে জাতীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রাম বলে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। মূল্যায়নে বলা হয়েছিল যে, স্বাধীনতার জন্য জনগণের দৃঢ় একতা এবং মুক্তিবাহিনীর বীরত্ব ও ত্যাগ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান শক্তি এবং প্রতিবেশী ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক শিবির, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও দুনিয়ার শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রগতিকামী শক্তি আমাদের বন্ধু এবং অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীন ও দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলরা পাকিস্তানের সমর্থক ও আমাদের স্বাধীনতার শত্রু বলে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এই মূল্যায়ন সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

মে মাসের পরেও মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা করা সম্ভব হয়েছে, যদিও আমাদের কমরেডরা ভারতের তিনটি রাজ্যে ও দেশের মধ্যেও ছড়িয়ে থাকায় তা খুব কষ্টসাধ্য ছিল।

ভারতের তিনটি রাজ্যেই (পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়) সীমান্তবর্তী শহরে আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ ক্যাম্প ছিল। দু'ধরনের ক্যাম্প ছিল- পার্টির বয়স্ক সদস্যদের পরিবারবর্গসহ এবং যুদ্ধে পাঠানোর জন্য তরুণদের 'ইয়ুথ ক্যাম্প।'

দেশ থেকে যাওয়ার সময় আমাদের কমরেডদের সঙ্গে যে যৎসামান্য অর্থসম্পদ ছিল তাই ছিল আমাদের প্রাথমিক সহায়। পরে ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা গঠিত সহায়ক সমিতি থেকে আমরা অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য পেয়েছিলাম। আমাদের প্রতিষ্ঠিত কিছু ক্যাম্প আমরা

বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মিলিয়ে দিয়েছিলাম। পরে অল্প সংখ্যক ক্যাম্পই আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

এছাড়া ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় প্রবাসী আমাদের পার্টির সমর্থকরা অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করে পাঠাতেন। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নৃশংসতা ও বাঙালীদের সাহসিক যুদ্ধের খবর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে ছাপা হওয়ার পর সারা দুনিয়ায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এ পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধের শেষের মাসগুলোতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য সংগ্রহের কাজটা লন্ডনে আমাদের কমরেড ও সমর্থকরা সমন্বিত করে আমাদের কাছে অর্থ পাঠাতেন।

আমাদের ক্যাম্পে সংগঠিত তরুণদের অধিকাংশকেই যেহেতু সরকারী মুক্তিবাহিনীতে পাঠিয়ে দেয়া হতো, তাই খুব বেশী খরচের বোঝা আমাদের বহন করতে হয়নি। আর আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনীর ছেলেরা দেশের ভেতরে এসে জনগণের সহায়তায় আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করতো।

আমরা আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তির বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলাম। এই প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকারের 'পরামর্শদাতা কমিটি' গঠিত হয় এবং তাতে আমাদের পার্টির প্রতিনিধি রূপে আমি ছিলাম। সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্রগতির পর্যায়ে আমাদের উভয় দলের কিছু দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য ছিল। আমরা মুক্ত এলাকা গড়ে তুলে সেখানে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করার মাধ্যমে ভবিষ্যত বাংলাদেশের মডেল জনগণের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতাম এবং ঐ রকম রণকৌশল গ্রহণের কথা বলতাম। আমরা স্বাধীনতা কেবল সাধারণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতাম না। মেহনতী মানুষ শোষণ ও নির্যাতনমুক্ত সুখী জীবন গড়ার আকাংখা থেকেই স্বাধীনতা চাইতো। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের দৃঢ় ও শক্তিশালী রূপে সংগঠিত হয়ে ওঠার লক্ষ্য সামনে রেখেছিলাম। মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ কিছু নিতে পারলে সারা দেশের মেহনতি জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে আরও উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসতো। আমরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভর করার ওপর জোর দিতাম। এই সকল বিষয়ে আওয়ামী লীগের স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

আওয়ামী লীগের একাংশের তরুণদের দ্বারা 'মুজিব বাহিনী' নামে একটি পৃথক বাহিনী গঠিত হবার পর তাদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে আমাদের সমর্থক গেরিলাদের দেশের ভেতরে প্রেরণের প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে আমাদের কিছু অসুবিধা দেখা দিতো। এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য পরে একটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছিল।

তবে সার্বিকভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কমিউনিস্টরা সব সময় তাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য হিসেবেই যে কোন জাতির ন্যায্য সংগ্রাম জাতীয়

স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করে। এই নীতি থেকে স্বতন্ত্র আমাদের প্রচেষ্টা ছাড়াই মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের জাতীয় সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং বাংলাদেশের পক্ষে ভারতে জনমত গঠনে প্রভৃত সহায়তা করে। এজন্য তাঁরা নিজেরাই প্রচার গড়ে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশেষত পাকবাহিনীর নিষ্ঠুর নির্যাতন ও গণহত্যা এবং প্রায় ১ কোটি ছিন্নমূল নর-নারী ও শিশুর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি ভারতের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে গভীর আবেগ সৃষ্টি করেছিল। ভারত, বিশেষত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশের শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা হাসি মুখে সহ্য করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই জনমতকে আরও বিস্তৃত ও সংহত করার জন্য অবদান রেখেছে। ভারতের বিরোধী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কিছু কিছু বিভ্রান্তি ও বিরুদ্ধ মত ছিল। কোন কোন প্রশ্নে কংগ্রেসেরও দোদুল্যমানতা ছিল। এক্ষেত্রে ভারতের অভ্যন্তরে একটি রাজনৈতিক লড়াই ছিল। এই লড়াইয়ে বাংলাদেশের পক্ষে সিপিআই'র সুস্পষ্ট ভূমিকা দ্বারা আমাদের সংগ্রাম লাভবান হয়েছে।

আগেই বলেছি যে, ২৫ মার্চের আগেই আমরা ভ্রাতৃপ্রতীম পার্টিগুলোর কাছে আমাদের সম্ভাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়তার জন্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে চিঠি পাঠাই। এরপর ভারতে যাওয়ার পর মে মাসে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে এক বৈঠকে বসে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে আমাদের পার্টির একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আগে থেকেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিল।

সকলেই জানেন যে, রণক্ষেত্র থেকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের টেবিল পর্যন্ত সবত্র প্রতিবেশী ভারত ব্যতীত সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং আন্তর্জাতিক প্রগতি ও শান্তির শক্তিসমূহের সক্রিয় সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। আমাদের পার্টি স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও শান্তির শক্তিসমূহের সমর্থন ও সাহায্য সমাবেশ করার কাজে উদ্যোগ নিয়েছিল। আমাদের পার্টিই উদ্যোগী হয়ে এপ্রিল মাসে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেশ চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সহায়তায় ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বিদেশে পাঠায়। এই দলের সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদ, ন্যাপের দেওয়ান মাহবুব আলী (ফেরার পথে দিল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন) এবং

কমিউনিস্ট পার্টির ডাঃ সারোয়ার আলী। এই 'শান্তি প্রতিনিধি দল' ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানী সফর করে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কাছে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া বাহিনীর ভয়াবহ গণহত্যা এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় তুলে ধরেন। এটাই ছিল বিদেশে বাংলাদেশের প্রথম প্রতিনিধি দল। তখন পর্যন্ত কোলকাতা ছাড়া বিদেশে কোথাও বাংলাদেশ সরকারের মিশন সংগঠিত হয়নি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে শুরুতে বিদেশে, এমনকি প্রগতিশীল মহলেও আমাদের সংগ্রাম সম্পর্কে নানা রূপ প্রশ্ন বিদ্যমান ছিল। বিদেশের পাকিস্তানীদের মিথ্যা প্রচার খন্ডন করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ১৯৭০-এর নির্বাচনে জনগণের রায়ের প্রকৃত তাৎপর্য এবং আমাদের সংগ্রাম যে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা' নয় ও জনগণের ব্যাপক সমর্থনপুস্ট জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য সংগ্রাম, একথাও বিদেশে প্রচারের প্রয়োজন ছিল। অন্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে মুসলিম দেশ পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য 'অন্য দেশের ষড়যন্ত্র' বলেও একটা বিভ্রান্তি ছিল। আমরা চিঠিপত্র ও প্রচারপত্রের মাধ্যম বিদেশে এইসব ভ্রান্তি মোচনের চেষ্টা করেছি। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার কিছুকাল আগে হতেই আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল শক্তিসমূহ, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থন ও সাহায্য ব্যতীত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের মাওবাদী নেতৃত্বের সমর্থনপুষ্ট বর্বর ইয়াহিয়া চক্রকে পরাভূত করা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই পার্টি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন ও সাহায্যের আবেদন জানিয়ে দুনিয়ার ভ্রাতৃপ্রতীম কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কাছে বিশদ চিঠি পাঠানোর, স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিশীল জনমত সমবেত করার এবং অন্য সকল সম্ভাব্য পন্থার জন্য চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত মতে প্রথমে পাকবাহিনীর গণহত্যা শুরু হওয়ার আগে ১৪ মার্চ এবং সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হওয়ার পরে মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিসহ দুনিয়ার প্রায় সমস্ত কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের মাধ্যমে জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও মুক্তি সমর্থনকারী শান্তি ও প্রগতির শক্তিসমূহ এবং গণতান্ত্রিক জনগণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়েছিল। এটি বিশ্ব জনমত গড়ে ওঠায় ও আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বের গণমাধ্যমে প্রচারে সহায়ক হয়েছিল। কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যে কংগ্রেসের কথা আগে বলেছি, সেখানে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি দল ২২টি ভ্রাতৃপ্রতীম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তাছাড়া শান্তি আন্দোলন ও অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সমর্থন পাবার চেষ্টা আমাদের পার্টি করেছে। আমরা বলতে পারি যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে সমবেত করার

ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি যথোচিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যথাসাধ্য অবদান রেখেছে। বিশ্ব জনমত গঠনের ক্ষেত্রে এবং তার কার্যকর ভূমিকা সংহত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির অবদানই সবচেয়ে বেশি।

স্বাধীনতা যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য সমগ্র জাতির একতা এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে স্বাধীনতার সকল শক্তি বিশেষত আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতার প্রয়োজন ছিল।

আমাদের পার্টি স্পষ্টভাবে এইসব রাজনৈতিক দল সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আওয়াজ তুলেছিল এবং সে ফ্রন্ট গঠনে অবিরাম প্রচেষ্টা নিয়েছিল। বিশ্ব জনমত এবং ভারতের জনমতও বাংলাদেশের নিকট এরূপ জাতীয় ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চাচ্ছিল। আওয়ামী লীগ এ ধরনের জাতীয় ঐক্য গঠনের গুরুত্ব বিলম্বে উপলব্ধি করে। পাশাপাশি কয়েকটি মাওবাদী উপদল আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে তথাকথিত 'বামপন্থী ফ্রন্টের' নামে এক বিভেদাত্মক আওয়াজ তুলেছিল। এই দুই মনোভাবের বিরুদ্ধেই আমাদের পার্টির ঐক্যের নীতি তথা জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের নীতি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিকে কার্যকর হয়নি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুকাল পরে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং ব্যক্তিগতভাবে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে তদানীন্তন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের একটি 'পরামর্শদাতা কমিটি' গঠিত হয়েছিল। এই কমিটিতে আমাদের পার্টির প্রতিনিধি ছিলাম আমি।

এই পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের গুরুত্ব ছিল এই যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি যে একতাবদ্ধ সেটা প্রত্যক্ষভাবে দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করা গিয়েছিল। বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে ঐ কমিটি দেশের ভেতরে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মনে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। এ কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশপ্রেমিক শক্তির আরও সমঝোতা ও ঐক্য গড়ার ভিত্তিও সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের পার্টি পরামর্শদাতা কমিটি গঠনকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে ঐ কমিটি তেমন কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি এবং ঐ ঐক্যের উচ্চতর কোন বিকাশও ঘটেনি। এ বিষয়ে প্রধানত গুরুত্ব উপলব্ধিতে আওয়ামী লীগের দুর্বলতা ও অনুৎসাহ ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত একটি পৃথক গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই বাহিনী গঠন, ব্যবস্থাপনা, ভারত সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ প্রভৃতির সামগ্রিক দায়িত্বে তখন ছিলেন আমাদের পার্টির মোহাম্মদ ফরহাদ। আমাদের গেরিলা টীম সকল জেলায় পাঠানো হয়েছিল। ঢাকার খোদ রাজধানী, নরসিংদী, রায়পুরা, কুমিল্লা, নোয়াখালিতে, চট্টগ্রামে, রংপুরসহ উত্তরবঙ্গের কয়েক স্থানে আমাদের টীমগুলো গেরিলা অ্যাকশন করেছে এবং রণক্ষেত্রে আমাদের কমরেডরা প্রাণ দিয়েছেন। যারা ভারতে যাননি, সেই কমরেডরা

দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধের সংগঠন গড়ে তুলছিলেন এবং এরাই ভারত থেকে আগত আমাদের গেরিলাদের অ্যাকশনে সাহায্য করেছেন। এখন বয়সের কারণে কোন সময় কোথায় কোথায় আমাদের টীম কিরূপ অ্যাকশন বা লড়াই করেছিল তা স্মৃতি থেকে আমার পক্ষে বিশদ বলা সম্ভব নয়। আমরা নিজেরা, বাংলাদেশ সরকার এবং মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় সাধ্যমতো সারা দেশে যুদ্ধরত ছিলাম। যুদ্ধ ছাড়া সংবাদ বহন, রেকি করা প্রভৃতি যুদ্ধের সহায়ক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আমাদের কমরেডরা করেছেন। কেবল নিচু পর্যায়ে নয়, উঁচু পর্যায়েও যুদ্ধের সংগঠনে আমাদের ভূমিকা ছিল। যেমন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম বিমান বাহিনী গঠনে আমাদের পার্টির অবদান ছিল। ছোটখাটো গেরিলা অ্যাকশন ছাড়াও, আমাদের গেরিলারা চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানী জাহাজ ডুবিয়েছিল। কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে বেতিয়ারা নামক স্থানে কমরেড আজাদ মুনির প্রমুখ আমাদের গেরিলা বাহিনীর ৯ জন সদস্য পাকবাহিনীর সঙ্গে এক লড়াইয়ে নভেম্বর মাসের ১১ তারিখে নিহত হন। মুক্তিযুদ্ধ কালে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শহীদুল্লাহ কায়সার ঢাকায় আলবদর বাহিনীর হাতে নিহত হন।

সূত্র : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃক প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের সংকলন 'বেতিয়ারা', ডিসেম্বর ১৯৯৫, সম্পাদক শাহ আলম

প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ : কিছু কথা

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোন কিছু বলার বড় অসুবিধা হলো সেটা ছিল স্বল্পকালীন. দ্বিতীয় সমস্যা হলো এর বারো আনাই গেছে অন্যদের ভাগে। গোপন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শেখ মুজিব '৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে পাকসেনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও তাঁকে বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের নায়ক। কিন্তু নায়ক কখনো শত্রুর হাতে ধরা দেয় না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সব কৃতিত্ব স্বীকার করেই বলছি. কোন্ দেশে. কোন কালে নেতা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ইচ্ছে করে শত্রুর হাতে ধরা দেয়? এ কথায় সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা হাহাকার করে উঠবেন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের স্বার্থে সব কথাই বলতে হবে। সিরাজউদ্দৌলাও পালানোর চেষ্টা করেছিল. মুজিব করেনি। মুজিব আমাকে বললো. তুমি ভাগো। আর সে কিনা উঁচা লম্বা. তাকে নাকি দেখে ফেলবে' প্রতিরোধ যুদ্ধের ৯ মাস লড়াই করেছেন তাজউদ্দীন আহমেদ। কিন্তু ইতিহাসে সে নায়ক নয়. তাঁর নাম কোথাও নেই। যুদ্ধ শুরু হলে নেতারা সব ভারতে যেয়ে হাজির হোল। কিন্তু সমস্যা ছিল ভারতের সরকারতো তাজউদ্দিন আহমেদকে চিনতো না। চিনতো 'ন্যাপ'কে। এক সময় আমাদের প্রায় এ ধরনের একটি ব্যঙ্গও প্রায়ই শুনতে হতো : ন্যাপ মানে নেহেরু এইডেড পার্টি (এন মানে নেহেরু. এ-তে এইডেড. পি-তে-পার্টি)। আর ন্যাপ যেহেতু গফুর খান. ওয়ালী খান. মওলানা ভাসানী এদের মতো নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত তাই ভারতীয় সরকার ন্যাপ'কে স্বাগত জানালো। আর একটি বিষয় ছিল তখন কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করতো না। তাদের অনেক নেতা কর্মীই ন্যাপ-এর ব্যানারে কাজ করতো।

২.

দেশে ফিরে এসে জানলাম-যুদ্ধ একমাত্র আওয়ামী লীগ করেছে। আর দেখা গেল ষোড়শ বাহিনী তৈরি হয়ে গেছে। মিথ্যে কতোগুলো নতুন সার্টিফিকেট নিয়ে যারা যুদ্ধ করেনি তাদেরকে দেয়া হলো। এভাবে মিথ্যা আরম্ভ হলো। সত্যকে অস্বীকার করা. বিকৃত করা

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ : ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি. মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য।

শুরু হলো। কারণ সংস্কৃতির অভাব, রুচির অভাব, বড় পার্টির মাঝে শৃংখলার অভাব। চোরের দেশে, চোট্টার দেশে, বদমাইশের দেশে সার্বিক কি করবে! পৃথিবীর ইতিহাসে কী আছে? বন্দুক নিয়ে যারা যুদ্ধ করবে, তারাই নায়ক। এখানে একটা ভাব দেখা গেছে অমুক সেক্টর, তমুক সেক্টরে যারা বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করেছে, সেটাই যেন সব। আর রাজনৈতিক, কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা যেন কিছুই না। স্বাধীনতার পতাকা কোন খলিফা বানিয়েছে, এটা নিয়েও ঝগড়া' এর পর ঝগড়া হবে, কাপড়টি কোন দোকান থেকে কেনা হয়েছিল? সূতাটা কোন মিলের ছিল' এরকম সংকীর্ণতা, এরকম হীনমন্যতা আমি কোন দিন শুনিনি। স্বাধীনতার ঘোষক কে- এটা কোন প্রশ্ন হলো? সত্যের খাতিরেই যদি বলতে হয়, যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা কতো? ৩০ লক্ষ' তাহা মিথ্যা কথা। আমি তো বলতে পারি ৩০ হাজার মারা গেছে। আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে কে?

৩.

জাতির পিতা, জননেতা, রাষ্ট্রনায়ক- এক জিনিস নয়। কিন্তু, শেখ মুজিবকে কিছুটা সময় দেয়া উচিত ছিলো। যুদ্ধ -বিধ্বস্ত অর্থনীতির একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে সে দেশে এলো- এর ক' দিনের মধ্যে তাঁকে হত্যা করা হলো এবং প্রচার করা হচ্ছে তাঁর অযোগ্যতাকে। এটা কি ঠিক? এতো কম সময়ের শাসনকাল দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিচার করাটা তাঁর প্রতি অন্যায় করা হবে।

৪.

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, চেতনা, ভিত্তিই আসলে সমাজতন্ত্র। মানুষ না বুঝুক, বুর্জোয়া দলগুলো ঠিক বুঝেছিল। আমি ভালো থাকবো ভাল খাবো- জনগণ এতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কোন কোন বাম দল বলেছিলো- এ যুদ্ধ দুই কুকুরের লড়াই, এতে আমরা নেই। এরা যদি ম্যাচিউরড্ হতো, তাহলে যুদ্ধ শেষে অন্তত বলতো- আমরা কেউ যুদ্ধে অংশ নিয়েছি কেউ সুযোগ পাইনি, তবে আমরা মুক্তিযুদ্ধ স্বীকার করি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্বীকার করি। আর সে সময় কমিউনিস্ট পার্টিতো অপ্রকাশিত ছিল। যার যেটা প্রাপ্য তাকে সেটা দেয়া উচিত। বামপন্থীদের অনেকের মাঝে এই দেয়ার মন মানসিকতা নেই।

৫.

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। ইন্দিরা গান্ধী সারা বিশ্ব ঘুরে ঘুরে কি করেছে না করেছে এই ইতিহাস কেউ লিখবে? লিখবে না। আজ মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে, এখানে হাকসার কোথায়? ডি পি ধর কোথায়? পি এন ধর কোথায়? তাদের ঘুম ছিল না, নিদ্রা ছিল না। আমাদের বুদ্ধি দিয়েছিল, পরামর্শ দিয়েছিল- এভাবে করবেন, সেভাবে করবেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে হবে তার 'ব্রেইন চাইল্ড' ছিল হাকসার। আমরা তার খবর নেই না। এসব বিষয় বিভিন্ন কারণে কেউ

স্বীকার করতেও রাজী না। রাজাকাররা স্বীকার করবে না, কারণ, তারা রাজাকার। মুক্তিযোদ্ধারা স্বীকার করবে না, কারণ পাছে লোকে বলে মুক্তিযুদ্ধ ভারতের দান! এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন রুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক এই ব্যাপারে কথা বলতে সাহস পাবে না। ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে ভারত আমাদের যে সাহায্য করেছে, সেটা যে কারণেই করে থাকুক, তাদের মোরাল এবং মেরিটিক্যাল সাপোর্ট বাদ দিয়ে ইতিহাস হয় না।

৬.

মুক্তিবাহিনী এবং মুজিববাহিনীর পার্থক্যকরণ চিন্তাটা ভুল, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের বিভিন্ন রকম বিন্যাস হতে পারে। যেমন মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা কেবিনেট করেছি, আবার উপদেষ্টা কমিটিও করেছি। সেই অর্থে এখানে মুজিববাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য কি ছিল- একমাত্র স্বাধীনতা বিরোধীরা এ পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করতে পারে।

৭.

স্বাধীনতার ২৫ বছর পার হলেও যেমন স্থিতিশীল সরকার দেশে আসেনি, তেমনি জনগণের ন্যূনতম অর্থনৈতিক দাবিও পূরণ হয়নি। দেশে একটা গণতন্ত্রী সরকার করতে হলে যে ধরনের সংস্কৃতি থাকা দরকার সেটা নেই। সাধারণ লোকের ভোটের চেতনা, গণতন্ত্রের চেতনা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। যারা শিক্ষিত লোক, রাজনীতির সাথে আছে, তাদের গণতান্ত্রিক চেতনা, গণতান্ত্রিক রুচিবোধ এতো নিম্নস্তরের যে এখানে এটা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। সে জন্যই অনেকে বলে যে, এসব দেশে বিশেষ ধরনের গণতন্ত্রের প্রবর্তন করা মানে হচ্ছে শিশুর হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া। এখানে এ ধরনের গণতন্ত্র না দিয়ে অন্য কোন ধরনের গণতন্ত্র দেয়ার চিন্তা করা উচিত। অনেকে মনে করেন স্বাধীনতা দেয়া উচিত নয়; কারণ এগুলো অনুন্নত দেশ। মূল কথা হলো, নীতিহীন যে রাজনীতি, আদর্শ ছাড়া যে রাজনীতি তার পরিণতি এমনই হয়। তবে আমি আশাবাদী ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি। আমি মনে করি, গণতন্ত্রকে অন্য কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, গণতন্ত্রকে চালু রেখেই গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বামপন্থীদের ভূমিকা

হায়দার আকবর খান রনো

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনীর হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়েই শুরু হয় সশস্ত্র স্বাধীনতার যুদ্ধ। আমার জানামতে, সেই রাতে রমনা থানার ও.সি. (নামটা এখন মনে নেই) প্রথম জনগণকে প্রতিরোধের ডাক দিয়ে নিজেই থানার সামান্য কিছু অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রতিরোধ শুরু করেন এবং শহীদ হন। এর কয়েকদিন আগে জয়দেবপুরে পাক ক্যান্টনমেন্টে বাঙ্গালী সৈন্যরা বিদ্রোহ করেন এবং সংঘর্ষের এক পর্যায়ে তারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হন, শেষে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত পৌঁছান। ২৬ মার্চ সকালে চট্টগ্রাম রেডিও থেকে তখনও সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মেজর জিয়া স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং তিনি আরও বলেন যে, শেখ মুজিবের নির্দেশেই এই যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে (যদিও তার আগের রাতেই শেখ মুজিব পাকবাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছিলেন)।

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর ইতিহাস লিখতে হলে এইভাবে ঘটনাগুলো সাজানো যেতে পারে। কিন্তু এর আগেরও অনেক কথা আছে যা বাদ দিয়ে হঠাৎ এইভাবে লিখলে তা ইতিহাস হবে না। এর আগে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন, নির্বাচনে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের একচ্ছত্রভাবে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সব আসন (দুটি বাদে) দখল এবং সারা পাকিস্তানের গণপরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ, ভুট্টোর হুমকি, মুজিব-ইয়াহিয়ার লাগাতার বৈঠক, শেখ মুজিবের অসহযোগ ডাক-এই সবই পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণ এবং তার প্রতিরোধে স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিল। এই ঘটনাগুলিও ইতিহাসের বিচারে সশস্ত্র যুদ্ধের অংশ বটে।

তবে ইতিহাস এখান থেকেও শুরু হয়নি। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানে ভাষা ভিত্তিক জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ না ঘটলে স্বাধীনতা যুদ্ধের এই পটভূমিও তৈরি হতো না। এই জাতীয় চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে এককভাবে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছেন, তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। আর ঘটনা হিসাবে যদি বলতে হয় তবে ভাষা আন্দোলনই জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়। ১৯৪৮ সালে মওলানা

হায়দার আকবর খান রনো : বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি'র পলিটব্যুরোর সদস্য

ভাসানীই প্রথম পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে প্রদেশের জন্য অধিকতর ক্ষমতার দাবি উত্থাপন করে বলেন যে 'বৃটিশের শাসন মানি নাই, এবারও কেন্দ্রের হুকুমদারী মানবো না।' ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যে আওয়ামী লীগ গঠিত হয় (শেখ মুজিব ও খন্দকার মুশতাক তখন যুগ্ম-সম্পাদক এবং সোহরাওয়ার্দী তখনও আওয়ামী লীগে যোগ দেননি। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে জিন্নাহ আওয়ামী লীগ গঠন ক'রে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার বিরোধিতা করেছিলেন), সেই আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছিল। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতেও ভাষা ভিত্তিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন গুরুত্ব পেয়েছিল।

১৯৫২ সালে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে মাত্র ১৩ জন দলীয় সাংসদ নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি মার্কিনী দালালের ভূমিকা পালন করলেন এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি 'সিয়াটো-সেন্টো' সমর্থন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করলেন, বললেন ৯৮% ভাগ স্বায়ত্তশাসন নাকি পাকিস্তানের সংবিধানের মাধ্যমে (১৯৫৬-এর সংবিধান) ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি আওয়ামী লীগের এতোদিনকার ঘোষিত কর্মসূচীর সঙ্গে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, শেখ মুজিবও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। এটা ভাবতে অবাক লাগে যে, সেই শেখ মুজিবই ১০ বছর পরে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন এবং বাঙ্গালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের তিনিই ছিলেন প্রাণ পুরুষ। সোহরাওয়ার্দী বেঁচে থাকলে (১৯৬৩ সালে তিনি মারা যান) শেখ মুজিবের পক্ষে ৬ দফা পেশ করা আদৌ সম্ভব হতো কিনা এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

১৯৫৬-৫৭ সালে পররাষ্ট্রনীতি ও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী বিরোধ বাধে এবং শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন করার কারণে ভাসানীকে আওয়ামী লীগ ত্যাগ ক'রে নতুন পার্টি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করতে হয়। সমসাময়িককালে বিখ্যাত কাগমারী সম্মেলনে ভাসানীই প্রথম বিচ্ছিন্ন হবার হুমকি দেন। ঐতিহাসিকভাবে মওলানা ভাসানীই প্রথম স্বাধীনতার দাবি উচ্চারণ করেন। অবশ্য এর পরে তিনি এই দাবি নিয়ে অগ্রসর হননি, বরং সারা পাকিস্তান ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন। ১৯৭০- এর ঘূর্ণিঝড়ের পর আবার সেই ভাসানীকে দেখি সরাসরি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি সজোরে উত্থাপন করতে।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে ভারতের কাছে পাকিস্তানের লজ্জাজনক পরাজয়ের পর পাক সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। আইয়ুবের সিংহাসন তখন প্রায় টলে পড়ছে। তখন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা লাহোরে আইয়ুব বিরোধী সম্মেলন ডাকেন। সেখানে ভাসানী বাদে সব রাজনৈতিক নেতাদের ডাকা হয়েছিল। শেখ মুজিবও

যোগদান করেন। সম্মেলনের শেষদিন তিনি সম্মেলন ত্যাগ ক'রে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। যে ৬ দফা প্রধানত বাঙ্গালী জাতির আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়েছিল, তা কেন প্রথমে লাহোর থেকে পেশ করা হলো এটা একটা বড় প্রশ্ন। যা হোক অতি দ্রুত ৬ দফা পূর্ব বাংলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করলো এবং শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতারা গ্রেফতার হলেন। ইতোমধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হলো এবং তাতে শেখ মুজিবকে জড়ানো হয়। এখন জানা গেছে- সেনাবাহিনীর কতিপয় অফিসার পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার একটি পরিকল্পনা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তার সাথে শেখ মুজিবের এবং ভারতের কোন সম্পর্ক ছিল না। এদিকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতার প্রচেষ্টা চলছে- এই কথা তুলে আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তান ও সেনাবাহিনীকে তার পেছনে সংহত করতে সক্ষম হলেন এবং ৬ দফাকে আইয়ুব কাজে লাগালেন সেনাবাহিনীর দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে আনতে।

ভাসানী ন্যাপ ৬ দফার পাশাপাশি ১৪ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করে। কিন্তু তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। ১৪ দফার মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ছাড়াও ছিল শ্রমিক-কৃষকদের মূল দাবিসমূহ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মসূচী। সেদিক থেকে ১৪ দফা ৬ দফার চেয়ে উন্নত ছিল। কিন্তু ৬ দফায় স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি যেভাবে সুনির্দিষ্ট ও র‍্যাডিক্যাল আকারে এসেছিল, তা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অনেক বেশী নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে ভাসানী ন্যাপ ও গোপন কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ ৬ দফাকে অযৌক্তিকভাবে 'সি আই এ' ষড়যন্ত্র বলে প্রচার ক'রে নিজেদেরকেই খেলো ক'রে তুললো। যে স্বায়ত্তশাসনের দাবী এক সময় ভাসানী, ন্যাপ, কমিউনিস্ট ইত্যাদি বামপন্থীদের দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল, সেই স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের নেতৃত্ব তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেলো। অন্যদিকে যে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব একসময় স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, সেই শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ হলেন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান নেতা ও দল।

দুই

এ পর্যন্ত সরাসরি স্বাধীনতার কথা কেউ বলেননি (একমাত্র ভাসানীর কাগমারী সম্মেলনে বিচ্ছিন্নতার হুমকি ছাড়া)। কমিউনিস্ট পার্টি তখনও পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতার কথা ভাবনার মধ্যেও আনেনি। ১৯৬৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়- রুশপন্থী বলে পরিচিত মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনপন্থী বলে পরিচিত সুখেন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) বা সংক্ষেপে ইপিসিপি (এমএল)। উভয় পার্টিই বেআইনী আর তাই আত্মগোপনে ছিল এবং উভয়ই ন্যাপের দুই অংশের মধ্যে (ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা ওয়ালী খানের নেতৃত্বাধীন) থেকে কাজ করতো। ১৯৬৭ সালে ইপিসিপি (এমএল) এর

প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় গোপনে এবং সেই কংগ্রেস থেকে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'র রণনীতি গ্রহণ করা হয়। এই প্রথম কোন একটি পার্টির পক্ষ থেকে স্বাধীনতার কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হলো।

১৯৬৮-৭০ এর মধ্যে ইপিসিপি (এমএল) কয়েক টুকরা হয়ে যায়।

১. পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল); নেতৃত্বে সুখেন্দু দস্তিদার, মোহম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক।

২. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি; নেতৃত্বে দেবেন সিকদার, আবুল বাশার, আবদুল মতিন ও আলাউদ্দিন আহমেদ।

৩. কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি; নেতৃত্বে কাজী জাফর, মেনন, রনো।

৪. এ তিনটি প্রধান ধারা ছাড়াও তখন পর্যন্ত ক্ষীণ ধারা হিসাবে একটি বাম কমিউনিস্ট ধারা বর্তমান ছিল। সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন', পরবর্তীতে 'সর্বহারা পার্টি।'

মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ যুদ্ধ শুরু হবার বেশ পরে স্বাধীনতার কর্মসূচী গ্রহণ করে। ইতোপূর্বে তাদের শ্লোগান ছিল, দুই পাকিস্তানের এক আওয়াজ, কায়েম করো গণ রাজ। সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং '৭১ সালে তারা স্বতন্ত্রভাবে বেশ কিছু সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই তারা একটি ছোট সশস্ত্র অ্যাকশন করেছিল, তা হলো পাকিস্তান কাউন্সিলে বোমা নিক্ষেপ। সুখেন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বাধীন পার্টি '৭১ সালে দ্বিধাবিভক্ত হয়। একদিকে সুখেন্দু দস্তিদার ও তোয়াহা, অপর দিকে আবদুল হক। আমার বিবেচনায় তাদের মধ্যকার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম তাত্ত্বিক পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, মৌলিকভাবে উভয়েরই যুদ্ধ প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত ছিল। বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতার যুদ্ধকে তাঁরা প্রধান কর্তব্য এবং পাকবাহিনীকে প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হননি। তাঁরা জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নকে উপেক্ষা ক'রে গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিপ্লব সংগঠিত করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, যা যেকোন সুস্থ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিচারে ভুল হতে বাধ্য। তবু তাঁদের মধ্যে অনেকেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসী যুদ্ধ করেছেন। তোয়াহার নেতৃত্বে নোয়াখালীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, মন্টুমাস্টার ও এবাদ আলীর নেতৃত্বে রাজশাহীতে (তানোর); সালাউদ্দিন, ক্যাপ্টেন জাহেদ, ডঃ তুহীন, প্রাণকুমার ভট্টাচার্য, হাজী বশীরের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের চকরিয়ায় সশস্ত্র সংগ্রাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও খন্দকার আলী আব্বাসের নেতৃত্বে ঢাকার নবাবপুর থানা ও মানিকগঞ্জের কিছু অঞ্চলে গড়ে ওঠে সশস্ত্র বাহিনী। তাদের অনেক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এখনও ঐ সব অঞ্চলে কিংবদন্তীর মতো লোকের মুখে মুখে আছে। এই সকল অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনীগুলি ছিল সুখেন্দু দস্তিদার তোয়াহার পার্টির অন্তর্ভুক্ত।

নোয়াখালীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তোয়াহার নেতৃত্বে যে মুক্ত এলাকা গড়ে ওঠে, তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধানতঃ চর জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে ঘাঁটি এলাকা গড়ে ওঠে এবং সশস্ত্র তৎপরতা লক্ষীপুর, রামগতি ও সুধারাম থানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পার্টি ও তার সশস্ত্র বাহিনী কৃষকদের মধ্যে দুই হাজার একর জমি (এগুলি ছিল খাস জমি বা পাকিস্তানপন্থীদের জমি) বন্টন করে। বন্টনকৃত জমি ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত কৃষকদের দখলে ছিল। তবে রক্ষীবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের পর অধিকাংশ জমি বেদখল হয়ে যায়। তোয়াহা-সুখেন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বাধীন পার্টির এই অংশের এই অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং মোহম্মদ তোয়াহা। অন্যান্য যারা রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম নুরুল হাসান (তিনি ছিলেন বাহিনীর রাজনৈতিক কমিশার, তখন তিনি মৌলানা কলিম উল্লাহ এই ছদ্মনামে উক্ত এলাকায় পরিচিত ছিলেন)। নিজামউদ্দিন (সামরিক কমিশার), মেসবাহ উদ্দিন (জিলা পার্টির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক), ক্যাপ্টেন কামাল মাহমুদ (পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর অফিসার, কিছুদিন তিনি ঐ অঞ্চলে পার্টির বাহিনীর প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন), মেসবাউর রহমান মেসো, বাচ্চু মিয়া, তৈয়ব চৌধুরী, ফয়েজ, বাহার প্রমুখ। তোয়াহার নেতৃত্বাধীন নোয়াখালীর ঐ অঞ্চলের এক ধরণের নিজস্ব প্রশাসন ও প্রকাশ্য গণ আদালতের ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি ও তার নেতা মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন নরসিংদি, শিবপুর, মনোহরদি, রায়পুর অঞ্চলের সঙ্গে এই অঞ্চলটি তুলনীয়। এখানেও মুজিব বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল (যেভাবে শিবপুরে প্রেরণ করা হয়েছিল) কমিউনিস্ট শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য। শিবপুরে মান্নান ভুঁইয়া কৌশলের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে যান এবং অনেক মুজিব বাহিনীর সদস্যের পক্ষে জয় করে আনতে বা নিরপেক্ষ করতে সক্ষম হন। এখানে প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কমিউনিস্টদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন নুরুল হাসান ও নিজামউদ্দিন। কমিউনিষ্টদের নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রশাসন ১৯৭১ এর ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন কমিউনিষ্ট অংশটির যুদ্ধ প্রসঙ্গে ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর। তবু এই অংশটিও পাকিস্তানের বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, বিশেষত বৃহত্তর যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়া জিলায়। তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের সামান্য কিছু বিবরণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

যশোরে প্রাথমিক স্তরে প্রতিরোধ সংগ্রাম করতে গিয়ে শহীদ হন তোজো, আসাদ, নজরুল ও শান্তি। বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে পার্টির বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন বিমল বিশ্বাস ও রাজনৈতিক কমিশার ছিলেন নূর মোহম্মদ। এছাড়া সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন খবিরউদ্দিন, নাজিমউদ্দিন, আবদুল মতিন মুনীর, বিশ্বজিত, নজরুল, আসাদ, নিরাপদ বিশ্বাস, মনু জমাদ্দার, রফিক, সবুর, হাফিজুর রহমান, খোকন,

জাকির হোসেন হবি প্রমুখ। বৃহত্তর যশোরে বিশ্বজিত, নজরুল, আসাদ, নিরাপদ বিশ্বাসসহ দুই হাজার পার্টি যোদ্ধা শহীদ হন। বৃহত্তর যশোরে যে সব মুক্ত এলাকা বা ঘাঁটি এলাকা গড়ে উঠেছিল সেগুলি হচ্ছে শালিখা থানার পুলুম, লোহাগড়া থানার লাহুরিয়া-সরুসোনা অঞ্চল, মোশিয়া পাড়া অঞ্চল, কুমড়ি অঞ্চল, নড়াইল থানার গোবরা, এগারো খান, বরেন্দর অঞ্চল, কালিয়া থানার পেড়লি অঞ্চল, অভয় নগর থানার অভয়নগর কামকুল অঞ্চল, কেশবপুর থানার পাজিয়া অঞ্চল, বাঘারপাড়া থানার খাজুরা অঞ্চল, কালিগঞ্জ থানার দিঘিরপাড় অঞ্চল, মোহম্মদপুর থানার দেউলি অঞ্চল।

খুলনা জিলায় আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ যে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে, তার নেতৃত্বে যারা ছিলেন এবং ১৯৭১ এর পূর্ববর্তী সাংগঠনিক প্রস্তুতির কাজে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে আবদুল মজিদ, রফিক, আবদুর রউফ, খালেদ রশীদ গুরু, কামরুজ্জামান লিচু, হাফিজুর রহমান, আজিজুর রহমান (তিনি যুদ্ধ শুরুর পূর্বে কারারুদ্ধ হন এবং গোটা ১৯৭১ সাল জেলে আটক ছিলেন) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। খুলনায় পার্টির এই অংশের নেতৃত্বে ডুমুরিয়া থানার শোভনা, রূপসা থানার ডোবা ও তালা থানার খলিস খালি অঞ্চল ঘাঁটি অঞ্চল হিসাবে গড়ে ওঠে। ডুমুরিয়া অঞ্চলের নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মজিদ মাষ্টার ও আবদুর রউফ ('৭১ সালে গুলিবিদ্ধ হয়ে পঙ্গু হয়ে যান)। ডুমুরিয়ার সুবনা অঞ্চলের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক খালেদ রশীদ গুরু (তিনি যুদ্ধে শহীদ হন), ডুমুরিয়ার রংপুর রঘুনাথ অঞ্চলের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুর রউফ (যুদ্ধে শহীদ হন), সাতক্ষীরার তালা একটা অঞ্চলের নেতৃত্বে ছিলেন আজমল হক (তিনি পাক বাহিনীর হাতে বন্দী হন, পরে তার কোন খবর পাওয়া যায়নি), দৌলতপুর অঞ্চলের সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন সোহরাব হোসেন এবং রূপসা অঞ্চলের নেতৃত্বে ছিলেন খায়েরুজ্জামান ও জীবন মুখার্জি।

আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন এই অংশের নেতৃত্বে বৃহত্তর কুষ্টিয়াতেও সশস্ত্র বাহিনী গড়ে ওঠে এবং তারাও পাক বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। সেখানকার নেতৃত্বে ছিলেন আনিসুর রহমান মল্লিক, আয়ুব (যুদ্ধে শহীদ হন), হামিদ প্রমুখ।

১৯৭১ সালে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টিও দ্বিধাবিভক্ত হয়। দেবেন সিকদার ও আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন অংশটি জাতীয় যুদ্ধের মূল স্রোতের সঙ্গে থাকে। কিন্তু আবদুল মতিন ও আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন অংশ কিছুটা ভিন্নভাবে হলেও সুখেন্দু দস্তিদার, তোয়াহা, হকের মতোই একই ধরণের বিভ্রান্তির শিকার হন। তবে যুদ্ধের প্রথমদিকে তাঁদের সাহসী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। নওগাঁয় অহিদুর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল এক বিরাট মুক্ত এলাকা। পাবনা শহরকে স্বাধীন করা ও সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করার ক্ষেত্রে টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। আমার মনে আছে, ১৯৭১-এর এপ্রিল মাসে আমি যখন যমুনা নদীতে ছিলাম, তখন লোকজনের কাছে শুনতাম, 'অপর পারে

মেজর টিপু দারুণ যুদ্ধ করছে'। বস্তুত এই মেজর টিপু কোন সামরিক অফিসার ছিলেন না, তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা টিপু বিশ্বাস।

তবুও সুখেন্দু দস্তিদার, তোয়াহা, হক, মতিন-আলাউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন পার্টি ও গ্রুপসমূহের রাজনৈতিক ভূমিকা ও যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের চরম ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাদের এই গৌরবপূর্ণ ভূমিকাকে ম্লান ক'রে দিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'দুই কুকুরের কামড়াকামড়ি'র তত্ত্ব তুলে ধরে যা করেন, তা অনেক ক্ষেত্রে কার্যত জাতীয় যুদ্ধকে অস্বীকার ও প্রকারান্তরে পাকবাহিনীর পক্ষেই চলে যায়। এক পর্যায়ে তাঁরা মুক্তি ফৌজের সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হন, যা চরম হঠকারিতা ও পর্বত প্রমাণ ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা তাঁদের তাত্ত্বিক ভ্রান্তি ও চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। অবশ্য এই ভ্রান্তির উৎস হলো চীনের পার্টির প্রতি অন্ধ মোহগ্রস্থতা, যে চীন তখন পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপগুলির মধ্যে যারা চীনপন্থী বলে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হননি এবং জনগণের জাতীয় আকাঙক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছে, তারা হচ্ছে-

১. 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' : কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মধ্যে এদেরই ছিল সারা দেশ জুড়ে সবচেয়ে বেশি সশস্ত্র যুদ্ধ করার রেকর্ড। তাঁদের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বিশাল বাহিনী গড়ে ওঠে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নরসিংদী জেলায় (প্রধানত শিবপুরে) মান্নান ভুঁইয়ার, বাগেরহাটে রফিকুল ইসলাম খোকনের নেতৃত্বে এবং সাতক্ষীরায় কামেল বখতের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী। এছাড়াও 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র নেতৃত্বে সারা দেশে ১৪টি ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে ওঠে। এসব ক্ষেত্রে যারা রাজনৈতিক-সামরিক নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবদুল্লাহ্ আল নোমান (চট্টগ্রাম); গিয়াসউদ্দিন নান্নু ও দিলীপ সুর (ফেনী); কাজী আফতাবউদ্দিন গেদু মিয়া, হাবিবুর রহমান, নাজাদ, কুদ্দুস মিন্টু (কুমিল্লা); সুনীল লৌহ (সিলেট); বুলবুল খান মাহবুব; ইকবাল হালিম (টাঙ্গাইল); মান্নান ভুঁইয়া (শিবপুর) শাহ আলম, আবদুস সাত্তার (বরিশাল), ফজলু (পিরোজপুর), আফতাব মোল্লা (নওগা), শাহ তৈয়বর রহমান (বৃহত্তর রংপুর), আমিনুল ইসলাম, সামাদ চৌধুরী, মাহমুদুল হাসান মানিক, সাইদ ইসকান্দার (দিনাজপুর)। এছাড়াও কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি ও তারই ছাত্রফ্রন্ট হায়দার আনোয়ার খান জুনোর নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন প্রবাসী সরকারের মুক্তিফৌজের ভেতরে থেকেও সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকার 'ক্র্যাক প্লাটুন' এবং খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন মেলাঘর ক্যাম্পে তাদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমন্বয় কমিটি ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের যাঁরা ক্র্যাক প্লাটুনে বিশেষ সাহসী ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে শহীদুল্লাহ খান বাদল (মেননের ভাই), বদি (পরবর্তীতে

শহীদ হন), আশফাকুস্ সামাদ (যুদ্ধে শহীদ হন), মাসুদ, রুমী (শহীদ জননী জাহানারা ইমামের পুত্র) সাদেক হোসেন খোকা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

২. দেবেন সিকদার-আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন 'বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি' : এই সংগঠনের সশস্ত্র তৎপরতা প্রধানত নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এই সংগঠনের অন্যতম নেতা বি এম কলিমুল্লাহ'র নেতৃত্বে চাঁদপুরে এক বিরাট বাহিনী ও ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে ওঠে।

৩. নাসিম আলীর নেতৃত্বাধীন 'হাতিয়ার গ্রুপ' নামে পরিচিত মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা একটি ছোট গ্রুপ : মুন্সীগঞ্জ ও ঢাকায় কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকায় তাঁদের তৎপরতা ছিল। ঢাকা-বরিশালগামী লঞ্চের ওপর তাঁরা আক্রমণ চালান। গোপালগঞ্জের কালকিনি থানায় তাঁদের সশস্ত্র অ্যাকশন উল্লেখযোগ্য। এই সকল সামরিক অ্যাকশনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবুল খায়ের, রুহুল আমীন, নুরুল আনোয়ার, গিয়াস উদ্দিন প্রমুখ। যুদ্ধের প্রায় শেষ দিকে নুরুল আনোয়ার ও গিয়াস উদ্দিন অস্ত্রসহ ধরা পড়েন।

'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' প্রথম থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধের রণনীতি প্রণয়ন করে এবং পরিকল্পিতভাবে সশস্ত্র যুদ্ধের পথে অগ্রসর হয়। ষাটের দশকে এই সংগঠনের নেতৃত্বই (কাজী জাফর, মেনন, রনো) চীনা পার্টির মতাদর্শকে বেশি ক'রে প্রচারে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু ১৯৭১ সালে তাঁরাই চীনের ভ্রান্ত লাইনের (বাংলাদেশ যুদ্ধ প্রসঙ্গে) প্রকাশ্য সমালোচনা করে। আমি নিজে এই বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে ছিলাম বলে স্বাভাবিকভাবে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে বেশি জানি। তাই এই নিবন্ধে প্রধানত তাঁদের রণনীতি, যুদ্ধ ও কর্মকান্ড নিয়েই আলোচনা করবো, সঙ্গে সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তুলে ধরবো।

তিন

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময়ই কয়েকজন কমরেড পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে) থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদেব পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি' গঠন করেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, জামাল হায়দার, মাহফুজ ভুঁইয়া, হায়দার আনোয়ার খান জুনো (আমার ছোট ভাই) এবং আমি। আমরা প্রথম থেকেই কৃষক-শ্রমিকের ওপর ভিত্তি ক'রে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করার রণনীতি গ্রহণ করি। এই ব্যাপারে আমরা কিছুটা পরিকল্পিত আকারে অগ্রসর হই। টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে আমাদের খুবই শক্তিশালী অবস্থান ছিল এবং কয়েকটি জেলার কয়েকটি অঞ্চলকে পরিকল্পিতভাবে বেছে নিয়ে কৃষকের ঘাঁটি এলাকা গঠনের কাজ হাতে নেই। পাশাপাশি বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে বিপ্লবী ছাত্র কর্মী রিক্রুট করার কাজ পরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করি। আমরা সংগঠন হিসাবে ছোট হলেও, জাতীয়

ভিত্তিক বিপ্লবী সংগঠন দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলাম, যার ছিল তুলনামূলক সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত ক্যাডার বাহিনী, যারা মার্কসবাদের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল। আমরা প্রথম থেকেই গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলকে বেছে নেই।

'৭০-এর নির্বাচন পরবর্তীকালে আমরা সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জনগণ মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছে, ফলে আমাদের কাজকে ত্বরান্বিত করারও উদ্যোগ গ্রহণ করি। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসি। আমরা বিশ্লেষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে আসি যে, মুজিবের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হতে পারে না। তবে এই দ্বন্দ্ব সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নেবে কি না, নিলে কি তার ধরণ হবে-এ সকল বিষয়ে খুব নিশ্চিত ও পরিস্কার ছিলাম না। তবে যাহোক, আমাদেরকেই সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ শুরু কবতে হবে- এই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি এবং সেইভাবে গোটা সংগঠনকে প্রস্তুত করি। পাশাপাশি আমরা অস্ত্র সংগ্রহ ও অস্ত্র বানানোর উদ্যোগ নেই।

১৯৭১-এর মার্চ মাসে আমরা বেশ কিছু বন্দুকের দোকান লুট করি। কিছু কিছু বন্দুক নির্দিষ্ট ঘাঁটি এলাকায় পাঠিয়ে দি (সংগৃহীত বন্দুকের সংখ্যা অবশ্য সামগ্রিক যুদ্ধের প্রয়োজনে নেহায়েতই সামান্য ছিল)। আমরা বোমা বানানোর কাজও হাতে নি। আমার ছোট ভাই হায়দার আনোয়ার খান জুনো (সে পদার্থ বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র ছিল) অনেক বই ঘেঁটে ও অনেক পরীক্ষা চালিযে বোমা বানানোর ফর্মূলা আবিস্কার করলো। টঙ্গীর মিলগুলি তখন আমাদের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। মিলের মধ্যেই মিলের মালপত্র ও মেশিন ব্যবহার করে ব্যাপক হারে বোমা বানানোর কাজ চললো। বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাই করা ক্যাডারদের ঢাকায় ডেকে এনে (তাদের মধ্যে অন্যতম খালেদা জিয়ার ভাই সাইদ ইসকান্দার। তিনি তখন দিনাজপুর জেলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র) বোমা বানানোর ট্রেনিং দেয়া হতো।

১৯৭১-এর মার্চ মাসে আমরা কয়েকটি প্রচারপত্র প্রকাশ করি এবং তা বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই সব প্রচারপত্রে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দেয়া হয় এবং কিভাবে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে হবে তার কিছু নির্দেশনাও ছিল।

১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আমরা সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের জন্য একরকম প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের ক্যাডাররা মিলিটারীর গাড়ীর ওপর কয়েক দফা বোমা নিক্ষেপও করেছিল। তাতে আওয়াজ হয়েছিল বিকট, কিন্তু ক্ষতি হয়নি বিশেষ কিছু। শহরের এই সকল অ্যাকশনে হায়দার আনোয়ার খান জুনো, সাদেক হোসেন খোকা, সাবু, আরামবাগের খোকন প্রমুখ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা

সমন্বয় কমিটি'র নেতৃত্বে সংগঠিত বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। মার্চ মাসে আমাদের এসব অ্যাকশন স্থানীয় আওয়ামী লীগ দ্বারা বাধা প্রাপ্তও হয়েছিল কখনও কখনও। তাদের কেউ কেউ বলতে শুরু করেন যে, শান্তিপূর্ণ আলোচনা ও অসহযোগকে ব্যর্থ করার জন্য আমরা চরমপন্থী কমিউনিস্টরা এসব কাজ করছি। অবশ্য সাধারণ জনগণ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, তারাও মানসিকভাবে বড় রকম লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সেই জনগণ অবশ্য জানতো না লড়াইটা কি রকম হবে বা কতো ভয়াবহ হতে পারে।

মোট কথা বলা যেতে পারে, ২৫ মার্চের আগেই আমরা প্রস্তুত ছিলাম সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য। গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গড়ো, শত্রুর অঞ্চলে বিভিন্ন রকম অ্যাকশন করো এবং সবশেষে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করো-এই ছিল আমাদের স্ট্রাটেজী। আমরা আওয়ামী লীগ বা অন্য কোন বাম দলের সঙ্গে যোগাযোগও করিনি বা করার প্রয়োজনও অনুভব করিনি। এখন মনে হচ্ছে, এটা আমাদের এক ধরনের অপরিপক্কতারই পরিচায়ক। প্রকৃত যুদ্ধ সম্বন্ধেও আমাদের কোন বাস্তব ধারণা ছিল না। আমাদের প্রস্তুতি যে কতো অপ্রতুল ছিল, তা প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হবার পরই বুঝতে পারলাম। ক'টা বন্দুক আর কিছু হাতে বানানো বোমা দিয়ে যে এ যুদ্ধ হয় না, তা আমরা ভাবতে পারিনি। তবে আমরা যে যুদ্ধের জন্য মানসিক ও আদর্শিক ভাবে ক্যাডার বাহিনীকে প্রস্তুত করতে পেরেছিলাম এবং মোটামুটি সঠিক রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণ করতে পেরেছিলাম, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এই কারণে বামপন্থীদের মধ্যে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সারা দেশে তাদের নেতৃত্বে ১৪টি মুক্তাঞ্চল ও বিশাল বাহিনী গড়ে উঠেছিল।

চার

২৫ মার্চ ১৯৭১ সাল। সেদিন পাকিস্তান আমলের শেষ জনসভা অনুষ্ঠিত হয় পল্টন ময়দানে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে। বক্তা ছিলেন কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আনোয়ার খান জুনো, আতিকুর রহমান সালু ও আমি। ২ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। টঙ্গী থেকে শ্রমিকরা এসেছিলেন দলে দলে মিলের-ট্রাক-বাস দখল ক'রে। সভা থেকে আমরা ঘোষণা করলাম, মুজিব-ইয়াহিয়ার বৈঠক ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমরা জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য আহবান জানাই এবং এখান থেকেই গ্রামে সশস্ত্র মুক্ত ঘাঁটি গড়ার পরিকল্পনা প্রকাশ্যে তুলে ধরি। মনে আছে সভা শেষে কাজী জাফর, মেনন ও আমি হাঁটতে হাঁটতে মধুর ক্যান্টিনে যাই। মধুদা আদর ক'রে আমাদের ডিম ভাজা খাইয়েছিলেন। তখনও ধারণা করতে পারিনি, আর কয়েক ঘন্টা পরেই মধুদা পাকবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হবেন।

সেই রাতই হলো সেই ভয়াল কালোরাত। পাকবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র জনগণের ওপর। রাত ৮টার দিকে বাসায় ফিরে একটার পর একটা ফোন পাচ্ছি। সবার

জিজ্ঞাসা, কি হতে যাচ্ছে? কেউ কেউ বলছেন, 'আমার কাছে একটা বন্দুক আছে, আপনাদের জন্য কোথায় জমা দিতে হবে' ইত্যাদি। কিছু পরে খবর পেলাম ফার্মগেটের দিকে আর্মি নেমেছে এবং নির্বিচারে মানুষ খুন করছে। বাসায় থাকা ঠিক হবে না, যোগাযোগ করতে হবে পার্টির অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে। আমার ছোট ভাই ও আমি গাড়ী ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। তখন মেনন ছিলেন লালবাগে, কাজী জাফর মগবাজারে। প্রথমে আমাদের ধানমন্ডিস্থ বাসা থেকে বের হয়ে সবচেয়ে কাছে মাহফুজ ভূঁইয়ার বাসায় গেলাম; বললাম, চলুন আজ সবাই একত্রে থাকা দরকার, পরবর্তী ধাপ ঠিক করা দরকার। তিনি বললেন, এ সময় বেশী দূর যাওয়া সম্ভব হবে না, রাস্তায় মিলিটারী নেমে গেছে। ফলে সত্যিই বেশী দূর যেতে পারলাম না, ধানমন্ডিতে আমরা দুই ভাই খালার বাসায় আশ্রয় নিলাম।

২৭ মার্চ সকালে কারফিউ উঠে গেল। বাসায় ফিরে এলাম। আমাদের খবর নিতে এসেছিল শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ছেলে রুমী। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র এবং বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। তার গাড়ী ক'রে ঢাকা শহরের একাংশ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দেখলাম অগ্নিদগ্ধ বস্তি, ফুটপাতের উপর পড়ে থাকা লাশের স্তুপ। আমাদের বাসায় একে একে অনেকেই আসতে শুরু করলেন। মেনন এসেছিলেন। আমার বন্ধু খালেদ রব (সরকারী আমলা) এসেছিলেন; কি করা যায় পরামর্শ করতে। এখনই যুদ্ধ শুরু করতে হবে, এই ছিল তার কথা। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও চিত্র-পরিচালক জহির রায়হান (তিনি তখন 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি'র একটি সংগঠনে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন) এলেন তাঁর গাড়ীটি নিয়ে, সঙ্গে ৭০০ টাকা ও এক কার্টুন সিগারেট। বললেন, গাড়ীটি আপনারা নিয়ে যান, আমি আমার পরিবার রিকশা ক'রে পার করাবো। তাঁর গাড়ীতে করেই কাজী জাফর, মেনন, জুনো এবং আমি শিবপুরের পথে রওনা হই। যুদ্ধের ৯ মাস জহির রায়হানের গাড়ীটি শিবপুরেই ছিল এবং যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল শিবপুরে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে যে কৃষকের ঘাঁটি অঞ্চল ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে, সেখানেই আমাদের হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরিত করতে হবে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র মূল নেতৃত্বের ২ জন ঢাকার বাইরে ছিলেন- মান্নান ভূঁইয়া ও জামাল হায়দার। মান্নান ছিলেন শিবপুরে। তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করার জন্যই শিবপুরে ছিলেন। আমরা ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই নেতৃত্বের বিভিন্নজনকে বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়েছিলাম সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্য। ২৫ মার্চের আগে আমরা সবাই যে যার নির্দিষ্ট জেলা থেকে ফিরে আসতে পারলেও জামাল হায়দার ফিরতে পারেন নি। তিনি তখন দিনাজপুর ছিলেন।

পাঁচ

জামাল হায়দার দিনাজপুর গিয়ে আটকা পড়ে যান। ইতোমধ্যে ২৫ মার্চের পর দিনাজপুর

স্বাধীন হয়ে গেছে। সেখানে জামাল হায়দারের তত্ত্বাবধানে এবং আমিনুল ইসলাম, সামাদ চৌধুরী, মাহমুদুল হাসান মানিক, সাঈদ ইসকান্দার প্রমুখের নেতৃত্বে সশস্ত্র ইউনিট গড়ে ওঠে। এদিকে ইপিআর-এর বাঙ্গালী সদস্যরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে জড়ো হয়েছিল দিনাজপুরে। দিনাজপুরের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৬ জনের একটি কমিটি-হাজী দানেশ (ভাসানী ন্যাপ), অধ্যাপক ইউসুফ আলী (আওয়ামী লীগ), গুরুদাস তালুকদার (কমিউনিস্ট পার্টি), এ এ বারী এ.টি. (ভাসানী ন্যাপ), মোস্তফা জামাল হায়দার (কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি) ও এ জেড এম ইউসুফ (মোজাফফর ন্যাপ), আহমদ (মুসলীম লীগ, পরবর্তীতে তিনি ইউপিপি'তে যোগদান করেন)। স্বাধীন থাকা অবস্থায় দিনাজপুরে পেট্রোলের ঘাটতি দেখা দেয়। পেট্রোল সংগ্রহের জন্য জামাল হায়দার ও বারী ভাই পশ্চিম দিনাজপুরে (ভারতে) যান, কিন্তু ফিরে আসতে পারেননি। কারণ ইতোমধ্যে দিনাজপুর পাকবাহিনীর দখলে চলে গেছে। ফলে জামাল হায়দার ভারতের দীর্ঘপথ ঘুরে শিবপুরের হেড কোয়ার্টারে ফিরে যান জুন মাসের দিকে। পাকবাহিনী অবশ্য বিনা প্রতিরোধে দিনাজপুর দখল করতে পারেনি। দশমাইলে (একটি জায়গার নাম) পাকবাহিনীর সঙ্গে বাঙ্গালী সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও আমাদের পার্টির সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। অস্ত্র হাতে যাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাহমুদুল হাসান মানিকের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছয়

২৭ মার্চ আমরা শিবপুরের পথে রওনা দিলাম। ঢাকা শহরে পাক সেনাদের টহল চলছে। সব গাড়ী ও বাড়ীতে নতুন ক'রে পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে। লোকজন ঢাকা ত্যাগের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পাক সেনারা তাতে বাধা দিচ্ছে না। ডেমরা ফেরীঘাটে পাক সৈন্যরা রয়েছে। তাদের সামনে দিয়েই ফেরী পার হলাম। কিন্তু ঠিক ওপারেই সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। সব বাস ও গাড়ীতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে। আমরাও আমাদের গাড়ীতে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ালাম। শিবপুর যাওয়ার পথে এক জায়গায় গাড়ীটা কোন কারণে থামালে কেউ কেউ আমাদের চিনে ফেললো। ফলে একটা সভা করতে বাধ্য হলাম। আমরা বক্তৃতা করলাম। প্রতিরোধের আহবান রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় পাকবাহিনীর বর্বরতার ঘটনা এবং শেখ মুজিবের গ্রেফতার হবার কথাও বললাম। দেখলাম কেউ কেউ মুজিবের গ্রেফতারের খবর বিশ্বাস করছে না। একজন মৃদুস্বরে মন্তব্যও করলো-'শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়নি, এরা ভাসানীর লোক তো, মিথ্যা কথা বলছে।' কথাটা আমার কানে আসলেও তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ না ক'রে উপেক্ষা করলাম।

বিকেলের দিকে শিবপুর পৌঁছলাম। দেখলাম মান্নান ভূঁইয়া থানার থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলগুলো দখল ক'রে নিয়েছে। তরুণ কর্মীদের নিয়ে অস্ত্রের ট্রেনিং চলছে। শিবপুরে আমরা এক বিশাল জনসভা করলাম। রাতে আমাদের দলের বৈঠক হলো। বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয়

প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো। ঠিক হলো এখন থেকে শিবপুর হবে হেড কোয়ার্টার (যা যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল) এবং তার দায়িত্বে থাকবেন মান্নান ভূঁইয়া। আরও সিদ্ধান্ত হলো আমরা অতি দ্রুত ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগ করবো। সিদ্ধান্ত অনুসারে মান্নান ভূঁইয়া শিবপুরে থেকে গেলেন। কাজী জাফর গেলেন কুমিল্লার দিকে। জুনো ও শেখ কাদের গেলেন সিলেট। মেনন ও আমি রওনা দিলাম টাঙ্গাইলের দিকে ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। জুনো ও শেখ কাদের সিলেটের কৃষক ঘাঁটির এলাকায় গিয়ে আর ফিরতে পারেননি। তারা বাধ্য হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন, সেখানে তাদের সঙ্গে ভারতীয় কিছু নিম্নপদস্থ সেনা অফিসার, বাংলাদেশ আর্মির ক্যাপ্টেন মাহবুব ও সিপিআই (এম)-এর কমরেড নৃপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এই প্রথম আমাদের সঙ্গে সিপিআই (এম)-এর যোগাযোগ, পরবর্তীতে তা আরও ঘনিষ্ট হয়। তারা সিলেটে আমাদের অঞ্চল ও তার সঙ্গে বাড়তি কিছু অভিজ্ঞতা [ভারত, ভারতের অবস্থানরত বাংলাদেশী ফৌজ ও সিপিআই (এম)-এর অভিজ্ঞতা] নিয়ে শিবপুর ফিরে আসেন।

আমি আর মেনন রওনা দিলাম টাঙ্গাইলের পথে। ঢাকা হয়ে সোজা পথে নয়, কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ হয়ে ঘোরা পথে। রওনা দিয়েছি জহির রায়হানের গাড়ী ক'রে। পথে ভৈরবের কাছে এক নদী। নদীতে পানি কম, হেঁটে পার হওয়া যায়, কিন্তু গাড়ী চালিয়ে যাওয়া যায় না। আমরা মুক্তিযোদ্ধা এবং ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি শুনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলো, সবাই মিলে গাড়ীটাকে শূন্যে তুলে নদী পার ক'রে দিলো। জনগণের সহযোগিতার সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সম্মিলিত জনগণের কি অসাধারণ ক্ষমতা, কী প্রবল উৎসাহ! দুপুরের দিকে কিশোরগঞ্জ পৌঁছলাম। গিয়ে উঠলাম জলিল সাহেবের বাসায় (তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন)। সেখানেই দেখা হলো কমরেড নগেন সরকারের সাথে। কিশোরগঞ্জে মেজর সফিউল্লাহ্'র নেতৃত্বাধীন বাঙ্গালী সেনারা অবস্থান করছিল। তবে আমাদের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ হয়নি।

এক রাত কিশোরগঞ্জে থেকে আমরা ময়মনসিংহে গেলাম। কিশোরগঞ্জে ও ময়মনসিংহে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করি এবং গেরিলা ইউনিট গঠন ক'রে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলি। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জে আমাদের সশস্ত্র ইউনিট গড়ে উঠেছিল এবং কয়েকটি স্থানে তারা যুদ্ধও করেছিলেন বীরত্বের সঙ্গে। এই দুই জেলার অনেক ক্যাডার ও শহীদদের চেহারা এখন মনে আসছে। কারো কারো চেহারা ২৫ বছরের ব্যবধানে ঝাঁপসা হয়ে এসেছে। বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে এক সম্ভাবনাময় বিপ্লবী যুবক জওহরলালের কথা-বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি রণাঙ্গনে শাহাদত বরণ করেছিলেন।

ময়মনসিংহে কয়েকজন প্রশাসনিক আমলার সঙ্গেও দেখা হয়। তারা বললেন, 'ময়মনসিংহকে আমরা কমপক্ষে ৬ মাস মুক্ত রাখতে পারবো। প্রচন্ড উৎসাহ তাদের

মধ্যে লক্ষ্য করলাম কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে কি পরিমাণ অজ্ঞতা। রাতে আমরা মুক্তাগাছায় থাকলাম ন্যাপ-র ... তালেব আলীর বাড়ীতে। তিনিই মটর সাইকেলে ক'রে মেনন ও আমাকে টাঙ্গাইল পৌঁছে দিলেন। টাঙ্গাইলের প্রবেশমুখে দেখলাম বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের একদল ছেলে রাইফেল ও স্টেনগান হাতে রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। আমাদের দেখতে পেয়ে খুশীতে ভরে উঠলো। তাদের কাছ থেকে টাঙ্গাইলের খবরাখবর নিয়ে গেলাম বুলবুল খান মাহবুবের বাসায়। তখন টাঙ্গাইল মুক্ত। টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ সহ সর্বদলীয় হাইকমান্ড গঠিত হয়েছে। পাশাপাশি 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র নেতৃত্বে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, কৃষক সমিতির সদস্যদের নিয়ে নিজস্ব হাইকমান্ডও গঠিত হয়েছে। দুই হাইকমান্ডের মধ্যে কোন প্রকাশ্য বিরোধ ছিল না। আমাদের হাইকমান্ডের প্রধান ছিলেন বুলবুল মাহবুব, উপ-প্রধান এস এম রেজা। পরে এপ্রিল মাসে এস এম রেজা ও তাঁর ভাই আহমেদ রেজা পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। আমরা যেদিন টাঙ্গাইল পৌঁছাই সেদিনটি ছিল ৩ এপ্রিল। দূর থেকে কামানের আওয়াজ আসছে। মির্জাপুরে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ হচ্ছে। এই যুদ্ধে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের বেশ কয়েকজন সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। আমরা খবর পেলাম মওলানা ভাসানী বিন্নাফুরে আছেন। টাঙ্গাইল ও সন্তোষ থেকে বিন্না ফুরের দূরত্ব মাইল দেড়েক। দুপুরের দিকে বিন্নাফুরে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি মওলানা সাহেব খুব উত্তেজিত। একজন বিহারী কুলি প্রাণ ভয়ে ভাসানীর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা তাকে নিয়ে যেতে চায়। ভাসানী উত্তেজিত কণ্ঠে বলছেন, 'হোক সে বিহারী, সে কুলি, আমি বেঁচে থাকতে কোন কুলির গায়ে হাত দিতে দেবো না।' ঐ পরিস্থিতিতেও ভাসানীর মধ্যে যে আন্তর্জাতিকতাবোধ ও মেহনতি মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ লক্ষ্য করেছিলাম, সেটাই হচ্ছে ভাসানী চরিত্রের মহত্তম দিক। আমরা ভাসানীকে ভারতে চলে যেতে বললাম। তিনি রাজী হলেন না। বললেন, 'আমাকে এখানে থাকতে হবে, চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।' মওলানা সাহেব বললেন, 'জাফরকে ডাকো, তোয়াহা- হক-মতিনকে খবর দাও, আমাদের কিছু একটা করতে হবে।' একটা তারিখও ঠিক হলো। আমার কাছে এটি একটি অবাস্তব প্রস্তাব বলে মনে হয়েছিল, কারণ, ঐ অবস্থায় এতো অল্প সময়ের মধ্যে সবাইকে জড়ো করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, ঐ সভার স্থান ঠিক হয়েছিল বিন্নাফুর। বিন্নাফুরে তিনি কিভাবে নিরাপদে থাকবেন তাও ভেবে পেলাম না।

ইতোমধ্যে কামানের আওয়াজ আরও জোরে শোনা গেল। শত শত মানুষ ছুটছে। টাঙ্গাইলের পতন ঘটেছে। কয়েকজন মর্টার শেলের আঘাতে নিহত ও আহত হয়েছে বলেও জানলাম। আমরা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম আমাদের যুদ্ধরত কর্মীদের খবরাখবর নেবার জন্য। কিছুক্ষণ পর দেখলাম একটি সামরিক হেলিকপ্টার উড়ছে সন্তোষের আকাশে। তারপর বিন্নাফুর থেকেই দেখলাম সন্তোষে মওলানার বাড়ীতে আগুন ধরানো হয়েছে। মওলানা

ভাসানী ও মাইলখানেক দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাঁর সন্তোষের বাড়ী দাউদাউ জ্বলছে, দেখা যাচ্ছে আগুনের লাল আলো আর কালো ধোঁয়া।

আমাদের সঙ্গে কিছু রাইফেল ছিল। এগুলো নিয়েই মওলানা ভাসানীর বাড়ীতে থাকলাম। তিনি রাইফেলগুলোর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু কোন জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। আমরা আবার তাঁকে ভারতে যাবার জন্য অনুরোধ করলাম। একবার তিনি বললেন, 'ইন্দিরার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন। আমি যখন আসামে জেলে ছিলাম নেহেরু আমার স্বাস্থ্যের খবর নিতেন। আমি চাইলে তো দশ বারোটা কামান আনতেই পারি। কিন্তু তোমরা তো ওদের সঙ্গে রাজনীতি করোনি। আমার যেতে মন চায় না।'

৪ এপ্রিল সকাল বেলায় মওলানা সাহেবের বাসায় মুড়ি আর চা খেলাম। মওলানা সাহেব নিজে হাতে চায়ের কাপ নিয়ে আমাদেরকে দিলেন। একটু পরেই খবর আসলো পাক আর্মি বিন্নাফুরের দিকে আসছে। লোকজনের ছুটাছুটি আরম্ভ হয়ে গেল। এবার মওলানা সাহেব বাড়ী ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিলেন। আমরা সঙ্গে যেতে চাইলাম। তিনি কাউকে সঙ্গে নিতে রাজী হলেন না, এমনকি পরিবারের সদস্যদেরও না। আমরাও সময় থাকতেই দূরে সরে পড়লাম। দূর থেকে দেখা গেল খালি মাঠ অতিক্রম ক'রে একাকী মওলানা ভাসানী যাচ্ছেন, গেঞ্জি গায়ে,মাথায় টুপি নেই। মাঠ অতিক্রম করার সময় কয়েকবার হোঁচট খেয়েছেন। দূর থেকে একজন সাধারণ বৃদ্ধ কৃষক ছাড়া অন্যকিছু বোঝার উপায় নেই। পরে জানতে পেরেছি তিনি নিকটবর্তী কোন গ্রামে তাঁর কোন ভক্তের বাড়ীতে সে রাত ছিলেন, পরে নৌকা ক'রে যমুনা, পার হয়ে সিরাজগঞ্জে পৌঁছান গোপনে। সেখান থেকে তাঁর সঙ্গী হন ন্যাপ নেতা সাইফুল ইসলাম। তারপর নৌকা ক'রেই আসামে উপস্থিত হন। আমরা দূর থেকে দেখলাম বিন্নাফুরে আগুন জ্বলছে। আমরা পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মেনন আর আমার সঙ্গে ছিলেন বুলবুল খান মাহবুব ও আতিকুর রহমান সালু। আমাদের সঙ্গে লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী রাইফেল ছিল। বুলবুলের সহাযতায় আমরা সেই অতিরিক্ত রাইফেলগুলো কইস্যা দেওয়ানের বাসায় রাখলাম। চরের মধ্যে পাটকাঠির দেয়াল দিয়ে কইস্যা দেওয়ানের দরিদ্র কুটির। এক সময় তিনি এই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলেন। পরবর্তীতে ভাসানীর মুরীদ এবং কৃষক সমিতির সদস্য হন। তখন থেকে তিনি ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীতে বুলবুলের নেতৃত্বে গঠিত সশস্ত্র গেরিলা দলে কইস্যা দেওয়ান যোগ দেন এবং সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালেই তিনি শহীদ হন।

কইস্যা দেওয়ানের বাসায় কয়েকটা মিষ্টি আলু সিদ্ধ খেয়ে দুপুরের খাওয়া সারলাম। তারপর আমরা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন কৃষক সমিতির কর্মী মালেক ভাইয়ের বাসায় ক'দিন ছিলাম। পরে আমরা আমাদের পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবদুস সাত্তারের বাসায় উঠি। একেবারে ধু ধু বালুচরের মাঝখানে তাঁর বাড়ী। নদীর পানি ছাড়া খাবার পানি বলে আর

কিছু ছিল না। ইতোমধ্যে মেনন রফিকুল ইসলাম তারাকে সঙ্গে নিয়ে শিবপুরের হেডকোয়ার্টারে ফিরে যান। আমি থেকে গেলাম মওলানা ভাসানীকে খোঁজ করার জন্য। দু'শো টাকা দিয়ে একটা নৌকা কিনে সেই নৌকায় দিন আর রাত কাটাই আর ঘুরে ঘুরে মওলানা সাহেবের খোঁজ করি। সঙ্গে ছিলেন বুলবুল খান মাহবুব, আতিকুর রহমান সালু আর ভাসানীর শিষ্য কৃষক সমিতির রুইন্যা (তিনিও একসময়ে ডাকাত ছিলেন, পরে ভাসানীর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন)। যমুনা নদী ধরে এদিক ওদিক অনেক খোঁজ করলাম মওলানা ভাসানীর। কোথাও শুনলাম 'পীর সাহেব কাল এই পথে নৌকা নিয়ে গেছেন' অথবা 'হুজুর এই সকালেও পাশের গ্রামে ছিলেন' ইত্যাদি। কয়েকদিন পর 'আকাশবাণীর খবরে জানলাম ভাসানী ইতোমধ্যে ভারতে পৌঁছে গেছেন। অগত্যা শিবপুরে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। সঙ্গে গেল আতিকুর রহমান সালু। বুলবুল টাঙ্গাইল রয়ে গেল। রেখে এলাম আমাদের অল্প কিছু অস্ত্র। গেরিলা সংগঠন গড়ে তোলার বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হলো টাঙ্গাইলের কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে। প্রধান দায়িত্ব পড়লো বুলবুল খান মাহবুবের ওপর।

পরবর্তীতে বুলবুল খান মাহবুব,হাবিবুর রহমান হাবিব,আবদুল হালিম ইকবাল (তিনি কমান্ডার ছিলেন), আশরাফ গিরানী, গোলাম সরওয়ার ছানা, হাজেরা সুলতানা, আতিকুর রহমান সালু প্রমুখের নেতৃত্বে টাঙ্গাইলের চার অঞ্চলে বিশাল সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এক পর্যায়ে ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট অধিকতর শক্তিশালী 'কাদেরিয়া বাহিনী' আমাদের বাহিনীকে পরাজিত করে নিরস্ত্র করে। আমাদের এক অংশ কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দেয়। কাদের সিদ্দিকী অবশ্য আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ নয় এমন দেশপ্রেমিকদের বা কমিউনিস্ট-বামপন্থীদের তাঁর বাহিনীতে গ্রহণ করতে অথবা উচ্চতর দায়িত্ব দিতে কখনও আপত্তি করেননি। তিনি বরাবরই মওলানা ভাসানীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। কাদেরিয়া বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র হবার পরও আবদুল হালিম ইকবালের (যুদ্ধে তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল) নেতৃত্বে পুনরায় সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয়। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন টাঙ্গাইল জেলা সভানেত্রী হাজেরা সুলতানা এই বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি অনেক ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং শিবপুরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

এপ্রিলের শেষ দিকে আমি ঢাকা হয়ে শিবপুরে আসি। বেশীরভাগ পথ পায়ে হেঁটে, কোথাও রিকশা, কোথাও বাস এইভাবে বিকালের দিকে মিরপুর ব্রিজের কাছে যখন পৌঁছলাম কয়েকটি পাকিস্তানি সৈন্যকে কাছে থেকে দেখলাম। ব্রীজের তলায় অনেকগুলি লাশ ভাসছে, পঁচে ফুলে উঠেছে, কাক ঠোকরাচ্ছে। পথে আমি সর্বহারা পার্টির চঞ্চলের (ময়মনসিংহের) দেখা পেয়েছিলাম। মিরপুর থেকে একটি আধা ফাঁকা বাসে চড়ে নিউ মার্কেটে নামলাম। বাসটি যখন শুক্রাবাদ দিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডকে ডানে রেখে যাচ্ছিলো,তখন আমি একবার ডানদিকে তাকালাম,কারণ আমার বাসাও ঐ রাস্তায়। বাসের অন্যান্য যাত্রীরাও খুব

সাবধানে ডান দিকে চোখ ফেরালো। কারণ ঐ রাস্তায় শেখ মুজিবের বাড়ীও আছে। কারো কারো গলায় খুব মৃদু স্বরে 'আঃ' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছিল। নিউমার্কেটে নেমে দেখি একেবারে মানবশূন্য, রিকশা- স্কুটারও নেই। যাহোক, কোন মতে একটি স্কুটার পেলাম এবং ঢাকার এক চেনা বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। দু'দিন পর শিবপুরে পৌঁছলাম, রিকশায়, বাসে ও পায়ে হেঁটে।

এবার দেখি শিবপুর এক নতুন চেহারা নিয়েছে। মান্নান ভূঁইযার নেতৃত্বে বাহিনী গড়ে উঠেছে। শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী ভালভাবে বলতে গেলে এই নিবন্ধ বিশাল আকার ধারণ করবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যে ক'টি জায়গা সবচেয়ে ওপরে স্থান পেতে পারে শিবপুর তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বুর্জোয়া প্রচার-পত্রিকায় অথবা ইতিহাস লেখায় শিবপুরের নাম সবচেয়ে কম শোনা যায়। তার কারণ এই যে, শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধটি হয়েছিল পরিপূর্ণ রূপে বাম-কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে। মান্নান ভূঁইয়াব রাজনৈতিক-সামরিক-প্রশাসনিক নেতৃত্বও ইতিহাসে গৌরবের সঙ্গে স্থান পাবার মতো। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় এই নামটিও সচরাচর দেখি না। বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যম এবং বুর্জোয়া পন্ডিত-গবেষকরা যে তাদের স্বার্থেই কাউকে ফুঁলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় ক'রে তুলতে এবং কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করতে পারে তা তো সহজবোধ্য। যাহোক, শিবপুরের মুক্ত এলাকার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, ।শবপুরের অস্ত্রভান্ডার ভারত থেকে আসেনি। অস্ত্র প্রধানত সংগৃহীত হয়েছিল দুইভাবে পশ্চাদপসরণকারী বাঙ্গালী সেনা, ইপিআর সদস্যদের ফেলে দেয়া অস্ত্র সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীকালে পাকবাহিনীর কাছ থেকে যুদ্ধ ক'রে কেড়ে নিয়ে। দ্বিতীয়ত অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা সত্য যে, শিবপুরে একজনও রাজাকার তৈরী হয়নি। কয়েকজন ডাকাত ছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা কাউকে হত্যা পর্যন্ত করেনি। তৃতীয়ত শিবপুরে এক ধরনের জনপ্রিয় গণপ্রশাসন তৈরি হয়েছিল, যা কেবলমাত্র বাম দেশপ্রেমিক বা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বেই সম্ভব।

শিবপুরের মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর সঙ্গে অসংখ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রথম যুদ্ধ হয় মে মাসে পটিয়া ব্রীজের নিকটে। সেই যুদ্ধে প্রথম শহীদ হন ইদ্রিস নামে এক সাহসী কিশোর। প্রায়ই পাকবাহিনী এসেছে শিবপুরে তাদের দখল বজায় রাখতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। কয়েকবার তারা মান্নান ভূঁইয়ার বাড়ীতে আগুন দিতে চেয়েছে, কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, একটি লোকও মান্নান ভূঁইয়ার বাড়ী দেখিয়ে দেয়নি। যুদ্ধের শেষের দিকে ভারত থেকে অনেক বেশী অস্ত্র নিয়ে এসেছিল মুজিব বাহিনীর একটি গ্রুপ, তাদের উপর নির্দেশ ছিল মান্নান ভূঁইয়াকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তারা যুদ্ধের পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত ছিল না। অন্যদিকে আমাদের বাহিনী লাগাতার পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে কবতে যুদ্ধের পরিবেশের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ফলে অধিকতর অস্ত্রে সজ্জিত হয়েও এই অপরিচিত জায়গায় এবং অনভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যে পড়ে মুজিববাহিনী নিজেরাই কিছুটা

ভীত হয়ে পড়ে, আমাদেরকে আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। মুজিববাহিনীর মধ্যে সৎ, দেশপ্রেমিক লোকও ছিল, কেউ কেউ বামদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্নও ছিল। তারা শিবপুরের জনগণের সঙ্গে মিশে জানতে পারলো যে, মান্নান ভূঁইয়া সম্পর্কে যে চিত্র তুলে ধরে হত্যা করার জন্য মান্নানকে নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তা আদৌ সঠিক চিত্র নয়। ফলে মুজিব বাহিনীর অনেকেই আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়েন। স্থানীয় আওয়ামী লীগের সমর্থকরাও মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। শিবপুরে যুদ্ধ চলাকালে কোন ডাকাতি হয়নি। মুক্তিযোদ্ধারা প্রকৃত লালফৌজের মতোই জনগণের বন্ধু হিসাবে ছিলেন এবং প্রায়ই খাদ্যাভাবের মধ্যে থাকতেন। তাদের শীতবস্ত্রের অভাব ছিল, ঔষুধের অভাব ছিল। তবু মনোবল ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে শিবপুর এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

শিবপুরের বাহিনী বস্তুত শিবপুর থানার বাইরেও বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে মনোহরদী, রায়পুরা, পূর্বে নরসিংদী পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত ছিল। শিবপুরের গ্রামাঞ্চল প্রায় ৯ মাসই মুক্ত ছিল। শিবপুরে আমাদের সংগঠন কেবল এলাকার যুদ্ধের কাজই করেনি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হেডকোয়ার্টার হিসেবে অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করেছে। অন্যান্য অঞ্চল থেকেও কমরেডরা প্রায়ই শিবপুরে এসে থাকতেন।

শিবপুরের বাহিনীর সামরিক-রাজনৈতিক নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মজনু মৃধা, নেভাল সিরাজ, হায়দার আনোয়ার খান জুনো, আবদুল আলী মৃধা, আওলাদ, মান্নান খান, হান্নান ভূঁইয়া প্রমুখ। লক্ষ্যণীয়, সরকারীভাবে ঘোষিত মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় এদের কারো নাম নেই। মজনু মৃধার সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধের কাহিনী তখন শিবপুরের জনগণের কাছে কিংবদন্তীর মতো ছিল। কিছুদিন আগে তিনি অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। স্বাধীনতার অল্প পরেই নেভাল সিরাজকে স্থানীয় আওয়ামী লীগের একটি গ্রুপ গোপনে কাপুরুষের মতো হত্যা করে।

সাত

আগেই বলেছি কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাঙলা সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে সারা দেশে ছোট-বড় মিলিয়ে ১৪টি সশস্ত্র ঘাঁটি ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শিবপুর। এরপরই যে দুটি অঞ্চলের নাম করতে হয় তা হলো বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা। আমাদের বাহিনীগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ছিল রফিকুল ইসলাম খোকনের নেতৃত্বাধীন বাগেরহাটের বাহিনী। এই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত থেকে যুদ্ধ করতে গিয়ে মেননের শ্যালক গোলাম মোস্তফা কল্লোল শহীদ হয়েছিলেন।

শিবপুর থেকে বরিশাল-পিরোজপুর অঞ্চলের কিছু খবর পাই। পিরোজপুরের কমরেড ফজলুর নেতৃত্বে যে বাহিনী গড়ে ওঠার পথে ছিল, তা প্রথম দিকেই বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন

হয়। কমরেড ফজলুসহ ৭ জন যোদ্ধা ও কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি'র পিরোজপুরের নেতারা শহীদ হন।

আজ আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে সাতক্ষীরার কামেল বখতের কথা। আঠারো বছরের এক টগবগে তরুণ। ঐ বয়সেই সে সাতক্ষীরা অঞ্চলের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি'র নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী গড়ে ওঠে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কামেল বখত সামরিক সংগ্রামের পাশাপাশি রাজনৈতিক কাজটিকেও খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মুক্তাঞ্চলে হাতে লেখা পোস্টার লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। কামেল বখত বন্ধকী জমি পুনরুদ্ধারের কর্মসূচী নেন, যা কৃষকদেরকেও আকৃষ্ট করেছিল। কোন শত্রু সৈন্য নিহত হলে তার লাশ গাছে টাঙ্গিয়ে নিচে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি'র নাম লেখা থাকতো।

নভেম্বর মাসের কোন এক সময়। আমি তখন কলকাতায় ছিলাম। (শিবপুর ছাড়াও ভারতে আমাদের দুটো যোগাযোগ কেন্দ্র বা অফিস ছিল-কলকাতা ও আগরতলায়; যেখানে পালাক্রমে কাজী জাফর, মেনন এবং আমি থাকতাম)। কামেল বখত এলেন কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁর অঞ্চলের রিপোর্ট দিতে। সারারাত ধরে আলোচনা হলো। ঠিক হলো আমি যাবো ঐ অঞ্চলে। কবে যাবো, কোন পয়েন্ট দিয়ে ঢুকবো। (কাজী জাফর, মেনন ও আমি সীমান্ত পারাপার ক'রে বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম), কে আসবে আমাকে নিতে ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে ঠিক হলো। পরদিন কামেল বখত ফিরে গেলেন। তবে নির্দিষ্ট তারিখের আগেই সাতক্ষীরা থেকে জনৈক কমরেড এলেন, আমাকে নিতে নয়, একটি খবর দিতে—কামেল বখত মারা গেছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে কেউ হত্যা করেছে। অনুসন্ধান ক'রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের একটি গ্রুপ ভারত থেকে সীমান্ত পার হয়ে এসে গোপনে তাঁকে হত্যা করে কাপুরুষের মতো। এই মৃত্যু সংবাদ আমাকে কতোখানি মর্মাহত করেছিল তা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না।

এরপর ঐ অঞ্চলের অবস্থাকে আবার ঠিকঠাক করার জন্য আমি সেখানে যাবার জন্য আরও বেশী ক'রে তাগিদ অনুভব করলাম। একটা মিথ্যা ডান্ডি কার্ড-এর ব্যবস্থা করাই ছিল। কিন্তু ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে যাবার ফলে ঐ পথে তখন আর প্রবেশ করা কিছুতেই সম্ভব হলো না। কামেল বখতের মৃত্যুতে এক সম্ভাবনাময় বিপ্লবীকে এ দেশ হারিয়েছে।

নওগাঁয় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতা ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী গড়ে উঠেছে। তবে তিনি চারু মজুমদারের শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে ঐ বাহিনী যে সাফল্য অর্জন করতে পারতো, তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। পাশাপাশি আফতাব মোল্লার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটির নির্দেশিত

পথে একটি বাহিনী গড়ে ওঠে। আফতাব মোল্লা আমাকে একটা সুন্দর স্টেনগান উপহার দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এই স্টেনগানটি বড় চমৎকার, আমার বড় প্রিয়। তাই এটা আমি আপনাকেই দেবো।' আফতাব মোল্লা স্বাধীনতার কিছু পরে আততায়ীর হাতে শহীদ হন।

যা হোক, এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক।

আট

এপ্রিল মাসেই শিবপুরের হেডকোয়ার্টারে আমি যখন ফিরে আসি, তখন সেখানে কাজী জাফর এবং মেনন ছিলেন না। মেনন ভারতে গেছেন বলে খবর পেলাম। কাজী জাফর ইতোমধ্যে ভারত থেকে ঘুরে এসে বর্তমানে কুমিল্লার স্বগ্রাম চিয়ড়া'য় রয়েছেন। ইতোমধ্যেই কুমিল্লায় ও নোয়াখালীতে বাহিনী গঠিত হয়েছে এবং গুণবতীতে একদফা যুদ্ধ হয়ে গেছে। কাজী জাফর শিবপুরে আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন চিয়ড়া হয়ে ভারত যাবার জন্য, সেখানে সকল বামপন্থীদের নিয়ে বৈঠক হবে। চিঠি পেয়ে আমি এবং আতিকুর রহমান সালু চিয়ড়া'র পথে রওনা দিলাম। অনেক ঘোরা পথে কুমিল্লার নিকটবর্তী এক গ্রামে আমাদের সংগঠনের হাবিবুর রহমানের বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। হাবিবুর রহমান বাড়ীতে ছিলেন না, তিনি অন্যত্র সংগঠন ও যুদ্ধের কাজে আছেন। তাঁর বৃদ্ধ পিতা আমাকে নামে চিনলেন, আশ্রয় দিলেন এবং পরদিন সকালে এক বিশ্বস্ত রিকশাচালকের সঙ্গে বড় রাস্তা এড়িয়ে গ্রামের পথ দিয়ে চিয়ড়া পৌঁছাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। রিকশার সিটের নীচে দুটো পতাকা ছিল-বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের। রিকশাচালক পথঘাট ভালভাবেই চিনতেন, কোথায় পাকবাহিনীর অবস্থান আর কোথায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান তা তার জানা ছিল। সেই অনুসারে রিকশার সামনে কখনও বাংলাদেশের পতাকা, কখনও পাকিস্তানের পতাকা, কখনও পতাকাবিহীনভাবে রিকশা চললো। বিকাল প্রায় শেষ হয়ে আসছে এমন সময় আমরা চিয়ড়া'র ঠিক আগের গ্রামে পৌঁছাতেই দেখি লোকজন ছুটছে। খবর নিয়ে জানলাম, পাশের গ্রাম চিয়ড়া'য় মিলিটারী এসেছে। তাই আর অগ্রসর হলাম না। সেই গ্রামেই কাজী জাফর, কাজী আফতাব উদ্দিন গেদু মিয়া, সিরাজউদ্দিন মজুমদারসহ আরও অনেক দলীয় নেতা-কর্মীর দেখা পেলাম। কিছু পরে খবর এলো চিয়ড়া থেকে মিলিটারী ফিরে গেছে তাদের ক্যাম্পে। আমরা আশ্বস্ত হয়ে ধীরে ধীরে চিয়ড়া'য় গেলাম। ইতোপূর্বে চিয়ড়া'য় আমাদের একটি সশস্ত্র ইউনিট গঠিত হয়েছিল। জনগণ সশস্ত্র তরুণদের খুবই ভালবাসতো, কিন্তু বয়স্করা তাদের নিজ গ্রামে বা আশেপাশের এলাকায় কোন প্রকার অ্যাকশন করতে বাধা দিতো। চিয়ড়া'য় যখন মিলিটারী ঢোকে, তখন আমাদের ইউনিট প্ল্যান করেছিল অ্যামবুশ ক'রে পাক সেনাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু স্থানীয় বয়স্ক মানুষরা যথেষ্ট বিনীতভাবে তাদেরকে এই কাজ থেকে বিরত করে। তাদের ভয়, মিলিটারীর ওপর

আক্রমণ চালালে তারা গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবে।

আমাদের পার্টির স্থানীয় নেতৃত্ব জনগণের এই অনুরোধকে উপেক্ষা করে কোন কাজ করা সঠিক হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে আমাদের সশস্ত্র ইউনিটটিও অস্ত্রসহই সরে আসে। কিন্তু মিলিটারী গ্রাম পরিত্যাগ করার পর জনগণের মনোভাব বদলে গেছে। আমরা চিয়ড়া গ্রামে গিয়ে যা শুনলাম, তাতে মাথায় রক্ত চড়ে যাবার মতো। মিলিটারী ছিল মাত্র আধা ঘন্টা। এর মধ্যে কোন লোক খুন করেনি, কোন বাড়িতে আগুন দেয়নি, কিন্তু কিছু লুট করেছে আর ধর্ষণ করেছে। এবার জনগণ আমাদের সশস্ত্র তরুণদের বললো, মিলিটারী আসলে তারা যেন প্রতিরোধ করে। এইভাবে জনগণের মন পাল্টায়, ভীতির ভাব কেটে গিয়ে জঙ্গী মনোভাব গড়ে ওঠে। জনগণের মধ্যে এই মনোভাব সৃষ্টি না হলে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সহজ হতো না। চিয়ড়া'য় কয়েকদিন অবস্থানের পর স্ত্রী ও কন্যাসহ কাজী জাফর ও আমি এক রাতে বর্ডার পার হলাম। কোয়ার্টার মাইলের মধ্যেই পাক সেনাদের ক্যাম্প। আমাদের সশস্ত্র ইউনিট পাহারা দিয়ে বর্ডার পার করিয়ে দিলো।

পাহাড় বন পার হয়ে বিলোনিয়া, বিলোনিয়া থেকে আগরতলা পৌঁছলাম। সেখানে বাঙ্গালী মুক্তি ফৌজের সঙ্গে দেখা হলো। এই প্রথম ভারতে অবস্থানরত প্রবাসী সরকারের মুক্তি ফৌজের সঙ্গে আমার পরিচয়। তাদের ক্যাম্পে এক রাত থাকলাম। আগরতলায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী'র) অফিসে গেলাম। শ্রদ্ধেয় নৃপেন চক্রবর্তী ও অন্যান্য নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। তাদেরই সহযোগিতায় আমরা মেঘালয়-আসাম ঘুরে তিন দিন চার রাতের যাত্রা শেষে কলকাতা পৌঁছলাম। সিপিআই (এম) -এর অফিসে গেলাম। সিপিআই (এম) বাংলাদেশের বামপন্থীদের জন্য বৈঠকের ব্যবস্থা করেছে। তাঁরা আমাদের থাকা, খাওয়া নিরাপত্তা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সব ব্যবস্থাই করেছিলেন।

সম্মেলনের শেষ সন্ধ্যায় তাঁরা আমাদের জন্য একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন। একটি গানের একটি লাইন এখনও মনে আছে-'সূর্যদীপ্ত বাংলাদেশ পরেছে আজ যুদ্ধবেশ'। বড় ভাল লেগেছিল।

১ ও ২ জুন কলকাতার বেলেঘাটায় এক স্কুলে আমাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সিপিআই(এম) ব্যবস্থাপনার-সব দায়িত্ব নিলেও সম্মেলনের রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁরা কোন প্রকার অংশ নেননি, এমনকি পরামর্শও দেননি। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুরের ন্যাপ নেতা বড়দা চক্রবর্তী। এই সম্মেলনে যে সব পার্টি ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছিলেন তারা হলো-ন্যাপ (ভাসানী), কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, হাতিয়ার গ্রুপ, কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ, কৃষক সমিতি, শ্রমিক ফেডারেশন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ববাংলা ছাত্র ইউনিয়ন। এখানে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ছিল মূল শক্তি।

ন্যাপের ভাল রকম প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ন্যাপ'কে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন আশরাফ সিদ্দিকী ও বড়দা চক্রবর্তী। এই সম্মেলনে আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে একটি ঘোষণাপত্র রচনা ও উপস্থাপনা করার। ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হয়; গঠিত হয় 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি।' এই ঘোষণাপত্রটি ভারত ও অন্যান্য দেশের পত্রপত্রিকায় বাংলায় ও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র চেয়ারম্যান করা হয় মওলানা ভাসানীকে, যদিও ভাসানীর সঙ্গে তখনও পর্যন্ত আমাদের কারোরই দেখা হয়নি। ভারতে অবস্থানকালে আমরা মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। ভারতের কিছু উচ্চপদস্থ আমলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাদেরকে বলেছিলাম, ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই। সিপিআই(এম)-কে ও বলেছিলাম তাঁরা যেন চেষ্টা করেন। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকেও অনুরোধ করেছিলাম। কিছু কিছু সাংবাদিককেও অনুরোধ করেছিলাম তারা যাতে কোনভাবে ভাসানীর সন্ধান দিতে পারেন। কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। এমনকি ভাসানীর পুত্র আবু নাসের খান ভাসানীও তার পিতার সন্ধান দিতে পারেন নি।

একদিন হঠাৎ করেই পাবনার ন্যাপ (মোজাফফর) নেতা সাইফুল ইসলামের সঙ্গে দেখা হলো কলকাতায়। তিনি জানালেন যে, তিনি ভাসানীর সঙ্গে আছেন। আমরা বললাম দেখা করতে চাই। তিনি বললেন, সম্ভব নয়। বস্তুত ভারতে ভাসানী গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন। তবে কয়েকদিন পর সাইফুল ভাই, কাজী জাফর,মেনন ও আমাকে উদ্দেশ্য ক'রে ভাসানীর একটি চিঠি বহন ক'রে আনলেন। ছোট এক টুকরা কাগজে গোটা অক্ষরে কয়েকটি লাইন লেখা। যতোদূর মনে আছে কথাগুলি ছিল এই রকম-'তোমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে। কোন আপোস ফর্মূলা মানিবে না।' শেষে একটি কবিতার লাইন ছিল- 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তো একলা চলরে।' উল্লেখ্য,সেই সময় পাকিস্তানের সাথে একটা কনফেডারেশনের কথাবার্তা চলছিল। শোনা যায় খন্দকার মোশতাক এর উদ্যোক্তা ছিলেন। খন্দকার মোশতাকের সঙ্গেও আমি দেখা করেছি। তিনি আমাকে বললেন, তোমরা তো বাবা কমিউনিস্ট, তাই না?' (মোশতাক আমাদের প্রায়ই বাবা বলে সম্বোধন করতেন)। হ্যাঁ সূচক জবাব দিলাম। মোশতাক বললেন, 'আমি কমিউনিস্ট নই, বরং কমিউনিস্টদের মতাদর্শের বিরোধী, তবে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নই। আমি গণতন্ত্রী, তাই তোমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আলোচনা করতে পারি।' তিনি আরও মজার কথা বললেন। তিনি বললেন, 'আমি পাকিস্তানী অখন্ডতায় বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগের কোন ঘোষণাপত্র, প্রস্তাবে কখনই বিচ্ছিন্নতার কথা বা সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ছিল না। এমনকি ৬ দফাও বিচ্ছিন্নতাবাদ নয়। আমি বরাবর ভালো আওয়ামী লীগার। তবে এখনকার অবস্থায় সিসেশন ও আর্মড স্ট্রাগল একটা বাস্তব সত্য, আমি তা মেনে নিয়েছি।'

কাজী জাফর আহমদ ও আমি বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র ঘোষণাপত্র

হাতে নিয়ে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে জানাই যে, আমরা প্রবাসী সরকারকে মেনে নিয়েই যুদ্ধ করতে চাই, দেশকে স্বাধীন করার জন্য এই অধিকার আমাদের আছে এটা কেবল আওয়ামী লীগের একচেটিয়া অধিকার হতে পারে না। ভারতে অবস্থিত মুক্তিফৌজে যাতে বামপন্থীরাও যোগ দিতে পারে, সেজন্য তাঁর কাছে দাবী জানাই। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করলেন। তিনি আমাদের সবরকম সুযোগের আশ্বাস দিলেন (যদিও তা পরবর্তীতে কোন কাজে আসেনি)। তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে বামপন্থীদের বরাবরই বন্ধুত্ব। তোয়াহা আমার বিশেষ বন্ধু। সে যে এখন কি করছে। তোমরা একটু চেষ্টা করে দেখো তো তোয়াহার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কি না।'

ভারতে চলাফেরাও আমাদের জন্য নিরাপদ ছিল না। চীনপন্থী সন্দেহে অনেক ন্যাপ ও কমিউনিস্ট কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। অনেকের কোন হদিসও পাওয়া যায়নি। একবার ত্রিপুরায় কিছু সংখ্যক ন্যাপ কর্মী গ্রেফতার হলে আমরা সিপিআই (এম) অফিসে গিয়ে খবরটা জানাই। সিপিআই (এম) নেতা কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে আগরতলায় অবস্থিত আওয়ামী লীগ অফিসে যান এবং শেখ ফজলুল হক মনির কাছে এই গ্রেফতারের কারণ জানতে চান। মনি উত্তর দেন, 'আমরা তো কিছু জানি না, এটা তো ভারত সরকার...।' নৃপেন চক্রবর্তী বেশ রেগে গিয়েই উত্তর দিলেন, 'আপনারা খবর না দিলে কি ক'রে ভারত সরকার জানবে কে ন্যাপ, কে কমিউনিস্ট আর কে আওয়ামী লীগ ?... দেখুন, এদেশে থাকতে হলে এদেশের জনগণের সহযোগিতা নিয়েই থাকতে হবে। সিপিআই (এম) এখানকার জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যথায় মাসী পিসি (অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী) কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না।' আশ্চর্যজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করলাম, নৃপেন চক্রবর্তীর এই হুমকির পরই আটক ন্যাপ কর্মীরা ছাড়া পান।

ভারতে চলাফেরাও বেশ বিপদজনক ছিল। এক্ষেত্রে প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী কামরুজ্জামান আমাদের সাহায্য করেছিলেন। তিনি আমাদের কয়েকজনের নামে সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন, তাতে ভারতে গ্রেফতার হবার আশঙ্কা থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছিলাম। তবু দীর্ঘ সময় ভারতে থাকা আমাদের কাছে ভালো লাগতো না। কারণ আসল যুদ্ধ তো হচ্ছে দেশের মধ্যে। তবে দু'টি কারণে আমাদের সময় সময় ভারতে থাকতে হয়েছে। প্রথমত, দেশের মধ্যে এক স্থান থেকে দূরবর্তী আরেক স্থানে যোগাযোগ প্রায় অসম্ভব ছিল। সেক্ষেত্রে ভারতীয় ভূমি ব্যবহার সুবিধাজনক। দ্বিতীয়ত, ভারতে অবস্থানরত মুক্তিফৌজের মধ্যে আমাদের ক্যাডারদের ঢোকানো এবং বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি। ভারতে আমাদের আশ্রয়, অর্থ, চিকিৎসার সুবিধা, ঔষুধ ও সর্বোপরি নিরাপত্তার ব্যবস্থা দিয়ে সাহায্য করেছিল সিপিআই (এম)। যুদ্ধের ক্ষেত্রেও আমাদের দুই ধরনের কৌশল ছিল-১) দেশের মধ্যে মুক্ত ও গেরিলা ঘাঁটি অঞ্চল

গড়ে তোলা; ২) সরকারী মুক্তিফৌজের মধ্যে থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা।

আমরা তাই ৩টি কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করতাম- শিবপুর, আগরতলা ও কলকাতা। মান্নান ভূইয়া শিবপুরেই থাকতেন। কাজী জাফর, মেনন ও আমি পালাক্রমে কলকাতা ও আগরতলায় থাকতাম এবং সীমান্তের এপার-ওপার যাতায়াত করতাম।

মুক্তিফৌজের নেতৃত্বে ছিলেন বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডার। তাদের সঙ্গে প্রবাসী সরকার ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ভেতরে ভেতরে দ্বন্দ্ব ছিল। আমরা এই সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে আমাদের ক্যাডারদের ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের পক্ষ হয়ে সেক্টর কমান্ডার বা বাঙ্গালী সামরিক অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন ব্যারিষ্টার মনসুর আহমদ। তিনি তখন আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা দিনাজপুর থেকে সাঈদ ইসকান্দারকে ডেকে এনে মেঘালয় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানে তার ভগ্নিপতি জিয়া সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। সাঈদ ইসকান্দারের কাজ ছিল জিয়ার সঙ্গে থাকা এবং আমাদের নির্দেশ মতো মুক্তিফৌজে আমাদের ক্যাডারদের ঢুকিয়ে দেয়া। আমাদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ ছিলো তাদের মধ্যে ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর মনজুর আহমদ, কর্ণেল জামান প্রমুখ। তাদের কেউ কেউ আমাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ পর্যন্ত করেছেন। খালেদ মোশাররফ বলতেন, 'আমার বাহিনীতে বেশীর ভাগই ন্যাপ ও কমিউনিষ্ট।' এর জন্য অবশ্য তার কোন আক্ষেপ ছিল না, যদিও তিনি কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলেন। একবার শিবপুর থেকে জুনো'র নেতৃত্বে একটি দল গিয়েছিল খালেদ মোশাররফের কাছে কিছু অস্ত্রের জন্য। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন। বরং তিনি জুনোকে ডেকে বললেন, 'এখনই দেশের ভেতরে চলে যাও, না হলে তোমাকে গ্রেফতার করার অর্ডার এসেছে।' জুনোকে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে আসতে হয়। আগেই বলেছি, খালেদ মোশাররফের অধীনস্ত ঢাকার 'ক্র্যাক প্লাটুন'-এর অধিকাংশ ছিলেন 'কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। তাঁদের সাহসী ভূমিকা (দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতোপূর্বে উল্লেখিত রুমীর ভূমিকা) প্রশংসা অর্জন করেছিল। তবু ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সন্দেহের অবসান ঘটেনি। মেলাঘরের মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের নেতৃত্ব দিতো শহীদুল্লাহ খান বাদল। সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকেও মেলাঘর ক্যাম্প ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল।

শিবপুরে আমরা যে যুদ্ধ করছি, এটা ত্রিপুরায় অবস্থিত বাংলাদেশের সরকারী মুক্তিফৌজের জানা ছিল। আমরা জানিয়েছি যে, আমরা সরকারী বাহিনীর অধীনে থেকেই এবং প্রবাসী সরকারের প্রতি অনুগত থেকেই যুদ্ধ করতে চাই। কিন্তু বাস্তবে আগরতলা থেকে এতোদূরে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা সম্ভব ছিল না। সরকারী মুক্তিফৌজের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে একবার বলা হলো- প্রমাণ চাই যে মান্নান ভূইয়ার নেতৃত্বে সত্যিই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে। প্রমাণ স্বরূপ একবার যুদ্ধে নিহত পাকিস্তানের এক ক্যাপ্টেনের ব্যাজ পাঠিয়ে দেয়া হলো। বিশ্বাস করানো গেল না। হুকুম আসলো, কোন জীবিত পাকসেনাকে ধরে পাঠাতে

হবে। বস্তুত, শিবপুরে পাক সেনাদের গ্রেফতার করার মতো ঘটনাও আছে। কিন্তু এতোদূরের পথে সেই বন্দী সেনাকে পাঠানো যে কতো অবাস্তব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রসঙ্গে একটি করুণ কাহিনী বলতে চাই। একবার এক পাক সেনাকে বন্দী করা হলো। শিবপুরে বন্দী ক'রে রাখার মতো ব্যবস্থা ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই বন্দীদের মেরে ফেলা হতো। একবার এক যুবক পাকসেনা বন্দী অবস্থায় একটি আবেদন করেছিল। বলেছিল, 'আমার হাতে দেখো মেহেদীর দাগ। আমাকে তো মেরে ফেলবে। তবু একটা পোস্টকার্ড দাও, আমি আমার সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে আমার মৃত্যুর খবরটা জানিয়ে যাবো।' তাকে পোস্টকার্ড দেয়া হয়েছিল। সে উর্দুতে চিঠি লিখেছিল। ঠিকানাও লিখেছিল। বলাই বাহুল্য, সে চিঠি আর পোস্ট করা হয়নি। শিবপুরে যুদ্ধাবস্থায় চিঠি পোস্টের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। শত্রুপক্ষ হলেও আজ আমার তার জন্য মায়া হয়। যুদ্ধ বড় নৃশংস। তবু ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ প্রয়োজনীয় ও মহান কর্তব্য।

ভারতে আমরা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। এটাও সত্য যে, ভারত সরকার আমাদের বিশ্বাস করতো না। তবু ভারতের জনগণ ও সরকারের সহযোগিতা না পেলে যে আমাদের স্বাধীনতা বিলম্বিত হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধ দ্রুত শেষ হওয়ায় জনগণ যেন হাফ ছেড়ে বেঁচেছিল। আমাদেরকে স্বাধীন করতে দিয়ে ভারতের জনগণ যে ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং ভারতের ১৫ হাজার সৈন্য যে জীবন দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তবে ভারত আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছে, এমন কথার আমি তীব্র বিরোধিতা করি। স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ যে একক কৃতিত্ব দাবি করে তাও পরিপূর্ণ রূপে মিথ্যা ভাষণ। স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা খুবই উজ্জ্বল। কিন্তু বুর্জোয়া প্রেস ও পন্ডিতরা এই সত্যটিকে বরাবর আড়াল করার চেষ্টা করেন। এর সুযোগও আবার তৈরী ক'রে দিয়েছে বামপন্থীদের একাংশের চরম বিভ্রান্তিকর রাজনীতি। আমার মনে হয়, যদি ভারত সরাসরি সৈন্য না পাঠাতো, তাহলে যুদ্ধ প্রলম্বিত হতো ঠিকই, কিন্তু শেষ পরিণতিতে ফলটা ভালই হতো।

মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) পাবনা জেলা শাখার ভূমিকা

ড. লেনিন আজাদ

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। আওয়ামী লীগের ডাকে অসহযোগ চলছে। ঢাকায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের একাংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় চলে গেছে। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে আ.স.ম আবদুর রব, শাহাজান সিরাজ প্রমুখ ছাত্রনেতা স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার শ্লোগান দিয়ে চলেছে। গোটা পূর্ব বাংলার প্রশাসন চলছে শেখ মুজিবের নির্দেশে। যেন একটা ব্যাপক বিজয় ঘটে গেছে। পূর্ববাংলা যেন স্বাধীন হয়ে গেছে। শেখ মুজিব নিজেও সিরাজুল আলম খান গ্রুপের চাপের মুখে ৭ মার্চ এক রকম স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, কিন্তু তা শর্ত সাপেক্ষে। বক্তৃতা শুনেই বুঝা গেল- স্পষ্ট কোন বক্তব্য নয়; আওয়ামী লীগের বিভিন্ন গ্রুপের চাপের প্রতিফলন পড়লো পুরো বক্তৃতায়। বেশ দীর্ঘ এবং আইন বাঁচিয়ে একটা বক্তৃতা দিলেন শেখ মুজিব। তাতে যেমন স্বাধীনতার কথা ছিল, তেমনই আপোসের জন্য নানা রকম পথের উল্লেখ করা হলো। ১১ মার্চ শেখ মুজিব যখন ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনা থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন, তখন তাঁর মনোভাবটা স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি সাংবাদিকদের জানালেন, ইয়াহিয়ার সাথে অর্থপূর্ণ-আলোচনা হয়েছে। সাংবাদিকদের পাল্টা এক প্রশ্নের জবাবে জানালেন, মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে আলোচনায় তিনি বসতেন না। এরপর গুজব রটে গেল- আপোস হয়ে যাচ্ছে। ৬ দফা মেনে নিয়ে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এক ধরনের কনফেডারেশন গঠিত হতে যাচ্ছে। অথচ সে সময় প্রতিদিন সারা পূর্ববাংলা থেকে সেনাবাহিনীর গুলিতে অসংখ্য মানুষের হত্যার সংবাদ আসছে, চারিদিকে এক বিস্ফোরনাুখ পরিস্থিতি।

ড. লেনিন আজাদ ঃ বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক

এ পর্যায়েও শেখ মুজিব কেন আপোস আলোচনায় যাচ্ছে তা সবার বোধের বাইরে ছিল। এ ধরনের একটি জটিল পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল)-এর পাবনা জেলা কমিটি সাধারণভাবে প্রচার চালাতে থাকে ঃ এখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার পরিস্থিতিটা পরিপক্ক হয়ে ওঠা সত্ত্বেও শেখ মুজিব আপোস আলোচনায় যাচ্ছেন, গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন তিনি পরিত্যাগ করতে পারছেন না। আসলে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে আন্তরিক নন। টিপু বিশ্বাস ছিলেন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল)-এর পাবনা জেলা কমিটি সম্পাদক। তিনি সে সময় উক্ত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন না। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে পার্টির কি করা উচিত তা নিয়ে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় নেতারা সব ঢাকায় গেছেন। সে সময় টিপু বিশ্বাস গোপন জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনিতেই 'ভোটের আগে ভাত চাই' কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি থেকেই তাঁর নামে হুলিয়া ঝুলছিল। তার ওপর নবনির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য রফিক আহম্মদ-এর গুপ্ত হত্যার দায় আসে পার্টির ওপর। পুরো প্রশাসন আওয়ামী লীগের নির্দেশে চলার কারণে আওয়ামী লীগ কর্মীরা পুলিশের সহায়তায় পার্টি কর্মীদের ওপর হামলা চালাতে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মীর বাড়ী ভাংচুর হয়। পার্টি কর্মীদের ওপর এ সকল আক্রমণে অনেক সময় তিন-চার শ আওয়ামী লীগ কর্মী অংশ নিতো। এরকম একটি বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পার্টি কর্মীদের টিকে থাকতে হচ্ছিল। ঠিক এমনই এক পর্যায়ে ঘটে যায় ২৫ মার্চের হত্যাকান্ড। ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার গণহত্যা শুরু করে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়

পাকবাহিনীর কাছে ঢাকার পতন ঘটেছে। সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও হত্যাকান্ড চলছে, পুলিশ ও বিডিআর ক্যাম্পে নির্মম হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী হলে গিয়ে সবাইকে হত্যা করা হয়েছে- এ ধরনের সকল সংবাদ ২৬ মার্চ সকালের মধ্যেই সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পাবনা জেলা কমিটির সম্পাদক হিসাবে টিপু বিশ্বাস প্রথমে ঠিক বুঝতে পারছেন না এ মুহূর্তে কি করতে হবে। পরামর্শ করার মতো কেন্দ্রীয় নেতারা সব অনুপস্থিত। তিনি অন্তত এটুকু বুঝলেন- এ মুহূর্তে আর বসে থাকা নয়, কিছু একটা করতেই হবে। তিনি সকালেই পারিবারিক একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন জনসাধারণের মনোভাব সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য। তিনি খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পাবনা সদর থানার ৮/১০ টি ইউনিয়ন ঘুরে আসলেন। অল্প পানিতে প্রচুর মাছ আটকা পড়লে যেমন টগবগ করে, ঠিক তেমনি মানুষ ক্রোধে-ঘৃণায় যেন ফেটে পড়ছে, প্রতিরোধের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করতেও তারা প্রস্তুত। এ পর্যায়ে

কি করা উচিত এ ব্যাপারে পার্টির কোন নির্দেশনা নেই। তবে ১৯৭০ সালের কংগ্রেস রিপোর্টে একটি কথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে- 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতা থেকে পূর্ববাংলা একদিন মুক্ত হবেই, তবে প্রশ্ন হলো সে মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব কে দেবে। কমিউনিস্ট পার্টি যদি তার নেতৃত্ব দেয় শুধুমাত্র তাহলেই এদেশের আপামর জনসাধারণের মুক্তি আসবে, না হলে পূর্ববাংলাকে নিয়ে স্বতন্ত্র নামের দেশ হবে ঠিকই কিন্তু কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষের মুক্তি আসবে না।' কংগ্রেস রিপোর্টের এ বক্তব্যটি টিপু বিশ্বাসকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করলো। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তাৎক্ষণিকভাবেই। পাকবাহিনীর ওপর হামলা চালাতে হবে এবং তা আজই।

২৬ মার্চ দুপুর গড়িয়ে গেছে। পার্টি মাও সেতুং-এর ৬টি সামরিক প্রবন্ধের আলোকে কয়েক মাস আগে থেকেই সজ্জিত হচ্ছে। বোমা তৈরীর অভিজ্ঞতা ইতোমধ্যেই রপ্ত হয়েছে। অস্ত্র বলতে জনৈক ডাকাতের কাছ থেকে ৪০০ টাকা দিয়ে কেনা একটি কার্তুজ কাটা বন্দুক আর একটি মাত্র ২৮ এম.এম রাইফেল। এই দিয়ে কি করে পাক আর্মির ওপর হামলা চালানো যায়। আবার পাক আর্মির সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়, ২০০ জন। ২৬ মার্চ পাবনা শহরে পাকবাহিনীর সৈন্যরা গুরুত্বপূর্ণ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে- এরা তিনজন হলেন পাবনা পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা অমলেন্দু এবং ব্যবসায়ী সাইয়িদ তালুকদার। এ নিয়ে গণমনে প্রচন্ড উৎকণ্ঠা, কেউ কিছু বলছে না দেখে তীব্র বিক্ষুব্ধ। এ মনোভাব বুঝে স্কয়ার ঔষধ কোম্পানীর মালিক জনাব শামসুল হাসানের কাছে ১ হাজার টাকা চেয়ে পাঠালেন টিপু বিশ্বাস। সে টাকা দিয়েই তিন বস্তা বোমা বানানোর রসদ ক্রয় করা হলো। সারা রাতধরে বোমা বানানো হলো। এ বোমাগুলি কোন কোনটি আড়াই কেজি ওজনেরও ছিল। অন্যদিকে, গোপনীয়তা বজায় রেখে মোট ৪০/৪৫ জন গেরিলাকে বেছে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হলো এবং পরিকল্পিতভাবে এল-সার্কেলে সজ্জিত করে কখন কিভাবে কোথায় কোন গ্রুপ হামলা চালাবে তার নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। এছাড়া, এলাকার বিভিন্ন ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্য থেকে আরো ৪০০-৫০০ শক্ত সামর্থ যুবককে বাছাই করা হলো- এরা সকলেই ঢাল, ফালা ও সড়কি চালাতে সিদ্ধহস্ত। প্রশিক্ষণ দেয়া হলো কিভাবে নিজে আত্মরক্ষা করে শত্রুদের আক্রমণ করতে হবে। পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো-আক্রমণ চালানো হবে ২৭ মার্চ প্রভাতে।

২৭ তারিখ প্রভাত। কমান্ডার টিপু বিশ্বাস, ডেপুটি কমান্ডার শহীদ। পদ্ধতি ঃ গেরিলা আক্রমণ। আর্মি ক্যাম্পটা ছিল পাবনা শহরের দক্ষিণ পাশে হেমায়েতপুরে। এর অবস্থান খুবই পরিচিত ছিল। গোপনে যেয়েও পথিমধ্যে হাজার হাজার মানুষ এ যোদ্ধাদের দেখে ফেলে এবং পাকবাহিনীকে হামলা করতে যাচ্ছে শুনে শত শত যুবক তাদের সঙ্গী হন।

অগ্রগামী বাহিনী ছিল ৪০/৪৫ জনের উক্ত তিনটি গ্রুপ, তাঁরা এগুতে এগুতে পাক সেনাদের অবস্থানের খুব কাছে চলে যান এবং একযোগে প্রায় সবগুলি অবস্থানের ওপর হামলা চালান। বিশাল আয়তনের বোমাগুলি শর্টপুটের মতো থ্রো করে শত্রু অবস্থানগুলির ওপর ফেলা হয়। এতে এতো বিকট আওয়াজ হয় এবং গোটা দালান ঘরসুদ্ধ উড়ে যেতে থাকে যে, পাক সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর পাল্টা কোন প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। ২৯ জন পাক সেনা তাৎক্ষণিকভাবে নিহত হয়। বাকীরা কিছু গুলি বর্ষণ করলেও মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান নির্ণয় করতে না পেরে কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। বরং উপর্যুপরি বোমা হামলায় পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই ছত্রভঙ্গ পাক সেনাদের ওপর বাঙ্গালী পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা, দেশী অস্ত্রে সজ্জিত গ্রামবাসীরা আক্রমণ করে। পাক বাহিনীর অনেক সদস্য পাবনা শহর থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের একজনও আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়নি।

টিপু বিশ্বাসের সাহসী নেতৃত্বে যুদ্ধের এ গৌরবোজ্জ্বল বিজয়কে হাজার হাজার মানুষ স্বাগত জানায় এবং পাবনার মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় টিপু বিশ্বাস এবং তাঁর বাহিনী। এই যুদ্ধ থেকে তিনি খুবই উন্নত ধরণের ৩০টি অস্ত্র উদ্ধার করেন। চাইনিজ রাইফেল, ব্রেটাগান, এলএমজি ছাড়াও তার মধ্যে ছিল ৩টি অত্যাধুনিক পিস্তল। এছাড়া উদ্ধাব করা হয় তিনটি সামরিক জীপ, তিনটি সামরিক ট্রাক এবং ২টি মাইক্রোবাস। এরপর তিনি বিজয় মিছিল করে পাবনা শহরে চলে আসেন এবং সদর থানার মালখানা ভেঙ্গে ১২/১৩টি ৩০৩ রাইফেল ও বেশ কিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করেন। বিজয়ীর বেশে যখন তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে শোভাযাত্রা করে আসছেন, স্কয়ারের মালিক শামসুল হক সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রশ্ন করেন, এতো কম টাকায় জন্য তার কাছে পাঠানো হলো কেন। এ কথার মধ্য দিয়ে টিপু বিশ্বাস উপলব্ধি করেন, যুদ্ধটা এদেশের সকলের এবং এটা অত্যন্ত সময়োচিত কাজ ছিল। ২৭ তারিখের যুদ্ধে বিজয় অর্জন করলেও, পাবনা শহরবাসী তাঁকে ব্যাপকভাবে সংবর্ধনা জানালেও তিনি পাবনা শহরে অবস্থান করেননি। তাঁর মনে হয়, গ্রামের কৃষকেরা সেদিন প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় যে সাহসী ভূমিকা পালন করলো, তাতে একমাত্র তাঁরাই পারে এ যুদ্ধকে বিজয়ী যুদ্ধে রূপান্তরিত করতে। এ বিবেচনা থেকেই তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মার্চ করে চলে যান গ্রামাঞ্চলে, সানিরদিয়া গ্রামে। পদ্মা নদীর তীরে এ গ্রামেই তিনি ঘাঁটি গড়ে তোলেন। যুক্তি ছিল- যে কোন হামলা থেকে জনগণই একমাত্র রক্ষা করতে পারে: জায়গাটিকে তিনি কৌশলগত দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। সানিরদিয়াকে অস্থায়ী ঘাঁটি হিসাবে নির্ধারণ করে এলাকার সকল যুবককে সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়। বিপুল সংখ্যক কৃষক এতে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ইতোমধ্যে ঢাকা থেকে পার্টির দুই কেন্দ্রীয় নেতা জনাব

আবদুল মতিন (সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি) ও আলাউদ্দিন আহমদ এলাকায় ফিরে আসেন। তাঁরা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে জানান, পাকবাহিনীর যে হাবভাব তাতে অতি দ্রুতই আবার পাবনা দখল করে নেবে। ফলে প্রশ্ন দেখা দেয়, এই সামান্য শক্তি নিয়ে টিকে থাকা যাবে কিনা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়- অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। ইতোমধ্যে পাবনা শহরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসন চলছে। জেলা প্রশাসক নূরুল কাদের শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকেই অস্ত্রভাণ্ডার থেকে অস্ত্র দিচ্ছে, টিপু বিশ্বাস বার বার লোক পাঠিয়েও কোন অস্ত্র জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে নিতে পারেননি। এ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়- জেলা প্রশাসকের ওপর চাপ দিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করা হবে।

৫ এপ্রিল '৭১ সাল। পাঁচ হাজার কৃষক-জনতা সানিরদিয়া থেকে পাবনা শহর অভিমুখে মার্চ করলো। সাথে পার্টির সশস্ত্র বাহিনী। পাবনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে তাঁরা অবস্থান নিলেন। জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনার জন্য গেলেন তিন জন ঃ টিপু বিশ্বাস, শহীদ ও মাসুদ। তিনজনই অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। জেলা প্রশাসকের কক্ষে গিয়ে দেখতে পান আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল হক বাদশা এবং আহমেদ করিম (নিহত এমপি আহমেদ রফিকের ছোট ভাই)। টিপু বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগিদের দেখে আওয়ামী লীগ নেতারা মোটেই খুশী হন নি। সে পর্যায়ে তাদের দু'জনকে বাদ দিয়ে শুধু জেলা প্রশাসকের সঙ্গে টিপু বিশ্বাস কথা বলেন এবং ৩ দফা দাবী জানান ঃ ১) পাক আর্মি আবার পাবনা দখল করবে, তা প্রতিরোধের জন্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অস্ত্র দিতে হবে; ২) নিয়মিত যোদ্ধাদের প্রচুর খাদ্য প্রয়োজন, সেজন্য অন্তত চাল সরবরাহ করতে হবে; ৩) যোদ্ধাদের দ্রুত পরিবহণের জন্য জ্বালানি সরবরাহ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক গাড়ির জ্বালানি দেয়ার কথা প্রথমে স্বীকার করলেন। চাল দেবার জন্যও চেষ্টা করবেন বলে জানালেন; কিন্তু অস্ত্রের ব্যাপারে তিনি জানালেন, জেলা অস্ত্রাগারে একটি অস্ত্রও নেই। ভারত থেকে কয়েকদিনের মধ্যে অস্ত্র আসবে, তা থেকে টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর জন্য ৫০০ অস্ত্র দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। উল্লেখ্য জেলা প্রশাসক নূরুল কাদের শেষের যে কথাটি বলেছিলেন তা ছিল ডাহা মিথ্যা কথা এবং প্রতারণার সামিল। টিপু বিশ্বাস কিছুক্ষণ পরই তা বুঝতে পারেন, কেননা তিনি যখন জেলা অস্ত্রাগারে যা আছে তাই সংগ্রহ করতে যান, তখন দেখতে পান ২২ টা ব্রেটাগান, ১৫টি ৩০৩ রাইফেল, ১০টি ষ্টেনগান এবং পুরো এক ট্রাক গুলি। অস্ত্রভাণ্ডারের সবকিছু নিয়ে তিনি তাঁর সদর দপ্তরের দিকে রওনা হন।

উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে পাবনা জেলাতে স্পষ্টভাবে দুটি প্রশাসন বিরাজ করতে থাকে। একটি জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে, অন্যটি টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে। ক্রমাগত টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু সে সময় চারদিক থেকে

একটি তীব্র সংকট এগিয়ে আসছিল। একের পর এক জেলাগুলির পতন হচ্ছে, পাক সেনারা দখল করে নিচ্ছে। পাবনা জেলা যে কোন সময় আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু এ নিয়ে জেলা প্রশাসক কিংবা আওয়ামী লীগের নেতাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। তারা মুখে খুব বড় বড় কথা বলতে লাগলেন কিন্তু প্রতিরোধের জন্য কোন ব্যবস্থাপনাই গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন না। এ পর্যায়ে টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন বাহিনী সারা পাবনা জেলায় কার্ফ্যু ঘোষণা করলেন এবং সকলের কাছ থেকে লাইসেন্সধারী অস্ত্র উদ্ধার করেন। এ থেকেও ৩০ টা অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এছাড়া, যুদ্ধে লিপ্ত নয় এমন পুলিশ, বিডিআর, জিআরপি ইত্যাদি থেকে প্রতিদিন অস্ত্র উদ্ধার হয়। এভাবে প্রায় ৭০০ অস্ত্র সংগৃহীত হলো। বাহিনীর সদস্যও জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে কখনও আওয়ামী লীগের কর্মী ও তাদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর কাছ থেকে কোন অস্ত্র উদ্ধার করা হয়নি। বরং বারবার তাদেরকে ডাকা হচ্ছিলো পাকবাহিনী আক্রমণ করতে আসলে তা প্রতিরোধের লক্ষ্যে যুগপৎ যুদ্ধের কৌশল নিয়ে আলোচনার জন্য। কিন্তু তারা কোন সাড়া দিলেন না বরং এটা কোন সমস্যাই নয়- এমন ভাব করতে লাগলেন। সে সময় টিপু বিশ্বাস ও তাঁর জেলা পার্টির কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বাহিনী আসলে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে চায়। এ পর্যায়ে পাবনা পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর কাছে প্রস্তাব দেয়া হবে দেশের মধ্যে অবস্থান করে যৌথভাবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে যদি তারা ভারতে চলে যেতে চায়, তাহলে তাদের অস্ত্র-গোলাবারুদ যাতে দিয়ে যায় সেজন্য অনুরোধ করা হবে। যদি কেউ এ প্রস্তাবে রাজী না হয় তাহলে তাদেরকে নিরস্ত্র করা হবে এবং তাদের সকল অস্ত্র-গোলাবারুদ ছিনিয়ে নেয়া হবে। পার্টির যুক্তি ছিল, পাক হানাদারবাহিনীর আক্রমণের মুখে জনসাধারণকে ফেলে পালিয়ে যাওয়া ভীরুতা ও নৈতিকতাবর্জিত একটি কাজ। তাছাড়া, ফাঁকা মাঠ হিসাবে এলাকাগুলি ফেলে রেখে গেলে হানাদাররা যখন পুনরায় জেলা পুনর্দখল করতে আসছে, সে সময় নিজেদের শক্তি সংরক্ষণ করে পাকবাহিনীর সম্ভাব্য দোসরদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তারা যাতে নির্বিঘ্নে তাদের কাজ সমাধা করতে না পারে, সেজন্য চোরাগুপ্তা হামলা চালানোর কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। সেভাবে নিজেদের শক্তি বিন্যাস করা প্রয়োজন। কিন্তু এসব কথা না শুনে আওয়ামী লীগের বন্ধুরা মাঠ শত্রুর কাছে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত পলায়ন করে ভারতের পথে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এ পর্যায়ে নগরবাড়ি ঘাট ও তার আশপাশ থেকে যারা ভারতের দিকে পালাতে লাগলো, তাদেরকে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) অনুরোধ করলো দেশের মধ্যে থাকার জন্য। কিন্তু তারা যখন শুনলেন না তখন তাদেরকে হাতিয়ার রেখে যাওয়ার জন্য বলা হলো। অনেকে সানন্দেই হাতিয়ার সমর্পন করলেন, অনেকের কাছ থেকে চাপ দিয়ে হাতিয়ার আদায় করতে হলো। একজনও যাতে হাতিয়ার নিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে

সেজন্য সম্ভাব্য সকল পথে পাহারা বসানো হলো। এভাবে তিন শতাধিক হাতিয়ার উদ্ধার করা হয়, যার মধ্যে ৬টি এলএমজি ছাড়াও অসংখ্য ভাল ভাল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ছিল।

পাবনা শহর থেকে যখন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তারা পাবনার বাংলাদেশ ব্যাংক লুট করে নিয়ে যায়। এ অভিযানের নেতৃত্ব দেয় জেলা প্রশাসক নূরুল কাদের স্বয়ং। পাবনা ত্যাগ করে যাওয়ার সময় পার্টির বিরুদ্ধে দুটি অপপ্রচার চালানো হয় ঃ ১) বাংলাদেশ ব্যাংক পার্টি লুট করেছে, ২) পাকসেনারা যখম নগরবাড়ী ঘাটের ওপর হামলা চালায় তখন পার্টি কোন প্রতিরোধ করেনি, উপরন্তু, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ওপর পিছন থেকে গুলী চালিয়েছে। এটা ছিল নিছক অপপ্রচার। পাকবাহিনী গানবোট নিয়ে নগরবাড়ী অভিমুখে আসছে এটা জানতে পেরেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত বাহিনী পালিয়ে যায়। তবে এ অপপ্রচারের ফলে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত হন। এ বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলা এবং নতুন অবস্থায় নিজেদের শক্তিকে রক্ষা করার জন্য পাবনা জেলা পার্টি কয়েকদিনের সময় নেয়। এ সময় তাঁরা তাঁদের হাতিয়ার ও গোলাবারুদকে পাবনা জেলার বিভিন্ন থানায় ভাগ করে দেন। বাহিনীকেও ছোট ছোট গেরিলা গ্রুপে বিভক্ত করে বিভিন্ন থানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ পর্যায়ে তাঁরা করণীয় নির্ধারণ করেনঃ সামরিক শক্তিকে সংরক্ষণ, প্রচারপত্র বিলি করা এবং পাকবাহিনীর সহায়তাকারীদের ওপর আক্রমণ গড়ে তোলা। পাকবাহিনী পাবনাকে পুনর্দখল করার পরই টিপু বিশ্বাসের বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। একাজে সহায়তা করে জামায়াত ইসলাম-এর জেলা নেতৃবৃন্দ। মওলানা সোবহান এবং মওলানা ইসহাকের নেতৃত্বে দ্রুতই পাকবাহিনীর সমর্থক একটি শক্তিশালী গ্রুপ গড়ে ওঠে। এখানে খুব দ্রুতই রাজাকার ও আলবদর বাহিনী গড়ে তোলা হয়; এ সকল বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যরা। তাদের সাথে যুক্ত হয় কিছু বিহারী যুবক।

পাক সেনাদের সমর্থক স্থানীয় লোকদের নিয়ে গড়ে ওঠা বাহিনী খুব সুপরিকল্পিতভাবে কমিউনিস্ট কর্মীদের বাড়ী ও আত্মীয় স্বজনের ওপর হামলা চালাতে শুরু করে। ২৬ মার্চের পর নিরীহ বিহারীদের ওপর যখন আওয়ামী লীগ কর্মীরা হামলা চালিয়ে হত্যা করেছিল, সে সময় যারা নিরীহ বিহারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার কাজে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল তাদেরকেও রাজাকাররা রেহাই দেয়নি। এই অপরাধে বাম কর্মীদের খুঁজে হত্যা করতে থাকে। এ রকম একজন ছিলেন টিপু বিশ্বাসের স্ত্রীর বড় ভাই ফজলুর রহমান মোল্লা। তিনি ঈশ্বরদীর সাধারণ বিহারীদের জীবন রক্ষার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি বামপন্থী, শুধুমাত্র এ কারণেই রাজাকাব নেতা খোদাবক্স নিজে তাঁকে হত্যা করে।

মে মাসের গোড়া থেকেই রাজাকাররা পরিকল্পিতভাবে টিপু বিশ্বাস ও তাঁর পার্টির লোকজনের ওপর হামলা চালাতে শুরু করে। ১৭ মে তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানেও পার্টির লোকদের ওপর হামলা চালানো হয়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুল মতিনের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং তাঁর পিতাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে পাক আর্মির কাছে হস্তান্তর করলে বৃদ্ধ মানুষ ও একজন নেতার পিতা বিবেচনা করে সম্মানপূর্বক তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু রাজাকারের ঘাতকরা তাঁকে হত্যা করে। এরপর আবদুল মতিনের ছোটভাই পাকবাহিনীর হাতে আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। পাকবাহিনী তাঁর চিকিৎসার ভার রাজাকারদের হাতে অর্পন করে। রাজাকাররা তাঁকে বিনা চিকিৎসায় হত্যা করে। এডোয়ার্ড কলেজ ছাত্র সংসদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান ছিলেন টিপু বিশ্বাসের ঘনিষ্ট বন্ধু এবং পার্টির পাবনা জেলা কমিটির সদস্য। একটি হাটের মধ্য থেকে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় গ্রেফতার করার পর হত্যা করা হয়। পাবনা সদর থানার সালবাড়ীর এক বাড়ীতে হামলা চালিয়ে রাজাকাররা পার্টির চার সৈনিককে হত্যা করে। টিপু বিশ্বাসকে গ্রেফতারের জন্য পাকবাহিনী প্রবলভাবে চেষ্টা চালাতে থাকে। তাঁর দুই আপন বড় ভাই এবং একজন খালাতো ভাইকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের ওপর তীব্র নির্যাতন চলে। এক পর্যায়ে রাজাকাররা তাঁদের হত্যার চক্রান্ত করে। বড় ভাই শরীফ বিশ্বাসের কৌশলী ভূমিকার কারণে তাঁদেরকে রাজাকারের হাতে তুলে না দিয়ে জেলে পাঠানো হয়।

রাজাকাররা কমিউনিস্টদের নিধনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। ফলে পাবনা পার্টিও রাজাকারদের ওপর চরম আঘাত হানতে থাকে। এ অবস্থায় রাজাকার বাহিনী গ্রামাঞ্চলে অভিযান চালানো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। আগষ্ট মাস পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা বলতে পাবনা জেলায় যাঁদের বোঝাতো, তাঁরা ছিলেন টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে। এ পর্যায়ে অন্তত পাঁচজন কৃষক তাদের যুবক ছেলেদের মুক্তিযুদ্ধের কাজে টিপু বিশ্বাসের হাতে তুলে দেন এবং তাঁরা সকলেই বলেন, আমাদের বয়সের কারণে অস্ত্র ধরতে পারছি না, আমার ছেলে যাতে সে কাজ করতে পারে তার সুযোগ যেন দেয়া হয়। অবস্থা এমনই ছিল যে, রাজাকার ও পাকবাহিনী নাজেহাল হয়ে উঠেছে পার্টির আক্রমণে। নতুন কিছু শক্তি এর সাথে যুক্ত হলেই পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের পাবনা থেকে উৎখাত করে দেয়া সম্ভব। জানা গেল, মুজিববাহিনী নামে একদল মুক্তিফৌজ এলাকায় এসেছে এবং তারা প্রচার করছে- মুক্তিযুদ্ধের যাই হোক না কেন, তারা যুদ্ধে যে। দেবে না, তারা এদেশ থেকে নকশালদের উৎখাত করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে। দু'এক দিনে কথাটি সত্যি হিসাবে প্রমাণিত হলো। তারা পাবনা পার্টির বিভিন্ন অবস্থানের ওপর এক তরফা হামলা চালাতে শুরু করলো। আত্মরক্ষার তাগিদ থেকে পার্টি সে সকল হামলা প্রতিরোধ করলো। এতে অনেক

মুজিববাহিনীর সদস্য হতাহত হলো। সে সময় পার্টির প্রচার আর মাও-এর ১০টি সামরিক শৃঙ্খলা অনুযায়ী পার্টি বাহিনী পরিচালিত হওয়ার কারণে পার্টি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় কারো পক্ষেই পার্টিকে আঘাত করে টিকে থাকা সহজ ছিল না। এ পর্যায়ে রাজাকার বাহিনীর সাথে মুজিববাহিনীর একটি অলিখিত চুক্তি হয়ে যায়, রাজাকাররা মুজিববাহিনীর ওপর হামলা করবে না এবং মুজিববাহিনীও রাজাকারদের ওপর হামলা করবে না। তারা উভয়েই পার্টি বাহিনীর ওপর হামলা চালাতে শুরু করলো। মুজিব বাহিনীও উক্ত তিন মাসে পার্টি বাহিনীর ওপর মোট ৫২ বার হামলা চালায়। অনেক সময়ই দু'দিক থেকে একসাথে রাজাকার ও মুজিববাহিনী পার্টির ওপর হামলা চালাতে শুরু করলো। নভেম্বর মাসে পাবনার দাকুনিয়া নামক স্থানে পার্টিবাহিনীর ওপর পাক-আর্মি ও রাজাকার বাহিনী একটি বড় ধরনের হামলা চালায়। পার্টির প্রতিরোধের মুখে তারা পিছু হঠতে থাকে এবং কৌশলগতভাবে খুবই বিপর্যয়ের সম্মুখিন হয়। যুদ্ধের যে পর্যায়ে পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের বিপন্ন করে তোলার সময় এসেছে, ঠিক তখনই পিছন দিক থেকে মুজিববাহিনী পার্টিবাহিনীর ওপর হামলা চালায়। সে হামলাতে জমসেদ বিশ্বাস, আশরাফ ও দেলোয়ারসহ মোট ১৭ জন পার্টিবাহিনী সদস্য নিহত হন। তবে পার্টিবাহিনীর মূল শক্তিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এর পরপরই পাকবাহিনীর পতন হয়। পার্টিবাহিনী তার গোটা শক্তিকে রক্ষা করে। বাহিনীর সহস্রাধিক সদস্যদের মধ্যে যারা পরিচিত নয় তাদেরকে এলাকার বিভিন্ন সমর্থক দরদীর বাড়ীতে রেখে খুব পরিকল্পিতভাবে দেড় শতাধিক নেতাকে নিয়ে টিপু বিশ্বাস নিরাপদ স্থানে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। তবে টিপু বিশ্বাসের ধারণা, মুজিববাহিনী যদি পাবনায় এসে পার্টিবাহিনীর ওপর হামলা না চালাতো, তাহলে পাবনা পার্টিই পাবনাকে কয়েক মাসের মধ্যে মুক্ত ক'রে ফেলতে সক্ষম হত। তাঁর আরো ধারণা, '৭১ সালের যুদ্ধে পাকবাহিনীকে উৎখাতের জন্য ভারত গমনের কোন প্রয়োজন ছিল না, যাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা যুদ্ধ বাদ দিয়ে ভারতে পালিয়ে না গিয়ে দেশে থেকে যদি যুদ্ধ করতেন তাহলে রাজাকার-আলবদর বাহিনী গঠন করা পাক আর্মির পক্ষে অতো সহজসাধ্য হতো না। এবং মুক্তিযুদ্ধের চেহারাটাই অন্যরকম হতো।

একাত্তরের গেরিলা যুদ্ধ ও পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি

মুনীর মোরশেদ

প্রাককথন

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা, সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব, প্রধান দ্বন্দ্বের প্রধান দিক, দ্বন্দ্বের রূপান্তর, নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কেন্দ্রীয় কাজ, বাহিনী গঠন এবং দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ইত্যাকার মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে ১৯৬৭ সালে তৎকালীন ইপিসিপি (এমএল)-এর নেতৃত্বের সাথে ইপিসিপি (এমএল)-এর ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সিরাজ সিকদার এক পরিশীলিত আন্তঃপার্টি সংগ্রাম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু ইপিসিপি (এমএল) নেতৃত্ব তাঁকে চরমভাবে উপেক্ষা করলে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে তরুণ বিপ্লবীরা গঠন করেন 'মাও সেতুঙ চিন্তাধারা গবেষণাগার'। মার্কস-লেনিন-মাও গভীর অভিনিবেশে অধ্যয়ন, তত্ত্বে গভীর সমৃদ্ধি অর্জন, সংশোধনবাদকে সংগ্রাম করা ও পরাস্ত করা এবং একটি সঠিক বিপ্লবী লাইন সৃষ্টি ও বিকাশের জন্য তাত্ত্বিক একাডেমী হিসেবে মূলত মাও সেতুঙ চিন্তাধারা গবেষণাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিরাজ সিকদার ও তাঁর সহযোদ্ধারা 'মাও গবেষণাগারে' ব্যাপকতর অধ্যয়নের অভিজ্ঞতায় পূর্ব বাংলার সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত মূল দ্বন্দ্বগুলো নিরূপন ক'রে প্রণীত করেন এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক থিসিস, যার ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন' গঠনের অনুকূল শর্ত সৃষ্টি হয়। মূল দ্বন্দ্বগুলো ছিলো ঃ ১) পূর্ববাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী ঔপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব; ২) পূর্ববাংলার বিশাল কৃষক-জনতার সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব; ৩) পূর্ববাংলার জনগণের সাথে (ক) সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, (খ) সংশোধনবাদ বিশেষত সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও (গ) ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব; (৪) পূর্ববাংলার বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে শ্রমিক

মুনীর মোরশেদ ঃ গবেষক, এক সময়ের রাজনৈতিক সংগঠক

শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।[১]

আলোচ্য দ্বন্দ্বগুলোর মাঝে প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয় 'পূর্ববাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী ঔপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।'[২] উল্লেখ্য, মাও গবেষণাগারের তরুণ তাত্ত্বিকদের গড় বয়স ও বিপ্লবী অনুশীলনে যথেষ্ট অনভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি ক্ষুদে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ভিত্তির কারণে সিরাজ সিকদার ও তাঁর ঘনিষ্ট সহযোগীরা উপলব্ধি করেন যে, সীমিত সময়ের সীমাবদ্ধতা নিয়ে হঠাৎ করে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা ঠিক হবে না। এটা হবে ভ্রান্তপূর্ণ পদক্ষেপ। বরং প্রথম করণীয় হওয়া উচিত ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে আগতদের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও সুগভীর অনুশীলনের মাধ্যমে শ্রেণী বিচ্যুতি ঘটিয়ে মতাদর্শিকভাবে সর্বহারা শ্রেণীর ক্যাডারে পরিণত করা। একই সাথে বিপ্লবী সংগ্রামের অনিবার্য শর্ত হিসেবে সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগামীদের সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামরিক লাইনগুলো গড়ে তোলা। অন্তবর্তীকালীন এ প্রয়োজনগুলো পূরণের জন্যই গঠিত হয় সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির প্রস্তুতি সংগঠন 'পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন'।

'জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রয়োজন। কারণ, কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দূরদর্শী, নিঃস্বার্থ এবং চূড়ান্তভাবে বিপ্লব চালাতে সবচেয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'- মাও সেতুঙ-এর এই শিক্ষাকে ধারণ ক'রে সূচনা পর্ব থেকেই পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন দৃঢ় শ্রমিক-ভিত্তি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে প্রথম থেকেই গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়ায় '৬৮-র শেষার্ধে বরিশাল শহরসহ ঝালকাঠি, ভোলা, গৌরনদী, মেহেন্দিগঞ্জ, বাউফল, খুলনা শহর ও খালিশপুর শিল্পাঞ্চল, মাদারীপুর, গোয়ালন্দ, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নাগরপুর, ময়মনসিংহ শহর, জামালপুর, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ ও ঢাকা শহরে শ্রমিক আন্দোলনের সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে ওঠে।

বস্তুত '৬৯-র সমগ্র কালপর্বে 'পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন' অবিরত ধারায় চালিয়ে যায় সাংগঠনিক সুসংবদ্ধকরণের কাজ। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে (মেনন গ্রুপ) প্রভূত প্রভাব সৃষ্টি করে শ্রমিক আন্দোলন। এই ছাত্র সংগঠন থেকেই বিরাট সংখ্যক ক্যাডার রিক্রুট হয় এবং অনেকে সার্বক্ষণিক হয়। বরিশাল শহরের ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন ছাড়াও ঝালকাঠির তাঁতী, লবণ, বিড়ি ও ঘাট শ্রমিক, খুলনার খালিশপুরের মিল শ্রমিক, ঢাকার আদমজী মিল শ্রমিক, চট্টগ্রামের চা বাগান শ্রমিক ও দেশের বিভিন্ন স্থানে কাঠমিস্ত্রিদের মাঝে বিকাশ লাভ করে পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর দৃঢ় সাংগঠনিক ভিত্তি।

নবগঠিত পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলন সীমিত আত্মগত শক্তি নিয়ে '৬৯ র আন্দোলনে

সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিনিয়ত আন্দোলনকে লাইনগত প্রক্রিয়ায় সশস্ত্র সংগ্রামে উন্নীত করার প্রয়াস চালায়। '৬৯-র আন্দোলনে পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর নেতৃত্বাধীন বরিশালের ঘাট শ্রমিকরা সূচনা করে এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম। বরিশাল শহরে যুগপৎ সরকারি পুলিশ ও দালাল জামাতীদের সাথে বেঁধে যায় রাস্তায় লড়াই। সারাদিনব্যাপী সমগ্র শহরে খন্ড খন্ড রাস্তার লড়াইয়ে সকল ছাত্র সংগঠনের ছাত্র এবং জনতা ঘাট শ্রমিকদের সাথে অংশ নেয়। এই ঐতিহাসিক লড়াইয়ে ঘাট শ্রমিক ও ছাত্রদের ব্যবহৃত বিষ্ফোরক বোমা নির্ধারক ভূমিকা রাখে। এছাড়া '৬৯-র জানুয়ারি মাসে শ্রমিক আন্দোলন-এর কর্মীরা বরিশালের গ্রামাঞ্চলে নলচিড়া, রামারপোল, গৌরনদী ও ফরিদপুরের মাদারীপুরে কৃষক জনতার ওপর রাষ্ট্রীয় শোষণের আখড়া তহশিল অফিস পুড়িয়ে দেয় এবং আন্দোলন বেগবানের সপক্ষে গণবিরোধী আইয়ুবীয় মৌলিক গণতন্ত্রী মার্কা ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের পদত্যাগে বাধ্য করায়।

১৯৭০ সালের ৫ মে দুনিয়ার নিপীড়িত সর্বহারা শ্রেণীর মহান নেতা কার্ল মার্কসের জন্মবার্ষিকীতে তৎকালীন পাকিস্তান কাউন্সিলে পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর পক্ষ থেকে প্রতীকী বোমা নিক্ষেপ করা হয়। একই বছরের অক্টোবর মাসে বি.এন.আর (জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো) ও মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে বোমা বর্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, পাকিস্তান কাউন্সিল ও বি.এন.আর. ছিল পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর অপসংস্কৃতির প্রচারণা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধাচারণ করা হতো এবং তথাকথিত অখন্ড পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির ভাবধারা প্রচার করা হতো। '৭০-এর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ গণবিরোধী প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে বোমা হামলা ছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতীকী সশস্ত্র আক্রমণ।

'৭০-এর মধ্যবর্তী সময় থেকে চট্টগ্রামে চা বাগানগুলোতে বিশেষত সাঁওতাল শ্রমিকদের মাঝে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর ভালো কাজ গড়ে ওঠে। '৭০-এর শেষদিকে সর্বপ্রথম জাতীয় শত্রু উচ্ছেদের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ শুরু ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সূত্রাবদ্ধ করে বাহিনী গঠনের প্রাক-অনুশীলন চালানো হয়। চা বাগান শ্রমিকদের দাবিতে অপারেশন-লক্ষ্য নির্ধারিত হয় ফটিকছড়ি চা বাগানের অত্যাচারী সহকারী ম্যানেজার হারু বাবু। দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত চা শ্রমিক গেরিলারা এ অপারেশনে অংশ নেয়। গেরিলাদের আক্রমণে হারু বাবু মারাত্মকভাবে আহত হয়, কিন্তু প্রাণে বেঁচে যায়।

১৯৭১ সালের ৮ জানুয়ারি পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ববাংলার জনগণের ওপর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার আহ্বান সম্বলিত এক লিফলেট প্রকাশিত হয়। আসন্ন মুক্তিযুদ্ধকে উঠতি বাঙালি পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণ বিরোধী 'দীর্ঘস্থায়ী

বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধে' রূপান্তরিত করার জন্য পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বামপন্থীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানায়। শুধু তাই নয়, এই মুক্তিযুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধে পরিণত করার জন্য প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক পার্টি, শ্রেণী, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের বাস্তবতায় পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন 'শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের কাছে খোলা চিঠি' শিরোনামে একটি লিফলেট প্রচার করে। এই খোলা চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে আহ্বান জানানো হয় যে, 'পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত স্বাধীন করা ব্যতীত ৬ দফা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।' এই লিফলেটে অসহযোগ আন্দোলনের ভুল পথ পরিত্যাগ ক'রে স্বদেশের মাটি ও মানুষকে আঁকড়ে ধরে আত্মনির্ভরশীলভাবে দীর্ঘস্থায়ী মুক্তিযুদ্ধের পথ গ্রহণ কবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। একই সাথে সকল স্তরে, শ্রেণী ও পেশার দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের আহবান জানানো হয়।

কিন্তু উঠতি বাঙালি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি শেখ মুজিব এতে কমিউনিস্টদের গন্ধ টের পান এবং ক্ষমতা হাত ছাড়া হওয়ার প্রশ্নে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ১৯৭১ সালের মার্চে সংবাদ সংস্থা এএফপি'র প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাতকারে শেখ মুজিব বলেন ঃ 'পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার কী এটা বোঝে না যে, আমিই হলাম একমাত্র ব্যক্তি যে পূর্ব পাকিস্তানকে কমিউনিজমের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। তারা যদি লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেন তবে আমি ক্ষমতাচ্যুত হবো এবং আমার নামে নকশালরা নেমে পড়বে। বেশি ছাড় দিলে আবার কর্তৃত্ব হারাবো। খুব মুশকিলে আছি আমি।'[৩]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ শহরগুলোতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আক্রমণের ফলে শহরাঞ্চলে পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর শাখাসমূহ ও বিভিন্ন জেলা শাখা কেন্দ্র থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলন-এর সুনির্দিষ্ট রণনীতি ও রণকৌশল এবং কেন্দ্রীয় গাইড লাইন থাকার কারণে সাময়িক বিচ্ছিন্ন শাখাগুলো আত্মনির্ভরশীলভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলে।

বাংলার ইয়েনান পেয়ারা বাগান ও পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী গঠন (৩০ এপ্রিল ১৯৭১)

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কেন্দ্রীয় কাজ বাহিনী গঠন ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং আত্মনির্ভরশীল জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সূচনার তাগিদ নিয়ে পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদের সম্পাদক সিরাজ সিকদার '৭১-এর এপ্রিলের প্রথমার্ধে ঢাকা থেকে কেরানীগঞ্জ থানা দিয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ি থানা হয়ে পার্শ্ববর্তী লৌহজং থানার পদ্মা তীববর্তী রানাদিয়া গ্রামে যান। গাইড হিসেবে সে সময় তাঁর সাথে ছিলেন পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং ঐ রানাদিয়া গ্রামেব অধিবাসী

মুজিবর রহমান ওরফে কালো মুজিব।

সে সময় পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন, মুন্সীগঞ্জ শাখার পরিচালনায় লৌহজং-এর রানাদিয়া, গাঁওদিয়া, দক্ষিণ চারগাঁও নওপাড়া, রুসদি ও কোলা গ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, শুভার্থী, সমর্থক ও জনগণের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ চলছিল। এই প্রশিক্ষণের নেতৃত্বে ছিলেন মুন্সীগঞ্জ শাখার পরিচালক মজিদ ওরফে নাসির এবং স্থানীয় নেতা রফিক ওরফে শাজাহান তালুকদার।

এই রানাদিয়া গ্রামে সিরাজ সিকদার সপ্তাহ খানেক অবস্থান করেন মূলত শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিশালী অঞ্চল বরিশাল পৌঁছার উদ্দেশ্যে নিরাপদ পথের অনুসন্ধানে। সপ্তাহ খানেক পর নিরাপদে বরিশাল যাওয়ার সম্ভাব্য পথের খোঁজ খবর নিয়ে সিরাজ সিকদার গাইড কালো মুজিবসহ পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে পায়ে হেঁটে মাদারীপুর, কালকিনী হয়ে '৭১-এর ১৮ এপ্রিল বরিশাল পৌঁছেন। বরিশাল জেলা তখন পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর অগ্রসর অঞ্চল হিসেবে খ্যাত এবং ঐ জেলার নেতৃত্বে ছিলেন মাহতাব ওরফে রামকৃষ্ণ পাল।

২৪ এপ্রিল সিরাজ সিকদার বরিশাল জেলার পরিচালক মাহতাব ওরফে রামকৃষ্ণ পাল, নেতৃস্থানীয় কর্মী ফজলু ওরফে সেলিম শাহনেওয়াজ এবং ঝালকাঠির মুজিবকে নিয়ে বরিশাল থেকে ঝালকাঠি পৌঁছেন। উদ্দেশ্য ছিল নদীমাতৃক বরিশাল জেলার সুদীর্ঘ ৭২ মাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ পেয়ারা বাগানে গেরিলা যুদ্ধের অস্থায়ী প্রকৃতির কেন্দ্রীয় ঘাঁটি স্থাপনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে দেখা।

ইতোপূর্বে পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলন-এর পূর্বনির্ধারিত কেন্দ্রীয় গাইডের ভিত্তিতে পলাতক ইপিআর ও পুলিশের কাছ থেকে সংগৃহীত অস্ত্র দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের বরিশাল জেলার নেতৃত্বে পেয়ারা বাগানে গঠিত হয়েছে বেশ কিছু গেরিলা গ্রুপ।

ঝালকাঠি পৌঁছার সাথে সাথেই ঝালকাঠি থানার তৎকালীন ওসি মুহম্মদ শফিক থানার সমুদয় অস্ত্র সিরাজ সিকদারের নিকট অর্পণ করেন। ঐ দিন সিরাজ সিকদার এবং তার সফরসঙ্গীরা স্পীডবোট যোগে পেয়ারা বাগান এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের সম্ভাব্যতা চূড়ান্ত করে দিনগত রাতেই কয়েক হাজার মন চাল,ডাল, লবণ, গুড়, চিনি ও কয়েকশো নৌকা সংগ্রহ করে পেয়ারাবাগানে প্রেরণ করেন।

১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর ত্রিমুখী আক্রমণে বরিশাল শহরের পতন ঘটলে শহরের মানুষ দলে দলে বরিশালের গ্রামাঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের বহু নেতা ও কর্মী পেয়ারা বাগানের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ ও গৌরনদী থানাধীন শ্রমিক আন্দোলনের নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলোতে আশ্রয় নেয়। শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী ও জনগণ এই পলায়নপর আওয়ামী নেতা, কর্মী ও জনগণকে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আশ্রয় দেয় এবং থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে।

বরিশাল শহরে কর্মরত পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর নেতৃস্থানীয় কর্মী বরিশালের গৌরনদীর অধিবাসী আতাউর ওরফে খোরশেদ আলম খসরু বরিশাল শহরে কর্মরত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মীসহ প্রথমে সুগন্ধিয়া'য় পশ্চাদপসরণ করেন। সেখান থেকে কর্মীদের পেয়ারা বাগানে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তিনি নিজ গ্রাম গৌরনদীর হোসনাবাদে চলে যান ভোলা ও বরিশাল জেলার অন্যান্য এলাকার কর্মীদের পেয়ারা বাগানে সমাবেশিত করার জন্য। ২৬ এপ্রিল '৭১-এ পেয়ারা বাগানে পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর বরিশাল জেলার সমস্ত কর্মী ও গেরিলাদের সমাবেশিত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৩০ এপ্রিল সিরাজ সিকদারের স্ত্রী, কথাশিল্পী ও পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর নেতৃস্থানীয় কর্মী বেগম জাহানারা পেয়ারা বাগান এলাকায় পৌঁছলে ঐদিনই পেয়ারা বাগানে সমবেত পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, গেরিলা ও লক্ষাধিক জনসাধারণের এক ঐতিহাসিক সমাবেশে গঠিত হয় পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর নেতৃত্বাধীন 'পূর্ববাংলা জাতীয় মুক্তিবাহিনী'। কারণ- পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই উপলব্ধি করে যে, জনগণের সেনাবাহিনী ব্যতীত জনগণের কিছুই নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্দুকের নলের মধ্য দিয়েই জন্মলাভ করে। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পার্টির বিকাশ, সুসংবদ্ধতা ও বলশেভিকরণ সম্ভব। সশস্ত্র বাহিনী হচ্ছে পার্টির অধীন প্রধান ধরনের গণসংগঠন। শ্রমিক আন্দোলন আরো উপলব্ধি করে যে, গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমেই জনগণকে জাগরিত, সংগঠিত ও জনগণের শক্তিকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়।[৪]

উদ্বোধনী বক্তৃতায় সিরাজ সিকদার প্রধান শত্রু পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার লক্ষ্যে পাক সামরিক ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের নিজস্ব সেনাবাহিনী দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র গঠনের পথে অন্যান্য প্রতিবন্ধক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ-এর আগ্রাসন সম্পর্কেও সতর্কতামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করে ভবিষ্যতে উদ্ভূত পরিস্থিতির রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করেন। এরপর তিনি উপস্থিত কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে গঠন করেন 'পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী।' একটি কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে বাহিনী পরিচালনার জন্য গঠন করা হয় 'সর্বোচ্চ সামরিক পরিচালকমন্ডলী।' এর সভাপতি নির্বাচিত হন সিরাজ সিকদার। সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন ফজলু ওরফে সেলিম শাহনেওয়াজ, মাহতাব ওরফে রামকৃষ্ণ পাল এবং বেগম জাহানারা প্রমুখ।

ভৌগোলিকভাবে পূর্ববাংলা যেহেতু সমতল ভূমির এলাকা এবং উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত সরকারি বাহিনীর পক্ষে যেহেতু অধিকাংশ এলাকায় প্রবেশাধিকার সহজসাধ্য, সেহেতু 'ঘাঁটি এলাকার স্থায়ীত্ব ক্ষণস্থায়ী' এবং বিপরীতে জনগণ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে 'চলমান

গেরিলা যুদ্ধ'-এর বাস্তবতায় পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী সূচনা করে গেরিলা যুদ্ধ।

সামরিক কাঠামো ও গেরিলা যুদ্ধের স্বরূপ

বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলের ৪টি থানা ঝালকাঠি, বানারিপাড়া, স্বরূপকাঠি ও কাউখালির ৬২টি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এই পেয়ারা বাগান। এর বিস্তৃতি ৭২ মাইল। '৭১-এর ২ মে এই পেয়ারা বাগান স্থাপিত হয় পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘাঁটি। যা ১নং ফ্রন্ট এরিয়া হিসেবে পরিচিত ছিলো। এর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয় ভিমরুলীতে। অন্যান্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দফতর স্থাপিত হয় আটঘর, কুরিয়ানা, পূর্ব জলাবাড়ি, বাউকাঠি, কীর্ত্তিপাশা ও ডুমুরিয়ায়। পেয়ারা বাগান বা ১নং ফ্রন্ট এরিয়ার পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন বেগম জাহানারা (সভাপতি ও রাজনৈতিক কমিশার), ফজলু (সদস্য ও কমান্ডার), মাহতাব (সদস্য) এবং মুজিব (সদস্য ও গণসংযোগ সমন্বয়ক)।

পেয়ারা বাগান ঘাঁটি এলাকা বা ১নং ফ্রন্ট এরিয়াকে ৮টি গেরিলা সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

ঘাঁটি এলাকায় বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডার ও গেরিলাদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ভিমরুলীতে স্থাপিত হয় সামরিক স্কুল। এই স্কুল প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করতেন সিরাজ সিকদার। ঘাঁটি এলাকার গণসংযোগ কমিটিতে ছিলেন ঝালকাঠির মুজিব (সভাপতি), মনিকা (সদস্য), আতাউর ওরফে খসরু (সদস্য)। উল্লেখ্য, আতাউর ওরফে খোরশেদ আলম খসরু সারাদিন ৩নং সেক্টর (আটঘর) পরিচালনা করে রাতে গণসংযোগ বিভাগে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতেন। গণসংযোগ বিভাগের দায়িত্ব ছিলো দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা, গ্রামে শান্তিশৃংখলার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে গ্রাম পরিচালনা কমিটি ও গ্রামরক্ষী ইউনিট গঠন। মধ্য মে'তেই এসব কাজ সফলতার সাথে সুসম্পন্ন হয়।

ঘাঁটি এলাকার সাথে ঢাকার সংযোগ রক্ষা করতেন সুলতান ওরফে মাহবুব। ঘাঁটি এলাকায় জনগণের সাথে গভীরভাবে মেশা ও জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা এবং মাওসেতুঙ নির্দেশিত তিনটি বৃহৎ শৃংখলা যথাক্রমে ঃ

১. সকল কার্যক্রিয়ার আদেশ মেনে চলুন।

২. জনসাধারণের কাছ থেকে একটি সূচ কিংবা সূতোও নেবেন না।

৩. দখলকৃত সমস্ত জিনিস জমা দেবেন এবং মনোযোগ দেবার আটটি ধারা যথাক্রমে ঃ ১) ভদ্রভাবে কথা বলুন, ২) ন্যায্যমূল্যে কেনাবেচা করুন, ৩) ধার করা প্রতিটি জিনিস ফেরত দিন, ৪) কোনো জিনিস নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ করুন, ৫) লোককে মারবেন না,গাল দেবেন না, ৬) ফসল নষ্ট করবেন না, ৭) নারীদের সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করবেন না, এবং ৮) বন্দী সৈন্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না' ইত্যাদি কঠোরভাবে পালিত হতো। ফলে কোনো কর্মী বা গেরিলা সারাদিন অনাহারে থাকলেও গাছ থেকে পেড়ে একটি পেয়ারাও খেতেন না।

সারণি ১ ঃ পেয়ারা বাগান ঘাঁটি এলাকার গেরিলা সেক্টরসমূহ ও পরিচালকমন্ডলী			
সেক্টর নং	সেক্টর এলাকা	রাজনৈতিক কমিশার	কমান্ডার
১.	কীর্ত্তিপাশা	পণ্ডিত ওরফে নুরুল ইসলাম	ভবরঞ্জন
২.	শতদশকাঠি	সেলিম ওরফে হিরু	মনসুর
৩.	আটঘর	আতাউর ওরফে খোরশেদ আলম খসরু	রনজিত
৪	বাউকাঠি	আসাদ	আনিস
৫	পশ্চিম জলাবাড়ি	ফকু চৌধুরী	শ্যামল
৬	কুরিয়ানা	রেজাউল	মানিক
৭	আতা	ফিরোজ কবির	মিলু
৮	পূর্ব জলাবাড়ি	মান্নান	শাহজাহান

'৭১-এর ৭ মে পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি এলাকার নিয়মিত গেরিলা বাহিনীর সাথে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এক মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দেন সিরাজ সিকদার। ৭ মে কীর্ত্তিপাশা নদী দিয়ে পাক সেনারা পেয়ারাবাগানের গ্রামসমূহে প্রবেশ করে। সারাদিন লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ ক'রে বিকেলে লঞ্চযোগে ফেরার পথে শতদলকাঠি এলাকায় ৮টি গেরিলা সেক্টরের সমস্ত গেরিলা একত্রিত হয়ে সিরাজ সিকদারের সরাসরি কমান্ডে ২০ গজ দূর থেকে আক্রমণ চালিয়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী সৈন্যদের সমূলে ধ্বংস করে। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিহতের সংখ্যা ছিলো ২৪ জন এবং হতাহতের সংখ্যা অসংখ্য। জাতীয় মুক্তিবাহিনী প্রথম যুদ্ধেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রচুর আধুনিক অস্ত্র দখল করে।

পেয়ারা বাগানে পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানী বাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠে। '৭১-এর বরিশালের আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ভারতে আশ্রয় নেয়। বরিশাল শহরে সংকটমুক্ত পাকিস্তানী বাহিনী তখন পেয়ারা বাগান

আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। খুলনা, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলা থেকে প্রায় এক বিগ্রেড সৈন্য পেয়ারা বাগানের চতুর্দিকে নিয়োজিত করা হয়। এ সময় পেয়ারা বাগানের ৭২ মাইলব্যাপী মুক্ত এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ শরণার্থী আশ্রিত ছিলো। পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন ও পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী তাদের সামগ্রিক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে। এ সময় পেয়ারা বাগানের অভ্যন্তরে কলেরা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী ও গেরিলারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা মোকাবেলা করে।

অনুশীলনগত সামরিক লাইনের প্রক্রিয়ায় পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর নেতৃত্বাধীন পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী কয়েক লক্ষ লোক অধ্যুষিত প্রায় ৪৮টি গ্রামে অস্থায়ী প্রকৃতির 'মুক্ত এলাকা' গঠন করে। নিয়মিত গেরিলা ইউনিট, বাহিনী, গ্রামরক্ষী ইউনিট ও স্থানীয় গেরিলা গ্রুপ গঠনের সাথে সাথে সেখানে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা হয়। স্থানীয় জনগণকে কৃষক মুক্তি সমিতি, নারী মুক্তি সমিতিসহ বিভিন্ন গণসংগঠনে সংগঠিত করা হয়। '৭১-এর সংগ্রামে পেয়ারা বাগান 'বাংলার ইয়েনান' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ববাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম পেয়ারা বাগানে গড়ে ওঠে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী ' পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী।' এই অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার সময় পার্টি নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলা, সামরিক বাহিনীর মধ্যকার রাজনৈতিক-সামরিক পার্টি কাজ, রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম, ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে জাতীয় শত্রুর ভূমি বিতরণ করা, গেরিলা যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করা এবং অন্যান্য বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করে। এর ফলে পূর্ববাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম গড়ে ওঠে ঘাঁটি এলাকা। এ সকল অভিজ্ঞতা বিপ্লবী পার্টির জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র পূর্ববাংলায় ও ভারতে পেয়ারা বাগানের সংগ্রাম একটি রূপকথার সৃষ্টি করে। এ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর কর্মীরা বিপ্লবী অনুশীলনে পোড় খায়, সশস্ত্র বাহিনী ও ঐক্য ফ্রন্ট গড়ে ওঠে। এভাবে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামরিকভাবে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা বস্তুগত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সামগ্রিক ভূমিকা (৩ জুন ১৯৭১-১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১)

'৭১-এ গেরিলা যুদ্ধের বারুদের মধ্যেই পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির জন্ম। পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি সংগঠন পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে সম্পৃক্ত কর্মীরা অবিরাম শ্রেণীচ্যুতির ভেতর দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর মতাদর্শ ও ব্যাপকতর সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় একটি পূর্ণাঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সুতরাং দ্বিতীয় স্তরের (শ্রমিক আন্দোলন) বেগবান ধারায় তৃতীয় স্তরে পার্টি গঠনের বস্তুগত শর্তটি সামনে এসে যায়। পার্টি গঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে সিরাজ সিকদারের চিন্তা ও মননে মাও সেতুঙ-এর পার্টি, বাহিনী, ফ্রন্ট এই বিপ্লবী তত্ত্বটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বিশেষতঃ মাও সেতুঙ চিন্তাধারার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সিরাজ সিকদারের এ অবদান ও শিক্ষা ছাড়া, এগুলোর ভিত্তি সংগঠনের দৃঢ়পণ সংগ্রাম ছাড়া পার্টির এ অভ্যুদয় ছিলো অসম্ভব।[৭]

পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর ঘেরার ভেতরেই পেয়ারা বাগানে সম্মেলনেব কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন গ্রুপ মিটিং-এর মাধ্যমে সকলে একমত পোষণ করেন যে, পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন এর ভূমিকা সমাপ্ত হয়েছে। এখন সর্বহারা শ্রেণীর একটি পূর্ণাঙ্গ পার্টি গঠন হওয়া খুবই জরুরী। ২ জুন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একটি সম্পূর্ণ বিগ্রেড পেয়ারা বাগানের চতুর্দিক ঘেরাও ক'রে ফেলে এবং পেয়ারা বাগানের অভ্যন্তরে মর্টার নিক্ষেপ করতে থাকে। পেয়ারা বাগান ধ্বংস করার পাকিস্তানী প্রচেষ্টার মধ্যেই শুরু হয় নতুন প্রজন্মের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার নিবিড় উদ্যোগ। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলন-এর বিপ্লবী পরিষদের সহ-সম্পাদক তাহের ওরফে শামিউল্লাহ আজমীসহ পাবনা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ শাখার প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কিন্তু পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর রণনীতি ও রণকৌশল বিষয়ক পূর্বনির্ধারিত দলিল এবং কেন্দ্রীয় গাইড লাইনের ভিত্তিতে এসব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জেলা শাখা বাহিনী গঠন করে এপ্রিল মাস হতেই গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অথচ সে সময় হক- তোয়াহার ইপিসিপি (এমএল), দেবেন-বাশারের পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, মতিন-আলাউদ্দিনের পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) ও কাজী জাফর-মেনন-এর কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটির কোনো কেন্দ্রীয় গাইড লাইন না থাকায় উল্লেখিত পার্টিসমূহের একেক জেলা কমিটি একেক রণনীতি প্রয়োগ করে। কেউ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ, আবার কেউ জাতীয় প্রশ্ন অবজ্ঞা করে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে সমঝোতা গড়ে তোলে। কেউ সামন্তবাদকে প্রধান শত্রু হিসেব চিহ্নিত ক'রে ভ্রান্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। আবার অনেকেই বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মনির্ভরশীল যুদ্ধ সূচনার পরিবর্তে বাঙালি উঠতি পুঁজিপতিদের প্রতিভূ আওয়ামী লীগ ও সংশোধনবাদী মনি সিং- মোজাফফরদের মতো ভারতে পালিয়ে যায়।

সম্মেলনে নতুন পার্টির নামকরণে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কিন্তু সিরাজ সিকদারের প্রস্তাবকৃত 'পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি' নামটিই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনে নবগঠিত পার্টির একটি আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়। আহবায়ক নির্বাচিত হন সিরাজ সিকদার। আহবায়ক কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন তাহের ওরফে শামিউল্লাহ আজমী, ফজলু, মাহতাব, বেগম জাহানারা ও মুজিব (ঝালকাঠি) প্রমুখ।

বিবিধ প্রতিকূলতায় পেয়ারা বাগানের ঘাঁটি অঞ্চলে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি প্রতিষ্ঠার পর পরই শুরু হয় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ধ্বংসপণ সামরিক অ্যাকশন। 'ঘিরে ফেলো ও দমন করো' রণকৌশলের ভিত্তিতে প্রায় এক বিগ্রেড পাকিস্তানী সৈন্য কাউখালি, ঝালকাঠি,

স্বরূপকাঠি, বানারিপাড়া থেকে হাজার হাজার লোক ধরে এনে পেয়ারা বাগান কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়। এ ক্ষেত্রে উপযাচক হিসেবে কাজ করে রাজাকার নেতা শর্ষীনার পীরের মাদ্রাসার ধর্মান্ধ রাজাকার ছাত্ররা। পেয়ারা বাগানের চতুর্দিকে প্রবাহমান কুরিয়ানা, গাবছান, বাউকাঠি নদীতে ৩৫টি স্পীডবোট ও সন্ধ্যা নদীতে ২টি গানবোট দিন-রাত পাহারায় থাকে; যাতে কেউ পেয়ারা বাগান হতে বের হতে না পারে। বহমান নদীগুলোতে চলমান পাহারাকে কভারে রেখে পাকসেনারা প্রায় ৫০০ গজ পর পর ক্যাম্প স্থাপন করে।

প্রতিদিন পেয়ারা গাছ যতোটুকু কাটানো সম্ভব হয়, ততোটুকু ক্যাম্প এগিয়ে আনে পাকসেনারা। এভাবে প্রায় ৫ দিন চলে। আমরা ক্রমশই তাদের মুঠোর মধ্যে চলে আসছিলাম। ইতোমধ্যে প্রায় তিন-চার হাজার মানুষ নিহত হন।

৯ জুন পার্টি সিদ্ধান্ত নেয়, ঘেরাও অভিযানকে কৌশলগত আক্রমণের মাধ্যমে ভেঙ্গে ফেলে কর্মী, গেরিলা ও জনগণ নিয়ে ঘেরাও বলয় থেকে বেরিয়ে আসার। পাকবাহিনী ভেবেছিল আমরা সন্ধ্যা নদী পার হওয়ার ঝুঁকি নেবো না। কারণ, সন্ধ্যা নদী প্রচন্ড খরস্রোতা ও প্রায় ২ মাইল চওড়া। গাবখান ও বাউকাঠি নদী ভৌগোলিকভাবে অসুবিধাজনক। কারণ, ঝালকাঠি থেকে পাঁচ-সাত মিনিটে এখানে ফোর্স সমাবেশ সম্ভব। এসব কারণে পাকবাহিনী কুরিয়ানা নদীর ওপর বিশেষ জোর দেয়। তারা মনে করে আমরা কুরিয়ানা দিয়ে বের হবার চেষ্টা করবো। ৯ জুন রাতে সিরাজ সিকদার কমান্ডারদের নিয়ে সভা করেন। সিদ্ধান্ত হয়, আমরা সন্ধ্যায় নদী পেরুবো। কিন্তু আক্রমণ করবো কুরিয়ানা ও সন্ধ্যা নদীর মিলনস্থানের কাছাকাছি কোনো ক্যাম্পকে। এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য কমরেড মান্নান, রণজিত ও সোহেলকে নিয়ে ছোট একটি সুইসাইড স্কোয়াড গঠিত হয়। সব গেরিলা, কমান্ডার, এমনকি সিরাজ সিকদারও চেয়েছিলেন এই স্কোয়াডে যোগ দিতে।

১০ জুন রাত ৯ টার দিকে গেরিলারা কুরিয়ানার পাকসেনাদের ক্যাম্প আক্রমণ করে। আক্রমণের সাথে সাথে সমস্ত স্পীডবোট ও গানবোট হামলার স্থানে আসে। রাতের আঁধারে পাক সেনারা বের হওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে যার যার অবস্থান থেকে গুলী করতে থাকে। ফলে গানবোটের সার্চলাইট-মুক্ত হয় সন্ধ্যা নদী। এ সময় অসংখ্য ছিপ নৌকায় প্রায় লক্ষাধিক জনগণ, কর্মী, গেরিলা সন্ধ্যা নদী পার হন। সেখান থেকে গাভারামচন্দ্রপুর হয়ে গুইঠ্যা থেকে সুগন্ধিয়ায় সহানুভূতিশীলদের বাড়িতে এসে ওঠেন। এখান থেকেই গেরিলাদের বিভিন্ন দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। গেরিলাদের একটি গ্রুপ গুঠিয়া আসে। তাদের নিয়ে কমরেড আতাউর গৌরনদী চ'ল যান। যা পরবর্তীতে ২নং ফ্রন্ট এরিয়া গঠনে বিপুল অবদান রেখেছিল। সেলিম শাহনেওয়াজ ও কমরেড হিরু কিছু কর্মী, গেরিলা নিয়ে মঠবাড়িয়া চলে যান এবং নতুন আরেকটি সেক্টরের পত্তন করেন। কমরেড পন্ডিত ও ফিরোজ কবির কিছু কর্মী, গেরিলা নিয়ে পেয়ারা বাগানের আশেপাশে অবস্থান নেয়। মূলত প্রধান অংশই পেয়া'া বাগানের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান নেয় এবং বাকী

অংশ অন্যান্য ফ্রন্ট ও সেক্টর গঠনে বা তার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৮]

পাকিস্তানী আধুনিক সামরিক বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণের চাপে কৌশলগত কারণে পশ্চাদপসরণের বাস্তব প্রয়োজনীয়তায় ঘাঁটি এলাকার বিলুপ্তি ঘটে এবং ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে সংগতি রেখে জনগণের ওপর নির্ভরশীল চলমান গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় শুরু হয় দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ।

যুদ্ধের মাধ্যমে যুদ্ধ শিক্ষার অভিজ্ঞতার আলোকে সমতল ভূমির দেশে জনগণ-নির্ভর চলমান গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় বাহিনী ছড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে দেশের প্রায় সর্বত্র নতুন নতুন ফ্রন্ট এরিয়া গড়ে ওঠে। উল্লেখ্য, পেয়ারা বাগানে ঘাঁটি - এলাকা গঠনের পূর্বেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পাবনা, টাঙ্গাইল, সাভার, ময়মনসিংহ চট্টগ্রামে পূর্বনির্ধারিত কেন্দ্রীয় গাইড লাইনের ভিত্তিতে বিভিন্ন ফ্রন্ট গড়ে ওঠে এবং গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে।

'৭১-এর ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকবাহিনী নিরস্ত্র জনগণের ওপর সর্বাত্মক নৃশংস সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করার পর পরই সারা দেশব্যাপী জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সাথে সাথেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পূর্ব প্রদত্ত গাইডের ভিত্তিতে অঞ্চলের স্থানীয় নেতৃত্বরা অস্ত্র সংগ্রহ ও তা রক্ষা করার উদ্যোগ নেন, প্রচেষ্টা চালান। নজরুল, বাতেন ও হকের এলাকায় কিছু পরিমাণে অস্ত্র সংগৃহীত হয়। এ সময়ে কেন্দ্রীয় লাইনের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির একটি দল টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে পাবনা শহর দখল করে। এ লড়াইয়ে কমরেড বাতেনসহ পার্টির কয়েকজন অংশগ্রহণ করেন এবং কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময়ে পার্টির একক উদ্যোগে পাবনার সাঁথিয়া থানা অপারেশনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। গেরিলা সমাবেশ করা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অপারেশন স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীতে টিপু বিশ্বাস গ্রুপের একাংশের সাথে যৌথভাবে সাঁথিয়া থানা অপারেশন করা হয়। থানাকে সারেন্ডার করানোর পর টিপু গ্রুপের অংশগ্রহণকারী একাংশের হঠকারিতার জন্য সফলতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মার্চের ঘটনাবলীর ফলশ্রুতিতে অনেক শাখার মতো অঞ্চলটিও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সকল তৎপরতা স্থানীয় নেতৃত্বরাই চালাচ্ছিলেন পূর্বে দেয়া কেন্দ্রীয় মূল গাইডের ভিত্তিতে। সাঁথিয়া অপারেশনের ব্যর্থতার পর পাবনা শাখার পরিচালক বাতেনের সাথে পরবর্তী নেতৃত্ব মতিন প্রমুখের মধ্যকার সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মে মাসের প্রথম দিকে মাসুদের মাধ্যমে অঞ্চলের একটি অংশের সাথে কেন্দ্রের যোগাযোগ হয় এবং পেয়ারা বাগানে অনুষ্ঠিতব্য পার্টি গঠনের প্রস্তুতি কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের পাঠানোর জন্য শাখার প্রতি আহবান জানানো হয়। কিন্তু মে মাসের শেষ দিকে পেয়ারা বাগানের ওপর পাকবাহিনীর প্রচন্ড ঘেরাও-দমন অভিযানের কারণে আরো কয়েকটি শাখার মতো এ অঞ্চলেও কোনো প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেননি।

জুনের শেষ বা জুলাইয়ের প্রথম দিকে আতিক ওরফে চঞ্চল-এর মাধ্যমে পাবনার মতিনদের সাথে কেন্দ্রের যোগাযোগ হয়। তখনো বাতেনদের সাথে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলো। এ সময়ে এ শাখা শ্রমিক আন্দোলন-এর নামেই তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলো। আতিক তাদেরকে পার্টি গঠন ও অন্যান্য বিষয়ে অবহিত করেন।[৯]

পুনর্গঠিত ১নং ফ্রন্ট এরিয়া

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরাটাকারের ঘেরাও-দমনের প্রেক্ষিতে পেয়ারা বাগানের অস্থায়ী ঘাঁটির বিলুপ্তি ঘটলেও এই পেয়ারা বাগান বা ১নং ফ্রন্ট এরিয়া চলমান গেরিলা যুদ্ধের ফ্রন্ট এরিয়া হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। পুনর্গঠিত ১নং ফ্রন্ট এরিয়ায় অন্তর্ভূক্তি হয় ববিশালের বানারীপাড়া, পিরোজপুর, স্বরূপকাঠি, ঝালকাঠি, পাথরঘাটা, মঠবাড়িয়া। এই পর্বে ফ্রন্ট এরিয়ার পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন হিরু এবং ফিরোজ কবির। ১নং ফ্রন্ট এরিয়ার ঘেরাও-দমন উঠে গেলে গেরিলারা গেরিলা যুদ্ধকে কাউখালি, রাজাপুর, স্বরূপকাঠি, ঝালকাঠি, বরিশাল সদর থানার বিস্তৃত এলাকায় সম্প্রসারিত করে। ইতোমধ্যে পাঁচজন গেরিলা বরিশালের দক্ষিণাংশে মঠবাড়িয়া অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ বিস্তৃত করে। অচিরেই পাথরঘাটা, খেঁপুপাড়ায় গেরিলা যুদ্ধ সম্প্রসারিত হয়। পাঁচজন থেকে গেরিলা সংখ্যা কয়েকশোতে পৌঁছে এবং পাঁচটি রাইফেল থেকে ৮০টি রাইফেল ও বন্দুক সংগৃহীত হয়।[১০]

২নং ফ্রন্ট এরিয়া

গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ১নং ফ্রন্ট এরিয়া থেকে মাহতাব ওরফে রামকৃষ্ণ পাল, শাহীন আলম, আতাউর-এর নেতৃত্বে কয়েকটি গেরিলা ইউনিট ও বেশ কিছু কর্মী বরিশালের উত্তরাঞ্চলে চলে আসেন এবং গৌরনদী থানার হোসনাবাদ গ্রামে কেন্দ্র স্থাপন করেন। এদের নেতৃত্বে গৌরনদী থানাসহ বাবুগঞ্জ, হিজলা, মুলাদী, মেহেন্দিগঞ্জ এবং বর্তমান শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট, ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ থানা ও বর্তমান মাদারীপুর জেলার কালকিনী, মাদারীপুর সদর, পালং, নড়িয়া ও জাজিরা থানা নিয়ে বিশাল বিস্তৃত ২নং ফ্রন্ট এরিয়া গঠিত হয়।

গৌরনদী অঞ্চলে কর্মী ও গেরিলারা বহু জাতীয় শত্রু খতম করে এবং পাতারহাট, মেহেন্দিগঞ্জ, উজিরপুর, ধামুরা, মুলাদী, বাবুগঞ্জ, হিজলা, বামনা, গলাচিপাসহ বিস্তৃত এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ সম্প্রসারিত করে।

প্রায় ২০০ গেরিলা সংগৃহীত হয় এবং বিরাট এলাকা মুক্ত হয়।[১১]

'৭১-এর জুন মাসে ফ্রন্টের আওতাধীন মেহেন্দিগঞ্জ থানায় পাকিস্তানী দালালদের আখড়া মৃধাবাড়ি আক্রমণ ও স্থানীয় শান্তিবাহিনী প্রধানের খতমের মাধ্যমে এই ফ্রন্টে সূচিত হয়

গেরিলা যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ। শুধু তাই নয়, জনগণের কাছ থেকে লুট করা সম্পদ জনগণের মধ্যে ফেরত দেয়া হয়। এই অপারেশনে গেরিলাদের সাথে বিপুল জনগণও অংশগ্রহণ করে। জুলাই মাসে ফ্রন্টের পরিচালকদ্বয় আতাউর ও শাহীন-এর নেতৃত্বে আক্রমণ করা হয় মুলাদী থানা। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে ফ্রন্ট এরিয়ায় আশ্রিত ও যুদ্ধরত আওয়ামী লীগের কুদ্দুস মোল্লার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অপারেশন ব্যর্থ হয়। তবে গেরিলাদের তাৎক্ষণিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কারণে রক্তাক্ত বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় পদক্ষেপে এই ফ্রন্টে সফলতা আসে পর্যাপ্ত। কারণ, ইতোমধ্যে গেরিলারা যুদ্ধের মাধ্যমে যুদ্ধ শেখার প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। আগষ্ট মাসে ফ্রন্টের অন্যতম পরিচালক শাহীন-এর নেতৃত্বে মাত্র একটি রাইফেল, একটি চাকু ও হাতে তৈরি বোমার সাহায্যে মাত্র তিনজন গেরিলা দখল করে গৌরনদী থানার মাহিলারা রাজাকার ফাঁড়ি। এ রকম মাত্রাবিহীন স্বল্প অস্ত্র ও সীমিত গেরিলা দিয়ে শুধুমাত্র সাহস -নির্ভর অপারেশনের সফলতার পশ্চাতে ছিলো পরিচালক শাহীন উদ্ভাবিত 'দ্রুত নিস্পত্তির যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রু অবস্থান দখল পদ্ধতি।' ২নং ফ্রন্ট এরিয়ার প্রতিরোধে যুদ্ধটি ছিলো একটি পূর্ণাঙ্গ অবস্থান যুদ্ধ। যা 'দেওলার যুদ্ধ' হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। ২নং ফ্রন্টের হিজলা-মুলাদী-মেহেন্দিগঞ্জে সেক্টরের কেন্দ্র মেহেন্দিগঞ্জে পার্টির প্রধান ক্যাম্পকে পাকসেনারা আক্রমণ করে। প্রধান ক্যাম্পের সহায়তায় শ্রীপুর এলাকা থেকে আগত গেরিলাদের নদী পাড়ি দিতে পাকসেনারা গানবোট ও স্পীডবোটের সাহায্যে বাঁধার সৃষ্টি করে। প্রধান ক্যাম্পকে লক্ষ্য করে পাক সেনারা অনবরত মর্টার ও রকেট লাঞ্চার ছোঁড়ে। এক পর্যায়ে গেরিলারা প্রধান ক্যাম্প থেকে সরে এসে 'নকশালের জঙ্গল' বলে পরিচিত জঙ্গলে অ্যামবুশ তৈরি করে। পাকসেনারা প্রধান ক্যাম্প দখল করে পুড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে গেরিলাদের অ্যামবুশ টের পেয়ে দ্রুত মেহেন্দিগঞ্জ থানার দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় আওয়ামী মুক্তিবাহিনী হিজলা থানা থেকে নদী পাড়ি দিয়ে এসে পাকসেনাদের আক্রমণ করে। পাকসেনাদের পাল্টা আক্রমণে আওয়ামী মুক্তিবাহিনী দ্রুত পালিয়ে যায়। এ অবস্থায় এগিয়ে যায় জাতীয় মুক্তিবাহিনী। পাকসেনাদের পলায়নের কারণে গুরুতর সংঘর্ষ না হলেও পার্টির দখলে আসে পাকসেনা ও আওয়ামী মুক্তিবাহিনীর প্রচুর সামরিক উপকরণাদি।[১২]

এই ফ্রন্ট এরিয়ার পার্টির বরিশাল শাখার উদ্যোগে ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে আক্রমণ করা হয় বরিশাল শহরের পুলিশ লাইন। এই আক্রম ছিল গেরিলা যুদ্ধের একটি উল্লম্ফন। এখানে গেরিলারা পুলিশ লাইন দখলে নিয়ে কয়েক ঘন্টা অবস্থান করে। সমুদয় অস্ত্র সরিয়ে নেয়ার পর তারা অবস্থান ছেড়ে দেয়। এই পুলিশ লাইন অপারেশনের সফলতায় সর্বহারা পার্টির দখলে আসে সমগ্র '৭১ পর্বে সবচেয়ে বড় ধরণের অটোমেটিক অস্ত্র।

সারণি ২ ঃ '৭১ পর্বে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন ও ফলাফল

জেলা	ফ্রন্ট এরিয়া	অপারেশন সময়কাল	অপারেশনের ধরণ	নেতৃত্ব	ফলাফল
বরিশাল	পেয়ারাবাগান অস্থায়ী ঘাঁটি	৭ মে/'৭১	কীর্তিপাশা নদীতে ২টি স্পীডবোট বোঝাই পাক সেনা আক্রমণ	সিরাজ সিকদার	সফল: ২৪ সেনা নিহত অস্ত্র দখল
বরিশাল	১ নং ফ্রন্ট (পুনর্গঠিত পেয়াবা বাগান ফ্রন্ট)	মে/'৭১	বানারীপাড়া থানা আক্রমণ	শিশির ওরফে হিরু	ব্যর্থ
ববিশাল	২ নং ফ্রন্ট (বরিশাল আংশিক মাদারীপুর-শরীয়তপুর)	জুলাই/'৭১	মুলাদী থানা আক্রমণ	আতাউর ও শাহীন	ব্যর্থ
বরিশাল	২ নং ফ্রন্ট (বরিশাল আংশিক মাদারীপুর-শরীয়তপুর)	আগস্ট/'৭১	গৌর নদী মাইলআরা ফাঁড়ি আক্রমণ	শাহীন	সফল ও অস্ত্র দখল
বরিশাল	১নং ফ্রন্ট	ডিসেম্বর/'৭১	বরিশাল শহরের পুলিশ লাইন আক্রমণ	মইনুল	সফল ও সমুদয় অস্ত্র দখল
পাবনা	৫ নং ফ্রন্ট (পাবনা টাঙ্গাইল)	মে/'৭১	সাঁথিয়া থানা আক্রমণ	বাতেন	আংশিক দখল
মাদারীপুর	মাদারীপুর ফ্রন্ট	জুন/'৭১	পালং থানা আক্রমণ	সিরাজ সরদার	সফল ও অস্ত্র দখল
ভোলা	ভোলা ফ্রন্ট	আগস্ট/'৭১	লালমোহন থানা আক্রমণ	লাল গাজী	সফল ও অস্ত্র দখল
ভোলা	ভোলা ফ্রন্ট	সেপ্টেম্বর/'৭১	চরফ্যাশন থানা আক্রমণ	লাল গাজী	সফল ও অস্ত্র দখল
ঢাকা শহর	ঢাকা শহর	অক্টোবর/৭১	পাকিস্তানের দালাল ব্যারিস্টার মান্নানের ওপর আক্রমণ	শহর শাখা	সফল দালাল মান্নান খতম
ঢাকা শহর	ঢাকা শহর	নভেম্বর/'৭১	ঢাকা মেডিক্যালে রাজাকার চেকপেস্ট আক্রমণ	শহর শাখা	সফল তিনজন রাজাকার খতম

মাদারীপুর ফ্রন্ট এরিয়া

২নং ফ্রন্ট এরিয়াকে আরো বিস্তৃত ও শক্তিশালী করার জন্য পরবর্তীতে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমাকে (বর্তমানে জেলা) নিয়ে পৃথক একটি ফ্রন্ট এরিয়া গঠন করা হয়। প্রারম্ভিক পর্যায়ে পাকিস্তানী দালাল খতমের মাধ্যমে সূচনা ঘটে গেরিলা যুদ্ধের। ধীরে ধীরে অস্ত্র ও গেরিলা সংগৃহীত হয় এবং এক পর্যায়ে পালং ও নড়িয়া থানা দখল হয়। জুন মাসের শেষার্ধে এই ফ্রন্টে যুদ্ধের উন্নত রূপ প্রয়োগ হয়। যার মধ্যে অন্যতম পালং থানা আক্রমণ। এর নেতৃত্ব দেন পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির একজন সক্রিয় সহানুভূতিশীল ও পালং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজ সরদার। অপারেশন সফল হয় এবং থানার সমুদয় অস্ত্র দখল হয়।

ভোলা ফ্রন্ট এরিয়া

তৎকালীন ভোলা মহুকুমাকে (বর্তমানে জেলা) নিয়ে একটি ফ্রন্ট এরিয়া গঠিত হয়। এই ফ্রন্টের পরিচালক ছিলেন খোকন ওরফে আনিস। ভোলায় পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বাধীন পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। ফলে বহু জাতীয় শত্রু (রাজাকার) খতম হয় ও অস্ত্র সংগৃহীত হয়। আগষ্ট মাসেই এই ফ্রন্টে গেরিলা যুদ্ধ দাবানল আকারে ছড়িয়ে পড়ে। পুনঃপুনঃ সংগঠিত বিভিন্ন মাত্রার অ্যাকশনের উন্নত স্তরে আগষ্ট মাসে আক্রমণ করা হয় লালমোহন থানা। অবশ্য এ অপারেশনে যৌথভাবে নেতৃত্ব দেন পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনীর ভোলা ফ্রন্ট এরিয়ার অন্যতম কমান্ডার ফারুক ওরফে লালগাজী। অপারেশন সফল হয়। এর পরপরই এই ফ্রন্ট নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফারুক ওরফে লাল গাজীর নেতৃত্বে আক্রমণ করা হয় চরফ্যাশন থানা। এ অপারেশনও সম্পূর্ণ হয় এবং সর্বহারা পার্টির দখলে আসে প্রচুর অস্ত্র।

মুন্সীগঞ্জ ফ্রন্ট এরিয়া

ঢাকা জেলার তৎকালীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমাকে (বর্তমান জেলা) নিয়ে গঠিত হয় মুন্সিগঞ্জ ফ্রন্ট এরিয়া। এই ফ্রন্টের পরিচালক ছিলেন মজিদ ওরফে নাসির। ফ্রন্টের আওতাধীন লৌহজং-এ মে মাসের শেষার্ধে উচ্ছেদের মাধ্যমে শুরু হয় গেরিলা যুদ্ধ। এই প্রক্রিয়ায় উচ্ছেদ হয় মুসলিম লীগার ও আইয়ুব খাদেম এবং আইয়ুব কর্তৃক 'তগমায়ে পাকিস্তান খেতাবে ভূষিত খলিল সিকদার।

৫নং ফ্রন্ট এরিয়া

পাবনা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ অর্থাৎ পাবনার বেড়া, সাঁথিয়া ও সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া ও শাহজাদপুর টাঙ্গাইলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশবিশেষ নিযে ৫নং ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। প্রথমে এর নেতৃত্বে ছিলেন পাবনার আঃ বাতেন ও টাঙ্গাইলের নজরুল। পরে পেয়ারা বাগান ঘাঁটি এলাকা থেকে মূল নেতৃত্ব সরিয়ে এনে অন্যান্য ফ্রন্ট এরিয়ায় তাদের নিয়োগ

করে চলমান গেরিলা যুদ্ধ অধিকতর বিকশিত করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ফজলু ও সুলতানকে এই ফ্রন্ট এরিয়ায় নিয়োগ করে ফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। ৫নং ফ্রন্ট এরিয়ার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলেন ফজলু; আর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বাতেন, আতিক ওরফে দেলোয়ার হোসেন চঞ্চল, নজরুল হক ওরফে ফারুক, জাহিদ ও সুলতান ওরফে মাহবুব প্রমুখ।

এই ফ্রন্ট এরিয়ার গণসংযোগের দায়িত্ব পালন করতেন নজরুল এবং সুলতান। স্থানীয় কৃষক ও ছাত্রী কর্মীদের নিয়ে প্রথমে ৪টি গেরিলা ইউনিট গঠিত হয়। ৪টি গেরিলা ইউনিট ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিচালনা করতেন যথাক্রমে হক, জাহিদ, রুমি ওরফে ওসমান গণি ও ঠান্ডু। ইউনিটগুলো নিয়ে প্রথম একটি প্লাটুন গড়ে তোলা হয়। পরে দুটো প্লাটুন গড়ে উঠেছিল।
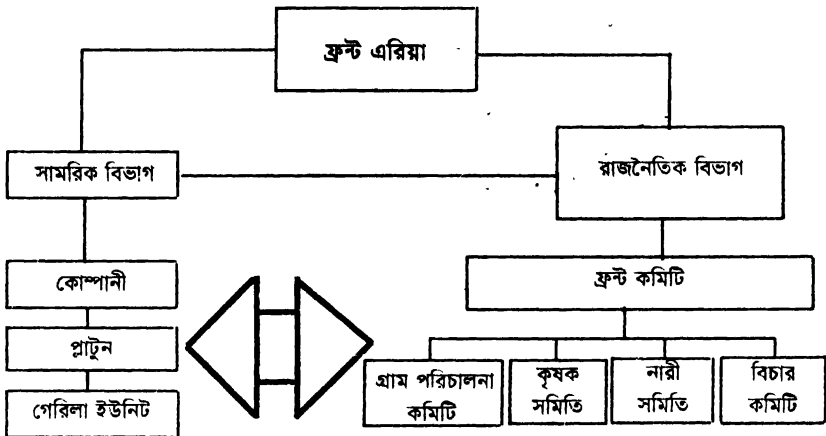
সাভার ফ্রন্ট এরিয়া

সাভার ও মানিকগঞ্জ মহকুমা (চরাঞ্চল ব্যতীত) নিয়ে গঠিত হয় সাভার ফ্রন্ট এরিয়া। এই ফ্রন্টের পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন সর্বহারা পার্টির তৎকালীন দ্বিতীয় নেতৃত্ব তাহের ওরফে শামিউল্লাহ আজমী, পলাশ ওরফে মুন্সি আবু হাসমত (আরজু) সাঈদ প্রমুখ।

এই ফ্রন্টে প্রথমে দেশীয় অস্ত্রের মাধ্যমে সূচিত হয় গেরিলা যুদ্ধ। শেষতক ৫০টির বেশি দেশী রাইফেল সংগৃহীত হয়। এছাড়া ময়মনসিংহের একাংশে ও ঢাকার নরসিংদী এলাকায়ও কিছু গেরিলা বাহিনী গঠিত হয়েছিল। তবে এগুলো ফ্রন্ট এরিয়া হিসেবে গড়ে ওঠেনি। ঢাকা শহরেও গেরিলাদের ভালো তৎপরতা ছিলো। সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বাধীন পূর্ববাংলার

জাতীয় মুক্তি বাহিনীর নিয়মিত গেরিলা ইউনিট, প্লাটুন, কোম্পানী ও ফ্রন্ট এরিয়া একটি সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হতো।

সামরিক বাহিনীতে নিয়মিত গেরিলা ইউনিট ৭ জন নিয়ে গঠিত হয়। একজন পার্টি প্রতিনিধি যিনি 'রাজনৈতিক কমিশার' নামে পরিচিত, কমান্ডার, সহকারী কমান্ডার , ২ জন স্কাউট এবং ২/৪ জন সদস্য নিয়ে একটি গেরিলা গ্রুপ গঠন করা হয়। তিন থেকে পাঁচটি গেরিলা গ্রুপ নিয়ে একটি প্লাটুন, তিন থেকে পাঁচটি প্লাটুন নিয়ে একটি কোম্পানী গঠনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্লাটুন কমান্ড গঠন করা হয় একজন রাজনৈতিক কমিশার, একজন কমান্ডার, দুইজন সহকারী কমান্ডার, তিনজন স্কাউট দ্বারা।[১৩]

ফ্রন্ট এরিয়াগুলোর রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, সামরিক ও প্রশাসনিক কাজের জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেয়া হয়। নিয়ম করা হয় - প্রতিটি ফ্রন্ট এরিয়া পরিচালনার জন্য ফ্রন্ট কমিটি থাকবে। ফ্রন্ট কমিটিতে সভাপতি/সম্পাদক, সহ-সভাপতি/সহ-সম্পাদক ছাড়াও একজন গণসংযোগ বিভাগের পরিচালক থাকবে, একজন ফ্রন্ট কমান্ডার ও একজন সহকারী ফ্রন্ট কমান্ডার থাকবে। এই নিয়মগুলো সম্ভবত সর্বত্রই কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ফ্রন্ট এরিয়াগুলোতে পার্টির নেতৃত্বে স্থানীয় প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রাম পরিচালনা কমিটিসহ বিভিন্ন গণকমিটি হতে থাকে। কোনো কোনো জায়গায় এই গ্রাম পরিচালনা কমিটিগুলো স্থানীয় সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধানের মাধ্যমে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং দূর দূরান্ত থেকে জনগণ বিচারের জন্য এসব কমিটির কাছে আসতো। কর্মী, গেরিলাদের মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয় প্রতিটি ফ্রন্ট এরিয়াতেই। কোনো কোনো জায়গায় ক্যাডার স্কুল খোলা হয়।

গেরিলা ইউনিটগুলো ছিল সার্বক্ষণিক। এই সকল ইউনিট ক্যাম্প করে থাকতো। ক্যাম্পসমূহে সার্বক্ষনিক সেন্ট্রির ব্যবস্থা থাকতো।[১৪]

তথ্যপঞ্জি ঃ

[১] পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর থিসিস, সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন, প্রথম খন্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ. ৫
[২] প্রাগুক্ত. পৃ.৮
[৩] ঘাতক ও দালালদের পুনরুত্থান ও পুনর্বাসনের শ্রেণীতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সেলিম ওমরাও খান, 'বীক্ষণ' তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ৬৫
[৪] পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির প্রথম জাতীয় সংকলন, চতুর্থ খন্ড, পৃ. ২১
[৫] শৃংখলা, সভাপতি মাও সেতুঙ-এর উদ্ধৃতি. বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং ১৯৬৮. পৃ. ১৯৩

[৬] পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট (জানুয়ারি. ১৯৭২), সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন, চতুর্থ খন্ড, পৃ. ১৪-১৫
[৭] বিশেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধ ঃ 'পার্টি ইতিহাসের অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগ দিন, স্ফুলিঙ্গ, পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা, জুন, ১৮১, পৃ. ৬
[৮] পেয়ারা বাগানের স্মৃতি, স্ফুলিঙ্গ, ২৪ নং সংখ্যা, মে ১৯৯০, পৃ. ১-২
[৯] একাত্তরের পাবনা-টাঙ্গাইল ফ্রন্ট এরিয়া, আজিজুল হক, স্ফুলিঙ্গ, পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা, জুন, ১৯৯১, পৃ. ২৫-২৬
[১০] পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট (জানুয়ারি, ১৯৭১), সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন, চতুর্থ খন্ড, পৃ. ২৪
[১১] প্রাগুক্ত পৃ. ২৪
[১২] স্মৃতিচারণ ইতিহাস ঃ একাত্তরে আমাদের সংগঠন, স্ফুলিঙ্গ, পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা জুন, ১৯৮১, পৃ. ৭৪
[১৩] পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট (জানুয়ারি, ১৯৭২), সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন, চতুর্থ খন্ড, পৃ. ২৩
[১৪] স্মৃতিচারণ ইতিহাস ঃ একাত্তরে আমাদের সংগঠন, স্ফুলিঙ্গ, পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা জুন, ১৯৮১, পৃ. ৭২-৭৩

একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) যশোর জেলা শাখার ভূমিকা

হেমন্ত সরকার

[একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইপিসিপি (এমএল)-এর সশস্ত্র লড়াইয়ের ওপর পর্যালোচনামূলক একটি রিপোর্ট হেমন্ত সরকার (পার্টিনাম কমরেড গণি) ১৯৭২ সালের ১২ এপ্রিল তাঁর পার্টির কাছে পেশ করেছিলেন। এ রিপোর্টটি তাঁদের গোপন মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' -এর ৭ম সংখ্যায় (জানুয়ারী ১৯৭৩) প্রকাশিত হয়েছিলো। পাঠকের জ্ঞাতার্থে রিপোর্টটি হুবহু মুদ্রণ করা হলো।]

সাম্রাজ্যবাদীরা বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপর ভিত্তি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসাবে পাক-ভারতকে কেন্দ্র করে চীন-বিরোধী ও বিশ্ব বিপ্লব বিরোধী (পাক-ভারতের কৃষি-বিপ্লবসহ) যুদ্ধ ঘাঁটি করা, এটা না হলে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে ঘাঁটি করার এক গভীর চক্রান্তের জাল বিস্তার করে। অন্য দিকে, আমাদের দেশের মার্কসবাদী - লেনিনবাদী পার্টির (নেতৃত্বে) ডাকে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চূর্ন ও কৃষি-বিপ্লব সফল করার জন্য সশস্ত্রভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করে। যখন পাক সরকারকে ভারতের সাথে যুদ্ধজোটে ভিড়াতে পারলো না তখন সাম্রাজ্যবাদীরা আওয়ামী লীগের মুৎসুদ্দিদের দ্বারা উগ্র জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটাতে থাকে, পাকিস্তানের দুই অংশের মুৎসুদ্দি ও সামন্তদের মধ্যে চরম বিরোধ সৃষ্টি হয়। শ্লোগান ওঠে 'জয় বাংলা' 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা'র। আওয়ামী লীগকে সামনে রেখে বিরাট চক্রান্ত শুরু হয় পূর্ব বাংলায়। জনগণও উগ্র জাতীয়তাবাদের পিছনে সামিল হয় ব্যাপকভাবে।

এই অবস্থায় আমাদের জেলার পার্টির সম্পাদকমন্ডলী সিদ্ধান্ত নেয় যে, ঐ ধরনের চক্রান্ত কার্যকরী করার বিরুদ্ধে আমাদের মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করতে হবে, এবং 'জয় বাংলা' ও 'স্বাধীন

হেমন্ত সরকার ঃ প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা। তেভাগা আন্দোলনের সময় কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং পার্টির মধ্যে থেকেই লেখাপড়া শেখেন। আমৃত্যু তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

বাংলা'র পাল্টা জনগণের অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার পার্থক্য বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে তুলে ধরে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আঘাত করা। দরকার হলে রণকৌশলের পরিবর্তন করা। এই সিদ্ধান্ত হলেও তা হয় ভাসা ভাসা।

মনে রাখা দরকার মুক্ত অঞ্চল কি ভাবে, কোথায় হবে, কি তার সংগঠনগত দিক ইত্যাদি সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণাই ছিল না। এই সাথে মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তা হলো মুজিব- ইয়াহিয়ার চূড়ান্ত আপোষ হয়ে যাচ্ছে। এই ভুলের কারণ শাসক গোষ্ঠীর মধ্যকার বিরোধ সম্পর্কে সুষ্ঠু ভাবে না বোঝা এবং সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা প্রধান করে দেখতে না পারা।

সম্পাদকমন্ডলীর এই বক্তব্য নিয়ে সমগ্র পার্টিতে আলোচনা করা বা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি দিনও সময় পাওয়া যায় না। কারণ ২৩ মার্চ সশস্ত্র যুদ্ধ হয় এবং এর পাল্টা পাক-সরকার ২৫ মার্চ আক্রমণ করে। এটা সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত এভাবে না দেখে দুই মুৎসুদ্দীদের মধ্যকার যুদ্ধ এটাই প্রধান করে দেখা হয়। পার্টির কর্মীদের মধ্যে দেখা দেয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব। কোন কোন জায়গায় কর্মীদের একাংশ উগ্র জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভেসে যায়, কোন জায়গায় নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। কোন জায়গায় কৃষক কমিটি গঠন করে জোতদারদের ধান দখল করে, গরীবের মধ্যে ধান বিলি করে এবং ভলান্টিয়ার দল গঠন করে। এর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে নতুন নতুন গ্রামে। এটাকে অর্থনৈতিক আন্দোলন বলে সমালোচনা করা হয় তীব্রভাবে। কিন্তু সে অঞ্চলের কর্মীরা এই সমালোচনা গ্রহণ করে না। তারা বলে যে, আমাদের পার্টি গড়ে তোলার সুযোগ হয়েছে এবং নতুন নতুন ভূমিহীন গরীবের সাথে মেশার সুযোগ হয়েছে এর মাধ্যমে পার্টি গড়ে তোলার এও একটি পদ্ধতি।

অর্থনৈতিক আন্দোলনের দুটো দিক : ১) শুধুমাত্র অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা, ২) রাজনৈতিক ক্ষমতা সামনে রেখে জোর করে অর্থনৈতিক আন্দোলন, এটা বিপ্লবী লক্ষ্য।

পার্টির কোন বক্তব্য না পেয়ে কর্মীরা যা বুঝেছে, তাই করেছে। স্বাধীন উদ্যোগ নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য, যদি তা সঠিক হয়।

জনগণ আওয়ামী লীগের যুদ্ধকে মনে করে তাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ, আমাদের কর্মীদের একাংশের মধ্যেও ঐ মনোভাব দেখা দিলো। এটা সত্যিকার রাজনীতি দিতে না পারার ফল। কর্মীরা জেলা নেতৃত্বের ওপর কম-বেশী সমালোচনামুখর হয়ে উঠলো কোন নির্দেশ না পাওয়ার জন্য। এরই মধ্যে কিছু কিছু কর্মীর উদ্যোগে অস্ত্র সংগৃহীত হয় এবং জেল বন্দীদের মুক্ত করে আনেন। এই সময় চোর-ডাকাত জেল থেকে বের হয়ে আসে এবং সশস্ত্র হয়ে চুরি, ডাকাতি ও লুটপাট শুরু করে। ই. পি.আর. হেরে যাওয়ার পর অস্ত্রের ছড়াছড়ি। জামাত প্রভৃতিরা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

জেলা পার্টির এক বর্ধিত সভায় সম্পাদকমন্ডলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তার ত্রুটির দিক

তুলে ধরে নতুন পদক্ষেপ দেয়- রাজনীতি প্রচার, সাম্প্রদায়িকতা এবং লুটপাট বিরোধী প্রচার জোরদার করা। গেরিলা স্কোয়াড ও রেডগার্ড বাহিনী ব্যাপকভাবে গড়ে তোলা, রেডগার্ড দ্বারাও ডাকাত খতম করা, বিশেষ ক্ষেত্রে অস্ত্র ব্যবহার করা, পার্টি সংগঠন শক্তিশালী করা, সরবরাহ বিভাগ গঠন করা হয়। এই সিদ্ধান্ত যেমন সঠিক হয়, তেমনি ভুলেরও অবকাশ থেকে যায়। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্মীরা অঞ্চলে যাওয়ার আগেই অঞ্চল বিশেষে ব্যাপক লুট, অগ্নিসংযোগ, চুরি-ডাকাতি শুরু হয়। সাম্প্রদায়িক প্রচারও জোরদার হতে থাকে। এ সত্ত্বেও কয়েকদিনের মধ্যে চোর-ডাকাত খতম শুরু হয়। লুট— প্রতিরোধ হতে থাকে । ১নং -এ এই দিনে কয়েক শত লোকের উদ্যোগে ৮ জন ডাকাতের চোখ তোলা হয়। একজন খতম হয়, কয়েকজন পালাতে সক্ষম হয়। এই অঞ্চলে কয়েকটি লুট-বিরোধী জনসভা হয় এবং লুটের মালও কিছু কিছু ফেরত দেয়া হয়। প্রকাশ্য কাজ বলে এটা বন্ধ করে দেয়া হয়। আমার দৃষ্টিতে এই কাজের ফল হয় ভাল (পার্টিকে গোপন রেখে), আর দু' একটা সভা হলে দ্রুত নতুন অঞ্চলে পার্টির গোপন সংগঠন গড়ে তোলা যেতো এবং অঞ্চল বিস্তার লাভ করতো। তবে শুধু জনসভা হলে ক্ষতিই হতো। এটা প্রকাশ্য কাজে গিয়ে সুযোগ গ্রহণ মাত্র।

৬নং -এ লুট প্রতিরোধ করতে গিয়ে কমরেড হানিফ প্রথম শহীদ হন। এর বদল চলে বেশ জোরে। এই অঞ্চলেই প্রথম আক্রমণ ও ক্ষতি হয় বেশী। এই সময় জেলায় ব্যাপকভাবে ডাকাত খতম ও লুট বিরোধী লড়াই ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দিকে। জনগণের মধ্য হতে ব্যাপক সাড়া ও সমর্থন আসতে থাকে পার্টির পক্ষে; বিশেষ করে ধনী ও মধ্যবিত্ত মহল থেকে। এ সময় শ্রেণীশত্রু খতম স্থগিত আপনা আপনি হয়ে যায়, পার্টির অঞ্চল বাড়তে থাকে। কর্মীদের জঙ্গী ভাব দেখা দেয়। জনগণের মধ্যে কাজ বেড়ে যায়। সচেতন কর্মীর অভাব দেখা দেয়।

দেশত্যাগীদের পার্টির ওপর ভাল ধারণা ও পার্টি তাদের প্রশংসাও অর্জন করে, সেটা ভারতেও ছড়ায়।

৭নং-এ কর্মীদের নেতৃত্বে জনগণের সহযোগিতায় ২৮ টা লুটকারী খতম হয় এবং তারা ৬ জনকে পুলিশের হাতে দেন।

জেলা সিদ্ধান্তের দুটো দিক-কর্মীদের কর্মতৎপরতা, জনতার মধ্যে পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি ও কর্মী বৃদ্ধি, অঞ্চল ও সংগঠন বৃদ্ধি, অঞ্চল বিশেষে চুরি-ডাকাতি লুট বন্ধ। অন্যদিকে ভূমিহীন ও গরীব কৃষক ও গেরিলা স্কোয়াডের উপর নির্ভরশীল না হয়ে, রেড গার্ড ও যুবকদের প্রভাব বৃদ্ধি ও তাদের উপর নির্ভরশীল হওয়া, শ্রেণীশত্রু খতম বন্ধ হয়ে যাওয়া, শ্রেণী সমন্বয় দেখা দেয়, গেরিলা স্কোয়াড গঠনের উপর শিথিলতা, পার্টি মূলত জঙ্গী ছাত্র ও যুবকদের প্রভাবে চলে যায়। রাজনীতি প্রচার মূলত হয় না বলা চলে। অস্ত্রের উপর

নির্ভরশীলতা, ত্রুটির দিকগুলি কর্মীদের চোখে দ্রুত ধরা পড়তে থাকে ও তার থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা চালান হতে থাকে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টির যে রাজনীতি তা কাগজেই থেকে যায়। উপরোক্ত অবস্থায় মোকাবিলা করার জন্য এটা একেবারেই বাদ পড়ে যায়। এটা শুধু যে অবস্থার চাপে তা নয়, আকড়ে ধরা হয়না; ঘটনার গতি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে।

মাস দু'য়েক পরে আবার জেলা পার্টি বৈঠক (বর্ধিত) বসে। বিশেষ দু'জন কমরেড উপস্থিত হতে পারেননি। তবে এবার আরও দু'জন কমরেড জেলা কমিটিতে যুক্ত করা হলো। এবার পার্টিতে নতুন শক্তি ও নতুন চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি হলো, যেটা আগে ছিল না।

বৈঠকে গত কাজের সমালোচনা করে নুতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। ঘটনার দ্রুত গতির সাথে তাল রেখে ভূমিহীন-গরীব কৃষকের উপর নির্ভর করে গ্রামে গ্রামে বিপ্লবী কমিটি গঠন করা, শ্রেণী শত্রুর ধান, পাট দখল করে গরীবদের মধ্যে বিলি করা। এক্ষেত্রে বলা হয় যে, যেখানে বিপ্লবী কমিটি গঠনের উপযুক্ত অবস্থা হয়েছে সেখানে কমিটি গঠন করা, যেখানে উপযুক্ত অবস্থা নাই সেখানে উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করা, এবং শ্বেত অঞ্চলে জোর প্রচার ও গেরিলা অ্যাকশন জোরদার করা (শ্রেণী শত্রু খতম), সম্প্রসারণবাদীদের দেশে বসে 'স্বাধীন বাংলা' সৃষ্টি করা ও আওয়ামী লীগের স্বরূপ এবং সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের চক্রান্তমূলক কার্যকলাপের স্বরূপ তুলে ধরে জোর প্রচার করা, শ্রেণী শত্রু খতম জোরদার করা, যুবকদের ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে গেরিলা স্কোয়াড ও ভূমিহীন গরীবদের উপর নির্ভর করা এবং ব্যাপক গেরিলা স্কোয়াড গড়ে তোলা। অস্ত্রের উপর নির্ভরতা দূর করে রাজনীতিকে প্রধান করা, নিজ অস্ত্রে (দা ইত্যাদি) খতমের কাজ চালু করা। সামরিক কমান্ড গঠন করা, সেনাবাহিনী গঠন করা, আধা প্রকাশ্য কাজের ধারা বের করার চেষ্টা করা। সংগঠনগত সমস্ত কাজের জোরদার করা, অঞ্চল বিস্তার প্রভৃতি কাজের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়। আগেই সরবরাহ বিভাগ গঠিত হয়।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজে হাত দেয়া এবং দ্রুত সাড়া মিলতে থাকে এবং অঞ্চল দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে। কাজটা সবেমাত্র শুরু, সমস্ত পার্টি ও অঞ্চলগুলিতে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আলোচনা করে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার আগেই পার্টির ওপর রাজাকার ও মিলিটারীর হামলা আসতে থাকায় পার্টি তার মোকাবিলা করতে গিয়ে অনেক অঞ্চলে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক কাজগুলিও করার সময় পায় না।

১নং ও ২নং অঞ্চলে দ্রুত বিপ্লবী কমিটি গঠনের কাজ চলতে থাকে। ২নং অঞ্চলে মূলত সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কমিটি গঠনের কাজ চলতে থাকে, এবং একটা নীতিমালাও খাড়া করে সেই ভিত্তিতে কাজ চলে। তাতে জোতদারী, বন্ধকী, ইজারাদারী, জলকর প্রথা বাতিল, সরকারী খাজনা ট্যাক্স বিলোপ ঘোষণা করা হয়। বিচার বিভাগ, সরবরাহ ও সেনেটারী

বিভাগ. এগুলি বিশেষ দিক. এখানে বিপ্লবী কমিটির নেতৃত্বে থাকে ভূমিহীন ও গরীব কৃষক।

১নং-এ কয়েকটা অঞ্চলে বিপ্লবী কমিটি গঠন হলেও সাংগঠনিক ত্রুটি থাকায় বিশেষ করে নীতিমালা না থাকায় এক এক গ্রামে এক এক ধরনের কাজ হয় এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দ্রুত হস্তক্ষেপ করে সংশোধনের চেষ্টা হয়। এখানে এক আঞ্চলিক বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এক নীতিমালাও খাড়া করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে. এই বিপ্লবী কমিটিকে কৃষকগণ তাদের সরকার মনে করেনি, এমন কি পার্টির কর্মীদের মধ্যেও একটা অংশ। এটা রাজনীতির অভাবের জন্য।

এই সমস্ত কমিটির তরফ থেকে শ্রেণী শত্রু ধনী কৃষক ও বর্গা বন্ধকী জমির ধান-পাট কাটা শুরু হয় এবং গরীবের মধ্যে অর্ধেক বিলি করে। আর অর্ধেক পার্টি, সেনাবাহিনী, গ্রাম আঞ্চলিক বিপ্লবী কমিটির। কিছু গরীব কৃষক ও মধ্যবিত্তের ধান কাটা হয়, এটা ত্রুটিপূর্ণ। ধান কাটার প্রভাব বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি যেখানে আমাদের কাজ ছিল না বা কর্মী ছিল না সেখানেও বিপ্লবী কমিটি গঠন করে ধান কাটা শুরু হয়। এ কাজ ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ঝড়-বর্ষা সাংঘাতিক, তা সত্ত্বেও পুরোদমে এ কাজ চলতে থাকে। এর মধ্যে যেমন বিপ্লবী ভাব ছিল; তেমনি অন্যদিকে নিছক অর্থনীতির দিকও ছিল।

আমাদের অঞ্চলগুলিতে দেখা যায় গরীব ও ভূমিহীনদের বিরাট উদ্যোগ। কোন কোন অঞ্চলে এদের বক্তব্য ছিলো যে,বহু কাল পরে ধনীদের মাতব্বরী গেছে। আমাদের কর্মীদের মধ্যে দেখা দেয় কতকগুলি ঝোঁক। দলিল দখল করে পুড়িয়ে দেয়া (সমাজতন্ত্র গঠন করছে) কৃষকের অস্ত্র ও টর্চলাইট দখল করা, অতি বাম ও ব্যক্তি আক্রোশ প্রভৃতি দিক। ফলে জনতার মধ্যে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকে।

যেখানে বিপ্লবী কমিটি গঠন করার অবস্থা সৃষ্টি করার কথা, সেখানেও বিপ্লবী কমিটি গঠন করে ধান কাটা শুরু হয়ে গেল।আসলে এগুলি মূলত ধান দখল কমিটির মত হয়, রাজনীতি হয় গৌণ।

শয়তানরা যে সকল জিনিস লুট করে জমা করেছিল তাও দখল করে কিছু বিলি করার সময় হয় না। ঔষধপত্র দখল হতে থাকে, শ্রেণীশত্রু নয় এমন লোকের জিনিসও দখল হতে থাকে। এর মধ্যে যেমন দুর্নীতি দেখা দেয়, অন্যদিকে জনগণ একে খুব ভাল চোখে দেখেনি। প্রায় জায়গায় বিপ্লবী রাজনীতি দিতে না পারা। মনে রাখা দরকার, যে রাজনৈতিক সচেতনতা হলে বিপ্লবী গঠন করা যায় সে সচেতনতা তখনও আসেনি বা চেতনা মোটেই ছিল না।

শ্রেণীশত্রু খতম হতে থাকে.বহু শত্রু গ্রাম ছাড়া হয়ে শহরে গিয়ে বাসা নিয়েছে। ফলে তাদের না পেয়ে তাদের দালাল (তাদের দলের লোক) খতম করা হতে থাকলো.লুটকারীদের

মধ্যে যারা গরীব এমন লোকও খতম হলো। অস্ত্রের ওপর নির্ভরতা কমলেও খতম আগ্নেয়াস্ত্রতেই হতে থাকল। কারণ শত্রু সশস্ত্র প্রায়, তখনও যুবকদের সব অঞ্চলে একই ধারা।

সমস্ত অঞ্চলে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার ওপর জোর পড়লো, আঞ্চলিক বাহিনীও গড়ে উঠতে থাকলো, কোন কোন অঞ্চলে গ্রামবাসী বাহিনীও গড়ে ওঠলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ঐ সকল বাহিনীতে গরীব ভূমিহীন বেশী, কিন্তু মূলত লেখাপড়া জানা ছাত্র-যুবক বেশী। এই সময় কিছু অসৎ লোক ঢোকে পার্টিতে। যেমন লুটে অংশীদার, চরিত্রহীন,চোর এমনকি ডাকাতও ঢুকে পড়ে খতমের ভয়ে। লক্ষণীয় , খতমই হলো, হয় না তার শ্রেণী বিশ্লেষণ তথ্য সংগ্রহ। হরদম খতম এবং খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো জনতার মধ্যে। জনতা থেকে মূলত বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করলো পার্টি।

১নং অঞ্চলে বিপ্লবী কমিটি ইজারাদারী প্রথা বাতিল করে নতুন কর বসালো ৫ ও ১০ পয়সা। ৪ টা হাট এদের অধীনে। চাউলের দাম ২০ টাকা বেধে দিল এবং বাইরে যাওয়া বন্ধ করণ, মজুতদারদের ধান বিক্রি করে নেওয়ায় বাইরের বড় ব্যবসায়ীদের ওপর হস্তক্ষেপের ফলে তারা হাটে আসা বন্ধ করে দিল। এর ফলে ভাল মন্দ দুই প্রতিক্রিয়া (খারাপটাই বেশী) দেখা দিল।

৬ নং এ কৃষক কমিটি নাম দিয়ে শত্রুর ধান দখল করে গরীবের মধ্যে বিলি করা হয়। এর প্রভাব পড়ল বিভিন্ন দিকে খুব। পরে বিপ্লবী কৃষক কমিটি নাম দেওয়া হয়। বিপ্লবী কমিটি এবং বিপ্লবী কৃষক কমিটির মধ্যে পার্থক্য হলো- বিপ্লবী কমিটির লক্ষ্য এখনই মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টির দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া। স্মরণ রাখা দরকার ৬ নং অঞ্চল শত্রুদের আক্রমণে প্রথমেই ভেঙ্গে যায়। পুরানো ৪ নং অঞ্চলে ৫ টা শান্তিবাহিনীর লোক খতম হয়। এর পরদিন মিলিটারীর আক্রমণে অঞ্চল ভেঙ্গে এবং সমস্ত লোক দেশ ছেড়ে যায়। দুইটা অঞ্চলই হিন্দু প্রধান। পুরানো ৪ নং থেকে ২০-২২ জন কমরেড অস্ত্রসহ ভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ওঠে। এতে বাহিনী গড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

৬নং এ আবার পার্টি গড়ে ওঠতে থাকে এবং-আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গড়ে ওঠতে থাকে, খতম হয় বেশ কিছু

৫ নং এ জোর রাজনীতি প্রচার ও সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয় (সাংগঠনিক কাজ সবে শুরু হয়)। এমনি সময় রাজাকারদের সাথে ৬ দিন লড়াই চলে, এটা গেরিলা যুদ্ধ না হয়ে হয় সম্মুখ যুদ্ধের সামিল। ৫ জন রাজাকার খতম হয়। আমাদের কমরেড সেনা একজন শহীদ হন। এই যুদ্ধের মূল চিন্তা ছিল যুদ্ধ করে শত্রু ঘাঁটি তুলে দিতে পারলেই আমাদের লক্ষ্য হাসিল হবে। এই চিন্তা ও যুদ্ধ ছিল মারাত্মক ভুল। আওয়ামী, সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার খুব সীমাবদ্ধ থাকে গ্রুপ ও সেল বৈঠকে।

সরবরাহ বিভাগের কাজ সারা জেলায় গড়ে না উঠলেও অঞ্চল বিশেষ কাজ ভালই চলে। সার্মাবিক কমান্ডের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী গঠনের চিন্তা থাকলেও সারা জেলাব্যাপী করা যায় না, কিন্তু আঞ্চলিকভাবে প্রায় অঞ্চলে আঞ্চলিক বাহিনী গড়ে ওঠে। আধা প্রকাশ্য কাজ বের করার স্থলে প্রায় সমগ্র কাজ মূলত প্রকাশ হতে শুরু করলো। ফলে ২-৪ জন ছাড়া সকলে প্রকাশ্য হয়ে গেল। অবশ্যই সেই অবস্থায় অনেকখানি স্বাভাবিক সেটা। গেরিলা স্কোয়াড গঠনের কাজ বেশী হয় না। সংগঠনগত কাজ প্রায় বন্ধ হয়। আগামীতে জমি দখলের লক্ষ্য রেখে বিপ্লবী কমিটির নেতৃত্বে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। এই সময় দুটা দিক লক্ষ্যনীয়ঃ মূলত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, আঞ্চলিক বাহিনী গড়ে ওঠলো, আগের চেয়ে পার্টি প্রভাব বাড়লো, অঞ্চল বিস্তার হলো,কর্মী বাড়লো, কিন্তু সংগঠন বাড়লো না। কর্মীদের সৃষ্টির উদ্যোগ বাড়লো, যোগাযোগের ব্যাপারে অগ্রগতি হলো না। কর্মীরা আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়,জঙ্গী ও সংগ্রামী মনোভাব বাড়ে, পার্টির ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশী কাজ ও কাজের পরিধি বেড়ে যায়। বিশেষ লক্ষ্যণীয়, যে মেয়েসমাজকে পর্দার বাইরে যেতে দেয়া হয় না বা তাদের কোন অধিকার স্বীকার করা হয় না, সে মেয়েরা এখন রাইফেল হাতে ট্রেনিং দেয়া শুরু করল। অন্য দিকে এই সময় হতে পার্টির বক্তব্য ও রাজনীতি প্রচার মূলত বন্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে ত্রুটি চীন সম্পর্কে কোন প্রচারই করা হয় না সম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও চক্রান্ত,মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে পরিস্কার বক্তব্য তুলে ধরা যায় না। মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে যেমন ব্যাপক জনগণের মোহ, তেমনি পার্টি কর্মীদের বড় একটা অংশের মধ্যেও বিরাট মোহ থাকে। শ্রেণী বিশ্লেষণবিহীন গড়ে খতম, গড়ে শত্রুর জিনিস দখল, ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা প্রভৃতির ফলে জনতার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অঞ্চল বিশেষ পার্টি মূলত জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন থাকে। বিভিন্ন ধরনের লোক পার্টিতে ঢুকে পড়ে, পার্টি সেদিকে লক্ষ্য দিতে পারে না। যুদ্ধ করা যেমন ভাল, তেমনি খারাপও বটে। নির্বিচারে খতম ও জিনিস দখল, পাক-সেনা রাজাকারের হামলা, মুক্তিবাহিনীর হামলার ফলে জীবন সম্পত্তি রক্ষার জন্য অনেকে রাজাকারে যোগ দিল (আমাদের পক্ষ হতে পারতো এমন লোকও)। গেরিলা যুদ্ধ মূলত বন্ধ হয়ে গেল। আওয়ামী লীগ ওপারে চলে যাওয়ার পর জনতার মধ্যে তাদের উপর খারাপ (ধারণা হয়) মনোভাব সৃষ্টি হয়। প্রশাসন ব্যবস্থা না থাকা, এই অবস্থায় মাত্র আমাদেরই সুযোগ সৃষ্টি হয়, এমনকি আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃস্থানীয় কর্মীরাও আমাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে। ক্ষেত্র বিশেষে সাহায্যও করে। এ সুযোগ ব্যবহারে ব্যর্থ হই সংকীর্ণ দৃষ্টির জন্য। শুধু গোপন কাজের ওপর জোর দিতে গিয়ে ব্যাপক সুযোগ বুঝতে পারিনি বা তাকে ব্যবহার করতে পারিনি। অনেকের অনেক প্রশ্ন ছিল, সাহস করে বলতে পারেনি সংশোধনবাদী হওয়ার ভয়ে।

প্রচুর কর্মী এসেছে, কিন্তু তাদের রাজনীতি দিয়ে সচেতন করে সংগঠিত করতে না পারার

ফলে নানা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও ভুল চিন্তা ঢোকে বিশেষ করে চীন সম্পর্কে। এরই মধ্যে কেন্দ্র থেকে এক চিঠি আসে সিদ্ধান্ত আকারে। মুক্তিযুদ্ধের স্তর বলে ও মূলত আওয়ামী লীগের লাইন তুলে ধরে। এটাকে আমরা আলোচনায় দিয়ে রাখি। যে সময় লড়াই পুরামাত্রায় শুরু হয়েছে বলা চলে এমনি সময় আসে ১ নং ও ২নং দলিল (১ নং দলিল ঐ চিঠিরই অনুরূপ বলা যায়)। কর্মীরা ফেটে পড়ে যে যখন জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে লড়াই করছি, তাদের ভুলত্রুটি হচ্ছে কিনা তা দেখার পরিবর্তে এ দলিল দেয়ার অর্থ কি? কর্মীদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল, আবার কি পার্টি দুই ভাগ হয়ে গেল? দ্বিধা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো কর্মী মহলে। দলিলের ওপর বিস্তারিত আলোচনার সময় হলো না। তবুও ২ নং দলিলকে মূলত গ্রহণ করল, আওয়াজ উঠল 'কেন্দ্র উড়াও'।

প্রায় মাস দুয়েক পরে জেলা পার্টির পূর্ণ বৈঠক বসে। সৌভাগ্যক্রমে কেন্দ্রীয় নেতা একজন ঐ সভায় উপস্থিত থাকেন। দীর্ঘদিন পরে কেন্দ্রের সাথে এটা যোগাযোগ বলা চলে।

এই বৈঠকে কিছু কিছু ভুল ত্রুটির আলোচনা হয় (বিস্তারিত নয়) এবং নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আঞ্চলিক সরকার গঠন (তাড়াহুড়া হচ্ছে বলে প্রতিবাদ হলেও জোর না) করা। জেলায় কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর গঠন, পাশাপাশি ৪ জেলা নিয়ে আঞ্চলিক কমিটি গঠন, পার্টির রাজনীতি প্রচার ও সংগঠনগত দিক শক্তিশালী করা। সামরিক ট্রেনিং দেয়া ও সামরিক কমান্ডকে শক্তিশালী করা, সরবরাহ বিভাগকে শক্তিশালী করা, জেলাকে তিনটা ভাগে ভাগ করা ঃ ১. এক নম্বরকে কেন্দ্র করে ৫ নং হতে ৩ নং পর্যন্ত মুক্ত অঞ্চল বা শ্বেত অঞ্চল। পাশের জেলার সাথে যোগাযোগ করে মিলিতভাবে কাজের প্রচেষ্টা, দরকার হলে জেলা সীমান্ত কমিটি গঠন, ক্ষণস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি ও অঞ্চলগুলির বিস্তার করা, জেলা শহরে গেরিলা তৎপরতা শুরু করা, বিপ্লবী কমিটিগুলির অসমাপ্ত কাজকে দ্রুত সমাপ্ত করা। বিশেষ জোর দেওয়া হল রাজনীতি ও সেনাবাহিনীর ওপর। গেরিলা লড়াইয়ের ওপর জোর দেয়া প্রভৃতি সিদ্ধান্তগুলি নেয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কেন্দ্রীয় নেতা বারবার বলেন যে মুক্ত অঞ্চল বা ঘাঁটি অঞ্চলের পাঁচটি শর্ত থাকা চাই। শক্তিশালী পার্টি, শক্তিশালী সেনাবাহিনী, ব্যাপক জনতার জোর সমর্থন। পিছু হটার জায়গা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মূলত নিজেদের হাতে থাকা চাই। এই শর্তগুলির একটাও আমাদের ছিল না, তবুও কেন্দ্রীয় নেতা জেলা পার্টির সাথে সায় দিয়ে যান। এই সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে বন্ধুরা যার যার কাজে ফিরে গেল। ৬ নং বন্ধুরা যে দিন অঞ্চলে পৌঁছল তার পরদিন মিলিটারী ও রাজাকারদের বিরাট আক্রমণ হলো, প্রায় বাধাহীনভাবে ভেঙ্গে পড়ল অঞ্চল। জ্বালানী, লুট ও খুনখারাপী চললো খুব ২-৩ দিন ধরে। কর্মীরা অঞ্চল ছেড়ে একদিকে গিয়ে ওঠল। আগেও হামলা হয়েছিল মোকাবিলাও হয়েছিল কিছু কিছু। অঞ্চল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কর্মীদের ও জনতার চেষ্টা ব্যর্থ হলে সবার মনোবল ভেঙ্গে পড়ল।

এক জেলার সাথে আলোচনা করে আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা ও যৌথভাবে কাজের প্রচেষ্টা নেওয়া হল। দুই জেলার সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে এক সীমান্ত কমিটি গঠন করা এক অঞ্চলে। এই অঞ্চলে আগেই ব্যাপক খতম ও আরও কয়েক অঞ্চলে খতম চলছে। এর মধ্যেই ৫ নং অঞ্চল হতে ঘেরাও হওয়ার ভয়ে বা আশংকায় শ'দুয়েক কর্মী নিয়ে জেলা-কেন্দ্রে উঠল। এদের একদিকে যেমন ঘেরাও হওয়ার ভয়. অন্যদিকে ধারণা কেন্দ্র সম্পূর্ণ মুক্ত। সেখান থেকে জোর যুদ্ধ করে অঞ্চলে ফিরে যাবে এই চিন্তা। এটা সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা প্রসূত। এ অঞ্চলে প্রায় শ' দেড়েক গ্রামে আমাদের রাজনীতির প্রভাব পড়ে. কিন্তু পার্টি সংগঠন বলে এ সময় কিছু ছিল না। সবেমাত্র সাংগঠনিক কাজে হাত দেওয়া হয়। অবস্থা ছিল ভাল। জেলা- কেন্দ্রের ওপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হয়, এদের কাজ দেওয়া সম্ভব হল না। শুধু থাকার ব্যবস্থা হচ্ছিল কোন রকমে। কয়েক দিন পরে ৪৬ জন কর্মী ৫ নং এ ফিরে যাবার পথে রাজাকারের হাতে ধরা পড়ে বিনা বাধায় এবং সকলকে মেরে ফেলে। পার্টির ওপর বিরাট আঘাত এটা।

এর পরে ২ নং অঞ্চলে কয়েক শত মুক্তিবাহিনী এসে ঘিরে ফেলে সশস্ত্রভাবে। শেষে সন্ধ্যার দিকে জেলা কেন্দ্রে এসে উঠে প্রায় ২-৩ শত লোক: কেন্দ্রের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রায় বাড়ীঘর ডুবে গেছে বন্যায়। বর্ষাও আছে। দারুণ সমস্যা দেখা দিল। ওদিকে মুক্তিবাহিনীও গড়ে ওঠে। প্রায় দুইশত কর্মী ট্রেনিং নেওয়া শুরু করে। মেয়ে কর্মীও ছিল কয়েকজন।

এর আগেই মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ২টা জায়গায় আমাদের কয়েকটা কর্মীকে মেরে ফেলে। ফলে মুক্তিবাহিনীর ওপর বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। এর পূর্ব পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর সাথে সম্পর্ক খুব তিক্ত ছিল না। এমনকি জায়গা বিশেষে আমাদের কর্মীরা তাদের থাকতে খেতে দিয়েছে এবং খরচের পয়সাও দিয়েছে। আগেই বলেছি মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে মোহ ছিল।.

এর পরেই ৩ নং অঞ্চল ভেঙে এল মুক্তিবাহিনীর আঘাতে ও অত্যাচার করলো খুব। এরা ওঠল এসে কেন্দ্রে। মানুষ আর মানুষ হয়ে গেল। নিজেদের উদ্যোগে অতিকষ্টে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হতে লাগল। শত্রুর জিনিস দখল করে খাওয়ার কাজ চলছে। সরবরাহ বিভাগ খুব তৎপর কিন্তু বড় কঠিন ব্যাপার। মধ্যবিত্তরাই মূলত দেখাশোনা করেছে এগুলো। কয়েকটা ক্যাম্প গড়ে ওঠলো কয়েক জায়গায়. সাব সেন্টারও গড়ে ওঠল ক্যাম্পের কাছে কাছে যদিও ত্রুটিপূর্ণ ঘটনা ঘটে চলছে একটার পর একটা। একটা চিন্তা শেষ করতেই আর একটা ঘটনা এসে হাজির। কোন বন্ধুই তাল রাখতে পারছে না। হিমসীম খেয়ে যাচ্ছে. অঞ্চল সীমাবদ্ধ হয়ে কয়েক গ্রামে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। কেন্দ্রকে শত্রুরা কয়েক দিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। তখন লড়াই আর লড়াই ছাড়া আর কিছুই নাই। যোদ্ধা কাজ হল যুদ্ধ আর খাদ্য সংগ্রহ করা। এ এক সত্যিকার যুদ্ধ ফ্রন্ট। অবশ্য যুদ্ধ সবই চলছে ভুল

পদ্ধতিতে। এই সময় যে সকল বন্ধুরা কেন্দ্রে এসেছে তাদের নিয়ে এক আঞ্চলিক কমান্ড গঠন করা হয় সামরিক কেন্দ্রীয় কমান্ড হতে। প্রায় ৮/৯টা সেনা ক্যাম্প গড়ে ওঠল আমাদের। প্রত্যেক ক্যাম্পে রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা ঠিক করা হল। শত্রুদের কয়েকটা ঘাঁটি হয় কয়েক দিকে, চারিদিকে পানি আর পানি, ঝড় বৃষ্টি লেগেই আছে। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি হল খুব, নৌকা ছাড়া কোন উপায় নেই। অনেকের একখানা করে নৌকা দরকার হল, কিন্তু এত নৌকা কোথায়?

গড়ে উঠলো এক কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী। ট্রেনিং চলছে বিভিন্ন সেনা ক্যাম্পে। সেনারা আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে মরিয়া যুদ্ধ করছে। কয়েকটা গ্রামেই যুদ্ধ ফ্রন্ট হয়ে গেল। অনেক লোক ভোরে গ্রাম ছেড়ে গেছে, রাত দিন গুলির আওয়াজ প্রায় লেগেই আছে চারিদিকে।একটা ফ্রন্টে প্রায় যুদ্ধ হচ্ছে, সার্বিকভাবে নিয়মিত যুদ্ধ চলছে বলা চলে। আর ২/১ টা কমান্ডো এ্যাকশন ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ সম্পূর্ণ বর্জিত। রাজনীতি বর্জিত হয়ে সামরিক রাজনীতি হল প্রধান অর্থাৎ যুদ্ধ করেই সব কিছু করা। নতুন নেতৃত্ব ও সেনাদের উৎসাহ উদ্যোগ প্রশংসার যোগ্য, ভুলত্রুটি সত্ত্বেও।

এর আগে যত লড়াই হয়েছে তাতে শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া আমাদের ক্ষতি হয়নি প্রায়ই। যেখানে মিলিটারী এসেছে সেখান থেকে আমাদের বাহিনী সরে সরে এসেছে। এই সময় মূলত : দুটো মনোভাব দেখা দেয় এক, যুদ্ধ করে অঞ্চল রক্ষা করা। দুই, পিছু হটার জায়গা নেই, এটা হচ্ছে ভীতভাব ও দিশাহারা ভাব।

এর আগেই সিদ্ধান্ত হয় মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে, পুর্ব বাংলার ক্ষেত্রে প্রধান শত্রু হল মুক্তিবাহিনী-এদের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া। অন্যদিকে, সশস্ত্র দিক দিয়ে পাকবাহিনী প্রধান শত্রু। যখন মুক্তিবাহিনী আমাদের উপর হামলা শুরু করে তখন সিদ্ধান্ত হয় যে, আমাদের অঞ্চল দিয়ে তাদের ঢুকতে না দেওয়া, অস্ত্র কেড়ে নেওয়া, তারা সংঘর্ষে এলে সংঘর্ষে যাওয়া। সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে দৃঢ়তার অভাব থাকে, কারণ মুক্তিবাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে প্রধান করে বললেও প্রধান হিসাবে দেখতে না পারা এবং তাদের ওপর মোহ থাকা।

এরপরে আমাদের অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার পথে দুইদিন আমাদের কর্মীর ওপর খারাপ ব্যবহার করে, দু-দিনই আমাদের কর্মীরা তাদের ধরে আনে। প্রথম দল তাদের ত্রুটি স্বীকার করে কিছু বুলেট দিয়ে চলে যায়, দ্বিতীয় দলের অস্ত্র তিন ভাগের দুই ভাগ রেখে ছেড়ে দেয়া হয়। ক্রমশ অবস্থা জটিল হতে থাকে।

এবার আমাদের কয়েকজন যায় তাদের সাথে দেখা করতে কিন্তু ফল ভাল হয় না, এই আলাপের উদ্দেশ্য আলাপের মাধ্যমে কালক্ষেপণ ও সেই সুযোগ আমাদের শক্তি সংহত করা। এরপরেও তাদের কয়েকটা দল বহু অস্ত্রসহ অঞ্চলে ঢুকলে, প্রতিবারই আমাদের কর্মীরা সুকৌশলে তাদের গ্রেপ্তার করে দু'একদিন করে রেখে রাজনীতি দিয়ে সমস্ত অস্ত্র

রেখে দেয়। পরে আলোচনার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এক দলের প্রায় ৫০ জন আমাদের সাথে যেতে চায় কিন্তু তাদের না রেখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এরই মধ্যে ৪ নং অঞ্চল ভেঙ্গে গেলে শত্রুরা পাশের এক থানায় ঘাটি করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাহিনী আক্রমণ করে এবং সারাদিন যুদ্ধের পর মিলিটারীর বিরাট হামলার মুখে বাহিনী সরে আসতে বাধ্য হয়। অক্ষত অবস্থায়। শত্রুর ক্ষতি হয় কিছু। এরপরে আলোচনা করে ভুল-ত্রুটি ধরা হয় এবং ঠিক হয় যে, শক্ত ঘাঁটির ওপর এভাবে আক্রমণ করা ভুল হয়েছে এবং কোন ঘাঁটির উপর আক্রমণ করা হবে না। তবে দুর্বল ঘাঁটিকে আমাদের শক্তিতে কেন্দ্রীভূত করে আক্রমণ করে ধ্বংস করতে হবে, তার আগেই সমস্ত রকম তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। মুখোমুখি যুদ্ধে না গিয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা এবং তা জোরদার করা। শত্রু ঘাঁটিকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা, মুক্তিবাহিনীর একটি প্রধান অঞ্চলে আক্রমণ করার জন্য সমস্ত রকম তথ্য সংগ্রহ করা।

এই সময় সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই আঞ্চলিক কমান্ড হতে নেওয়া হয়। অনেক সময় বর্ধিত সভাও করা হয়। এটা ভুল চিন্তা ছিল। এই সময় সামরিক ও সরবরাহ বিভাগ এই দুটোই প্রধান। অন্যান্য কার্যকলাপ মূলত বন্ধ।

এই সময়ের কয়েকটা দিক লক্ষ্যণীয়। নতুন নেতৃত্ব দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এক অংশ তাল রেখে চলছে। অতি বাম ঝোঁকও দেখা দিল অর্থাৎ যুদ্ধ করেই সবকিছুর ফয়সালা করা। শক্ত ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারলেই দুর্বল ঘাঁটিগুলি সহজে ভেঙ্গে পড়বে। পুরানো নেতৃত্বের ওপর অবস্থাহেতু চক্রান্তমূলক ভাবের প্রকাশ দেখা দিল। রাজনীতি (মূলত) বর্জন, গেরিলা যুদ্ধ বর্জন, সেনাবাহিনীর মধ্যে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের অভাব, আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ, নিজেদের মধ্যে পরস্পরের খারাপ ব্যবহার, জনতার সাথে খারাপ ব্যবহার, সেনাবাহিনীর সমস্ত চাহিদা পূরণ না হওয়ার ফলেও নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি। এমনকি পলায়ন মনোভাব দেখা দিল, লড়াই যখন তীব্র হতে থাকে তখন সেনাদের মধ্য হতে অস্ত্রসহ একটা অংশ পালাতে শুরু করল। ঘটনার লেজুড়বৃত্তি প্রভৃতি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। আগাগোড়া বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, শত্রুর গতিবিধি ও তার শক্তি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আমলে না আনা। অতি বাম ঝোঁকের প্রকাশ হতেই এটা আসে।

এরই মধ্যে আমাদের প্রধান ঘাঁটির প্রধানরা এক চক্রান্তমূলকভাবে (গোপনে) দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হল (শক্ত ঘাঁটিকে আক্রমণ করা)। আক্রমণ করল সকালের দিকে, প্রায় সারাদিন যুদ্ধ হল। শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি হলেও আমাদের বাহিনীর প্রধানদের একজন শহীদ হন, ৬ জন শত্রুর হাতে ধরা পড়ে এবং শেষ হয়ে যায়। এটাই আমাদের উপর মারাত্মক আঘাত। সেনাবাহিনী ও জনতার মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা শুরু হল। এর মাঝে ব্যাপক হামলা হল মিলিটারীদের এবং আমাদের একটা স্কোয়াড ধরা পড়ল এবং তাদের মেরে

ফেলা হল। বিশৃংখলা দেখা দিল। এটা সামলে নিয়ে আমাদের বাহিনী কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা হল এবং পিছু হটার সিদ্ধান্ত হল তখন এক বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান।

জনগণ প্রায়ই গ্রাম ছাড়লো. রাতে পিছু হটার কাজ শুরু হল। শুধু বাহিনী নয়. জনগণ এমনকি মেয়েরাও কয়েকজন। মনোভাব লংমার্চ করে যাচ্ছি। সঙ্গে যা নেবার মত নেওয়া হল। লক্ষ্য হল অন্য অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার বাহিনীর সাথে মেশা. সম্ভব হলে অন্য জেলায় যাওয়া।

পিছু হটার নিয়ম কানুন কারোরই জানা নাই। শুধু এক এক পদক্ষেপ হচ্ছে আর নতুনকে জানা যাচ্ছে। সব মিলে ৫/৭ শত লোক হলো। কয়েক মাইল দূরে গিয়ে এক জায়গায় ওঠা গেল এবং রান্না শুরু হল. খেয়ে সন্ধ্যায় আবার যাত্রা হবে শুরু। ইতোমধ্যেই শত্রুপক্ষ হতে হামলা শুরু ঃ সারাদিন লড়াই হতে থাকল। সন্ধ্যাবেলায় একত্র হয়ে যাত্রা হবে শুরু তার জন্য বাহিনীকে প্রস্তুতও করা হচ্ছে। সত্যিই সে এক দৃশ্য! এমন সময় ব্যাপক হামলা শুরু হল শত্রু তরফ থেকে। রাত্রির অন্ধকারে যে যেদিকে পারল ছুটে গেল. বাহিনীও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল (আগেই সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে ছিল. সাংঘাতিক ক্লান্তি. খাওয়া ঘুম প্রায় নেই. শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ) একেবারে বিশৃঙ্খল অবস্থা. বাহিনীও একাংশ ঘটনাস্থলে থেকেই লড়াই করছে। অনেকে কোথায় গেল তার সন্ধান হল না। অস্ত্রসহ যেদিক সেদিক গেল। আবার ধীরে ধীরে ঐ রাত্রে অনেকের সাথে যোগাযোগ হল এবং একত্র হয়ে আবার যাত্রা শুরু হল (সে কি অবস্থা না দেখলে বোঝা যাবে না)। কয়েক মাইল দুরে গিয়ে এক জায়গায় ওঠা গেল (প্রায় সকলের অজানা জায়গা)। সকালেই রান্না শুরু হল. হাঁড়ি-পাতিলের অভাব. কয়েকজনে পাহারার ব্যবস্থা হল। দিন শেষ সন্ধ্যায় যাত্রা হবে। সমস্ত লোক দারুণভাবে. ক্লান্ত. ইতোমধ্যেই ১২ টা-১টার সময় বেপরোয়া হামলা এলো মিলিটারীর দ্বারা। বৃষ্টির মত চলছে দুপক্ষের গুলি. সরে যাওয়ার একটি মাত্র পথ। বন্যায় ডুবে গেছে সমস্ত দেশ. যে যেমন পারল সরে পড়লো। বাহিনীর একটা বিরাট অংশ মরিয়া লড়াই করে যাচ্ছে। জনতাও বাহিনীর বিরাট অংশসহ পথহারা পথিকের মত চলল। রাস্তার উপরে ওঠার পথ নাই (গুলির ভয়ে)। এমনিভাবে যে অঞ্চলে যাওয়া হল (সেটা মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে আমাদের হাত-ছাড়া অঞ্চল) মুক্তিবাহিনীর অঞ্চলে তাদের পক্ষ হতে ফাঁকা গুলি হচ্ছে ২-১টা। জেলা নেতৃত্বের একাংশ (২ জন) মুক্তিবাহিনীর নেতাদের সাথে যোগাযোগ করল. আশ্রয় ও আলোচনার জন্য প্রস্তাব দিল. তারাও সেই মত সাড়া দিল। আমাদের লোকদের নিয়ে গেল প্রায় একশত মত হবে। কিছু সেনা অস্ত্র সমর্পণ করলো তাদের কাছে। সকলকে নিয়ে গেল ক্যাম্পে এবং ভালমন্দ ব্যবহার ও ব্যবস্থা করলো এবং ২ দিন পরে জীবন ভিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিল। কর্মীরা জীবন বাঁচাবার দায়ে যেদিক সেদিক ছুটল এবং পথে-ঘাটে মুক্তিবাহিনী ও রাজাকারদের হাতে মারাও গেল অনেকে। কিছু ওপারে গেল. অঞ্চলে কিছু কিছু থাকলো এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে। জেলা নেতৃত্বের অপর অংশ ঠিক করল সেনা বাহিনীর বাছাই

অংশ নিয়ে গন্তব্যস্থলে যাবে এবং সেই রাত্রেই চলে গেল এবং নিরাপদে পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়েও যুদ্ধ, মুক্তিবাহিনী, রাজাকার ও মিলিটারীর সাথে। কোন দিকে সরার উপায় (ভিন্ন জেলার সাথে যোগাযোগ হল না) না দেখে, বাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিল কমান্ড এবং যেভাবে পারে ছিটকে পড়লো। অল্পদিনের মধ্যে যে বাহিনী তৈরী হয় তাকে একশত বার প্রশংসা করতে হবে, কি উদ্যম ও ত্যাগ তাদের। সত্যিকার গণবাহিনী না হলেও এভাবেই বাহিনী গড়ে ওঠে। সেই বাহিনীর জন্ম হয়েছে, যদিও ছিন্নভিন্ন অবস্থায় এখন। সুযোগ পেলেই সংগঠিত হবে অনেক শিক্ষা নিয়ে। যুদ্ধ করে যুদ্ধ শেখা, আমাদের কর্মী ও বাহিনীর কার্যকলাপে তাই প্রমাণ হয়েছে। মনে রাখতে হবে, সত্যিকার বাহিনী যেভাবে গড়ে ওঠে আমাদের মূলত সেভাবে গড়ে তোলা যায়নি, সত্যিকার সেনাও বাছাই করা যায়নি। কেউ কেউ মনে করছে যে, ভুল লাইন গ্রহণ করার ফলে সব শেষ, সব ধ্বংস। এই বন্ধুদের এই বক্তব্য আমাদের প্রতিটি বিপ্লবীর গভীরভাবে সমালোচনা আত্মসমালোচনার দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে হবে। তবে এটা ঠিক যে, আমাদের মারাত্মক ভুল-ত্রুটি ও ক্ষতি, ধ্বংস শেষ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তা পারবেও না। ঐ বন্ধুরা আওয়াজ তুলছে এক সাচ্চা পার্টি গড়ে তোলার। এটা খুব ভাল কথা; তাদের দৃষ্টিতে ঐ ডাক দিয়েছে। আমাদের অতীত ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সত্যিকার বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সাচ্চা পার্টি গড়ে তোলার প্রশ্ন নতুন নয়। পার্টি প্রতিটি পদক্ষেপের পরই আরও সাচ্চা পার্টি গড়ে তোলার প্রশ্ন থাকেই। সাচ্চা পার্টি গড়ে তোলার কথা যারা বলছে তারাও নির্ভুলভাবে কোন কিছু করে আসেনি অতীতে। কেউ পারেও না। কাজ যারা করে তারা ভুল করেই। তবে সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন পদক্ষেপ দিতে পারছে কিনা এটাই হল মোদ্দা কথা।

আবার কেউ কেউ মনে করছে যে, ক্ষয়-ক্ষতি তো হবেই, এটা স্বাভাবিক। ক্ষয়-ক্ষতি হবে এটা সম্পর্কে সচেতন থাকা খুবই ভাল কথা। কিন্তু এ বন্ধুরা ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে এত উদ্যমী হওয়ার কারণ তারা তাদের নিজেদের ভুল স্বীকার করতে চায় না, এবং সে ভুল থেকে শিক্ষাও নিতে চায় না।

ব্যাপক বন্ধুদের মনোভাব হল, ক্ষয়-ক্ষতি বেশী হয়েছে আমাদের ভুলের জন্য, লাইন আমাদের ঠিক ছিল। এই বন্ধুরা বাস্তবভাবে দেখার চেষ্টা করছে। এই বন্ধুরা ক্ষেত্র বিশেষ দুই একজনের দোষ বড় করে দেখছে।

পার্টির যে কোন পদক্ষেপের লাভ-লোকসান বিচার করতে হলে মূলত 'মুক্ত অঞ্চল বা ঘাঁটি গড়ে তোল' শ্লোগানটি বিরাট করতে হবে। মুক্ত অঞ্চল বা ঘাঁটি অঞ্চল' শ্লোগানটি যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে তার প্রয়োগ করতে গিয়ে কোথায় কিভাবে ভুল হয়েছে আর যার ফলে পার্টির ক্ষতি তুলনামূলকভাবে বেশী হয়েছে। আর যদি ঐ শ্লোগান (মুক্ত অঞ্চল বা ঘাঁটি অঞ্চল) ভুল হয়ে থাকে তবে সবই ভুল করেছিল, যদি কিছু লাভ হয়েছে ওটাও ধরার

মধ্যে পড়ে না। এটাকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে এবং ভুল ত্রুটিগুলি খুঁজে বের করতে হবে এবং তার থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন পদক্ষেপ দিতে হবে। মুক্ত অঞ্চল বা ঘাটি অঞ্চল কোন্ সময়, কিভাবে, কোথায় গড়ে তুলতে হয়, কি তার সংগঠনগত দিক, কি তার কায়দা-কৌশল। এ সম্পর্কে কোন ধ্যান-ধারণা ছিল না আগেই তার উল্লেখ করেছি। সবচে বড় দিক, কোন পরিকল্পনাও খাড়া করা যায়নি। এর ফলে পদক্ষেপ ভুল হওয়ার অবকাশ থেকে গেল সর্বক্ষেত্রে।

এটাও লক্ষ্যনীয় যে, মুক্ত অঞ্চল বা ঘাটি অঞ্চল গড়ে তোলার মত জনগণের ন্যূনতম রাজনৈতিক ও সামরিক চেতনা ছিল না বা দেয়া যায়নি। সংগঠনগত দিকও প্রায় অনুরূপ, প্রশ্ন আসে তবে কেন ঐ শ্লোগান দেয়া হল। কারণটা ওপরে উল্লেখ করেছি। মোট কথা, চীনবিরোধী ও বিপ্লববিরোধী সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশের দুই অংশে, সামন্ত মুৎসুদ্দিদের মধ্যে বিরোধের সুযোগ গ্রহণ : সম্প্রসারণবাদীদের সাহায্যে উগ্রজাতীয়তাবাদের 'জয় বাংলা' ও 'স্বাধীন বাংলার' বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি মাত্র পথ হল মুক্ত অঞ্চল বা ঘাটি অঞ্চল সৃষ্টি করে 'স্বাধীন বাংলা'র সাথে জনগণের পূর্ব বাংলার পার্থক্য জনগণের সামনে বাস্তব কাজের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। সে মুক্ত অঞ্চল বা ঘাটি অঞ্চল যদি ১৫/২০ দিন বা ২/১ মাস টিকিয়ে রাখা যায়, পরে তা ভেঙে গেলেও পরবর্তীকালে জনগণ ক্ষমতা দখলের স্বাদ উপলব্ধিতে ধরে রাখতে পারবে এবং আবার দ্রুত ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে অংশ নেবে।

তখন আরও সুবিধা ছিল,শত্রুরা মারামারিতে লিপ্ত। কোন প্রশাসন ব্যবস্থা না থাকা, গ্রাম্য শত্রু দুর্বল হয়ে পড়া, চীনের ভূমিকা প্রভৃতি দিকগুলি আমাদের পক্ষে ছিল। এই সকল দিকগুলি বিচার করে ঐ শ্লোগান দেয়া হয়। ভুলের অবকাশ কি তা দেখা যাক-আগেই বলেছি, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে পার্টির জনগণের মধ্যে (আলোচনার) প্রচারের একদিনও সুযোগ হয় না, (শুধু এই সিদ্ধান্ত নয় পার্টি যত সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য)। মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টির শ্লোগানকে খুবই সরলীকরণে দেখা, আমরাই মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করবো এই চিন্তার মধ্যে থাকে চে গুয়েভারার চিন্তা। শত্রু শক্তিকে মোটেই সামনে না (আনা) রাখা।

যখন ইপিআর হেরে গেল তখন আওয়ামী লীগ নেতারা ইন্দিরার কোলে স্থান নিল। প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ ব্যাপক শুরু হয়, আক্রমণ যত জোরদার হতে থাকল ততই মুক্ত অঞ্চল বা ঘাটি অঞ্চল সৃষ্টি দ্রুত করার চিন্তা মাথায় আসতে থাকে (অর্থাৎ তাড়াহুড়াবাদ)। মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টির বক্তব্য পার্টির ও জনগণের মধ্যে প্রচারের ও সংগঠনের একটা সময় লাগে এদিকে লক্ষ্য থাকল না (এ এক সুবিধাবাদী পথে পা বাড়ান হলো)। শত্রুর আক্রমণ যত জোরদার হতে থাকল, আমরাও তত জোরে অগ্রসর হলাম, বিপ্লবী কমিটি গড়ে তোলা,

কৃষকরাজ গঠন করা, সেনাবাহিনী গড়ে তোলার দিকে ভুল ত্রুটি দেখার অবকাশ থাকল না অবস্থার চাপে পড়ে। অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজগুলি হয়ে গেল গৌণ।

এ সকল দিকে নজর রাখা যায়নি। এভাবে প্রয়োগ পদ্ধতি মারাত্মক ভুল দিকে যেতে থাকে।

পার্টির মূল বক্তব্য হল ক্ষমতা দখলের রাজনীতি নিয়ে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের সাথে একাত্ম ও তাদের উপর নির্ভর করে জনগণের মধ্যে গোপনে রাজনীতি প্রচার, সচেতন ও সংগঠিত করে তোলা। শ্রেণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘৃণিত শ্রেণীশত্রু বাছাই করা এবং রাজনীতি সচেতন জঙ্গী ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের গেরিলা স্কোয়াড গঠন করে খতম অভিযান চালিয়ে যাওয়া। গোপনে বিপ্লবী পার্টি ও সেনাবাহিনী গড়ে তোলা, বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে শহরের দিকে অগ্রসর হওয়া, শেষে শহর দখল করা। এ লড়াই দীর্ঘস্থায়ী। গেরিলা যুদ্ধ ও জনযুদ্ধই একমাত্র পথ।প্রথম দিকে পার্টির ঐ বক্তব্য সঠিকভাবে প্রয়োগের চেষ্টা চলে, তার ফল ভাল ফলতে থাকে। কোন কোন অঞ্চলে ভুমিহীন গরীব কৃষকদের ও জনগণের মধ্যে সাড়াও জাগে এবং পার্টি গড়ে উঠতে থাকে।

প্রথম দিকে মূলত সঠিকভাবে শ্রেণী বিশ্লেষণ করে ঘৃণীত শ্রেণীশত্রু বাছাই, গেরিলা গঠন ও খতম শুরু হয় (টি. এল. অনুযায়ী), যাকে জনগণ এখনও মনে করছে যে পার্টি প্রথমে সঠিক পথ নিয়েছে,পরে ভুল পথে গেছে। ধীরে ধীরে শত্রু আক্রমণের চাপে গেরিলা যুদ্ধে পরিণত হল। শ্রেণী বিশ্লেষণের স্থলে গড়ে খতম শুরু হল। ক্ষমতা বদলের রাজনীতির ব্যাপক প্রচার বন্ধ হল, সীমাবদ্ধ জায়গায় শুধু মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টির শ্লোগান সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে থাকল । বিপ্লবী ফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নই মাথায় থাকলো না। কর্মী বাড়ছে-সংগঠিত করা যাচ্ছে না। পার্টি ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ অনেক বেশী বেড়ে গেল। সমস্ত ঘটনাগুলি বিদ্যুতের ন্যায় ঘটে চলছে, কার সাধ্য তালে তাল রাখা। এদিকে বর্ষা ঝড় লেগেই আছে। এ সকল ক্ষেত্রে জেলা নেতৃত্ব সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারেনি। এ হল একদিক। অন্য দিক হলো। আমাদের জেলায় ৮/৯ টা অঞ্চলে কাজ ভালই চলছিল, এর মধ্যে ৫/৬ টা অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় যুদ্ধও চলেছে। ভূমিহীন-গরীব কৃষক জনগণ কিভাবে যুদ্ধ করতে পারে, শত্রুর উপর যে চরম ঘৃণা, তার প্রকট রূপ দেখা গেছে কয়েকটা অঞ্চলে। পার্টির রাজনীতি গ্রহণ করাতে পারলে কিভাবে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়াই করতে পারে তার প্রমাণ দেখা গেছে কয়েকটা অঞ্চলে। গণবাহিনী যে মুলত কৃষকের বাহিনী তাও প্রমাণ করেছে যুদ্ধের মাধ্যমে, শত্রু যে কাগজে বাঘ তাও প্রমাণ হয়েছে। বাস্তবে পার্টি সংগঠন ও নেতৃত্ব সংগ্রামের মাধ্যমে পরিবর্তন রূপান্তরিত হয়ে নতুন পার্টি ও নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠে এবং বিপ্লবী পার্টিতে রূপান্তর হয় তাও প্রমাণ হয়েছে এই সময়ের মধ্যে। নিয়মিত বাহিনী গড়ে বাস্তব তাগিদে ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাও দেখা গেছে (এখানে বলে রাখা দরকার যে আমাদের যে

বাহিনী গড়ে ওঠে তার মধ্যে সঠিক নিয়মিত সেনা মাত্র একটা অংশ, অনেকে রাজাকারের ভয়ে, থাকা খাওয়ার জন্য, এবং নিজেদের সুবিধা হাসিলের জন্য এসেছিল। রাজনীতি প্রধান না হলে কোন কিছু দীর্ঘস্থায়ী করা যায় না। সামরিক দিক প্রধান হলে কিছু হয় না তাও প্রমাণ হয়েছে। সবচেয়ে বড় দিক হল এবার সংগ্রামের মূল দিক হলো একটা সেনাবাহিনী গঠনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেটা আমাদের পার্টির জীবনে প্রথম প্রধান দিক। যে পদক্ষেপ কোন দিন দেওয়া বা দেওয়ার চেষ্টা হয়নি এবং আমাদের সেনাবাহিনী গঠনের একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এই দৃষ্টি যাদের নেই তারা সবকিছুই ঘোলাটে দেখছে। এই সকল দিকগুলি মোটেই তুচ্ছ করার নয়। এটা ভবিষ্যত উজ্জ্বলের দিক।

পার্টির কিছু কিছু কর্মী হতাশাগ্রস্ত হয়েছে। তার প্রধান কারণ, যে সকল অঞ্চলে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছিল বা বিপ্লবী সরকার গঠিত হয় তাদের ধারণা ছিল এগুলি চিরস্থায়ী হবে, যখন ভেঙ্গে গেছে তখন হতাশ হয়ে পড়েছে, এটা অতি আশাবাদের ফল।

জেলা পার্টি বার বার আলোচনা করেছে, অঞ্চল করছে, অঞ্চল টিকিয়ে রাখা যাবে না, বার বার হাত বদলের পর স্থায়ী মুক্ত অঞ্চল হবে। জুলুম অত্যাচার সহ্য করতে হবে। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তার মধ্যে দিয়ে সুখী সমাজ গড়ে উঠবে। এ কথাগুলি বললেও পার্টি ও জনগণের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া যায়নি। এটা নেতৃত্বের দুর্বলতাও বটে। সবচেয়ে বড় গলতি, চীন সম্পর্কে কোন প্রচার করতে না পারা; আওয়ামী লীগ, সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রচার করতে না পারা, এটা রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবই বলতে হবে। এটাই নেতৃত্বের অক্ষমতা প্রমাণ করে।

রণকৌশলকে যেভাবে বুঝেছি তার দৃষ্টিতে বিভিন্ন ঘটনা ও পদক্ষেপ সম্পর্কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ বিচার ভাবনা মোটেই সম্পূর্ণ বা সঠিক বলে দাবী করি না। বহু ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে বা আছে। অনেক লক্ষণীয় ঘটনা বাদ যাওয়া স্বাভাবিক। ক্ষেত্র বিশেষ কম বেশী জোর পড়েছে, উল্টা পাল্টা বা ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে, আগেরটা পাছে এবং পাছেরটা আগে হয়েছে, দিন তারিখ দিতে পারিনি, নিজের দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরার মধ্যে গলতি স্বীকার করেও বিশেষ বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করলাম, যদি বন্ধুদের উপকারে আসে মনে করে। যারা এ সময় ময়দানে ছিল না, তাদের পক্ষে এটা ধরা বুঝা হবে কঠিন। এই সমস্ত বক্তব্যগুলি নিজের চিন্তা প্রসূত। এর ভুল ত্রুটিগুলি তুলে ধরলে উপকৃতই হবো।

গত রণকৌশলে ও কেন্দ্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে নিজের কয়েকটি কথা বলে রাখা দরকার মনে করছি। এই রণকৌশল প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সবদিনই দ্বিমত ছিল। আমার বক্তব্য

ছিল গোপন ও প্রকাশ্য কাজের সমন্বয় করে চলা (প্রধান হল গোপন)। যেমন গোপন এ্যাকশন, জনগণের যে কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে জনতার মধ্যে গোপন প্রচার ও সংগঠন করা ও এ্যাকশনের দিকে নিয়ে যাওয়া, জনগণের যে কোন বিক্ষোভকে বিপ্লবী রূপ দেয়া, তাদের মধ্যে গিয়ে, যে কোন ধরনের বিপ্লবী কাজকে ব্যবহার করা, যার মাধ্যমে ব্যাপকতার সাথে মেশা, রাজনীতি সচেতন ও সংগঠিত করা যায়। যতই প্রকাশ্য কাজের সুযোগ ব্যবহার করি না কেন, তার মধ্যে প্রধান লক্ষ্য হবে আমাদের গোপন সংগঠন গড়ে তোলা ও গোপনীয়তা বজায় রাখা, যাব কিছু উল্লেখ করছি ওপরে ক্ষেত্র বিশেষে।

জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ না করতে পারলে জনযুদ্ধে রূপান্তর করা যায় না শুধু গোপন কাজের দ্বারা। যেমন জনগণের বিভিন্ন পার্টির কাজ প্রথমে ভাল হয়েছে, শেষে খারাপ হয়েছে তার প্রধান দিক হল, গড়ে খতম, গড়ে ধান কাটা, মেয়ে ঘটিত ব্যাপার:গড়ে লোক দলে দেওয়া: যার ফলে পার্টির যে সুনাম ছিল তা নষ্ট হয়েছে- এটাই জনগণের কথা।

লেখাটা আগের তার মূল দিক ঠিক রেখে দু' একটা জায়গায় বদল হল। লেখার দৃষ্টিভঙ্গি আগের, বর্তমানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ঘটনা প্রবাহের ফলে। এটা বুঝেও পুরানো লেখা রাখলাম তখন কি কি চিন্তা ছিল সেটা বুঝার জন্য।

আবার আবেদন করছি , যে সকল ভুল ত্রুটি আছে সেগুলি তুলে ধরলে উপকৃত হবো। এটাও মনে রাখতে বলি সকল বন্ধুকে, নিজের লেখার মত জ্ঞান নিম্নতম ,মার্কসবাদী জ্ঞান নাই। তাই অনেক গড়বড় থাকা স্বাভাবিক।

আমাদের গত লড়াইয়ের যে সকল বন্ধু ও সমর্থক শহীদ হয়েছেন, তাদের আত্মত্যাগ,দৃঢ়তা সাহস ও একনিষ্ঠতা হতে শিক্ষা নিয়ে, তাদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না- এই প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি এবং সেই বীর সেনাদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশ্নে

খালেকুজ্জামান

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ১৯৬৮ সাল থেকে চট্টগ্রাম শিল্পাঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলাম। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড থানাধীন বাড়বকুন্ড শিল্প এলাকায় অবস্থিত কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে রাজনৈতিক দিক থেকে কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলাম। মস্কো-পিকিং মতাদর্শগত অবস্থানের ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়ার পর 'পিকিংপন্থী' হিসেবে পরিচিত অংশের সাথে যুক্ত হই। অর্থাৎ দেবেন সিকদার ও আবুল বাসারের নেতৃত্বে পরিচালিত পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলাম।

১৯৭০-এর শেষ দিকে ৬ দফা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশ্নে কমিউনিষ্ট পার্টির অবস্থানের সাথে সহমত পোষণ করতে না পারায় কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিকভাবে সমর্থন না করেও ৬ দফা, ১১ দফা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হই। ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ আমি ঢাকাতেই অবস্থান করছিলাম। ২৯ মার্চে কুমিল্লার সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে যাই। তখনও অস্ত্র ট্রেনিং-এর কোন ব্যবস্থা ভারত সরকার করেনি। যা হোক, পরে ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সশস্ত্র বাহিনীগুলো ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য, বিডিআর, পুলিশ ইত্যাদি কনভেনশনাল বাহিনীর সদস্যদের সম্মিলনে গঠিত বাহিনীকে বলা হতো এম.এফ (মুক্তিফৌজ); আওয়ামী লীগের অংগ সংগঠন, মূলত ছাত্রলীগ থেকে আগত ক্যাডার বাহিনী নিয়ে গঠিত গেরিলা বাহিনীর নাম দেয়া হয়েছিল বি.এল.এফ (বেঙ্গল লিবা..শন ফ্রন্ট); আর সর্বস্তরের অংশ থেকে আসা ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি মিলে যে গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছিল, তার নাম ছিল এফ.এফ. (ফ্রিডম ফাইটার)।

খালেকুজ্জামান : বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক

তাছাড়া সি.পি.বির ক্যাডার বাহিনীও এক ধরণের বিশেষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিল।

ট্রেনিং শেষে প্রথমে মেলাঘর ২নং সেক্টরে এবং পরে নির্ভরপুর সাব-সেক্টরে অবস্থান গ্রহণ করি। এখানে কুমিল্লা জেলার এফ.এফ. বাহিনীর প্রধান হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। পরে যোগাযোগ ও অন্যান্য সামরিক কলাকৌশলগত গুরুত্ব বিবেচনায় ১১টি থানার ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ইনডাকশন এবং যুদ্ধ পরিকল্পনাও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করি। প্রত্যেকটি থানায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বসম্মতির ভিত্তিতে থানা কমান্ডার নির্বাচিত ছিল। জেলাওয়ারী স্বতন্ত্র অবস্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত হওয়ার সময়কালেই ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে মুক্তিযুদ্ধ চলে যায়।

৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের বিপুল বিশাল অভিজ্ঞতা স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অনেক স্মৃতি মন থেকে হারিয়ে গেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে অস্ত্র জমা দিয়ে আবার অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্ত করার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ি। আজও আছি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ দেশের মানুষের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বপ্ন অর্থাৎ শোষণমুক্ত, ইহজাগতিক গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইকে জয়যুক্ত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে যাবো আশাকরি।

বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স
একটি পর্যালোচনা

আ ফ ম মাহবুবুল হক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স বা বিএলএফ-কে বাদ দিলে বা তার রাজনৈতিক, আদর্শিক, সামরিক ভূমিকাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে পুরো পর্যালোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। '৭১-এর নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে যারা বিএলএফ সংগঠনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা দীর্ঘদিন থেকে ধারাবাহিকভাবে গড়ে ওঠা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃস্থানীয় সংগঠন ও নিরলস আদর্শবাদী কর্মী হিসেবেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে আসছিলেন। বিএলএফ-এর প্রধান ৪ জন নেতা তথা সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ ষাটের দশক থেকেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিলেন। যে রাজনৈতিক সংগঠন ও ছাত্র সংগঠনে তাঁরা নেতৃত্ব প্রদান করেছেন সেই সংগঠন তথা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে কিছুটা উপলব্ধি না করলে বিএলএফ-কে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হবে না। ষাটের দশক থেকেই ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে দুটো ধারা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। একটি পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। আরেকটি ধারা '৬৪ সাল থেকেই পাকিস্তানী প্রায়-উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ধারা। পরে এ দুটো ধারা রব-সিরাজ গ্রুপ ও মাখন-সিদ্দিকী গ্রুপ নামে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে নিহিত ও পরিচিত ছিল। রব-সিরাজ গ্রুপের শ্লোগান ছিল- 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', ৬ ও ১১ দফা, না এক দফা - এক দফা, এক দয ', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' ইত্যাদি। আ সিদ্দিকী-মাখন গ্রুপের ছিলো 'বাঁশের লাঠি তৈরী করো, পাঁতি বিপ্লবী খতম করো ' ইত্যাদি বক্তব্যের

আ ফ ম মাহবুবুল হক ঃ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক

মাধ্যমে পাকিস্তানে বাঙালীরাজ প্রতিষ্ঠার শ্লোগান।

আপোসহীন স্বাধীনতার পক্ষের ধারায় যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা '৭০-এর নির্বাচনের সময় বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে 'জয় বাংলা' পত্রিকা নিয়ে ও স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য প্রদান করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিরাগভাজনও হন। ঐ সময়ে কয়েক মাসের জন্য আমাকেও সিরাজগঞ্জের প্রতিটি থানায় দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচন প্রার্থীদের সাথে বিতর্কও করতে হয়েছিল।

'৭১-এর ১ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক শাসক কর্তৃক জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত ঘোষণা, ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে তৎকালীন ডাকসু ভিপি আ স ম রব কর্তৃক স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবর রহমানের উপস্থিতিতে তৎকালীন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ কর্তৃক স্বাধীন বাংলা ছাত্র সমাজের পক্ষে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, ৭ মার্চের রেসকোর্সে শেখ মুজিবের ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', ২৫ মার্চ পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের নির্মম সামরিক হত্যাযজ্ঞের পর ২৭ মার্চ মেজর জিয়া কর্তৃক শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে 'স্বাধীনতার ঘোষণা' সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার আহ্বান ইত্যাদি বাংলাদেশের জনগণকে দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মওলানা ভাসানী ও সিরাজ সিকদারের অবদানও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রণিধানযোগ্য।

'৭১-এর ২৫ মার্চের পর ঢাকাসহ সারাদেশে পর্যায়ক্রমে পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে বাঙালীদের জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতার চেতনাকে যখন ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন বীর বাঙালী ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, সিপাহী জনতা যার যা শক্তি আছে তাই নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। '৭০ সালের আগষ্টে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের প্রস্তাবে আমরা যারা পক্ষে ছিলাম, তারা এই প্রতিরোধ যুদ্ধে দেশের ভিতরে ও বাইরে থেকে সর্বাত্মকভাবে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকা থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লাম। ঢাকা, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে দেয়া নির্ধারিত দায়িত্ব পালন শেষে আমরা যারা ঢাকার জিঞ্জিরায় ফিরে এলাম, আমাদেরকে বলা হলো নিজেদের দায়িত্বে কলকাতায় গিয়ে সামরিক ও অন্যান্য কাজে প্রশিক্ষণ নেয়ার লক্ষ্যে নেতাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য। ঢাকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের দিকে যাওয়ার পথে ফরিদপুরে সিরাজুল আলম খানের সাথে দেখা হওয়ার পর তিনিও একই কথা বললেন। দর্শনা দিয়ে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে ট্রেনে যখন উঠলাম, কলকাতাগামী ট্রেনের কামরায় এক ভদ্রলোক আমাদের বললেন- "কংগ্রেস ও ইন্দিরাজী পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের যেভাবে নির্মম উপায়ে দমন করছে, তারা আপনাদের 'জয় বাংলা'র সংগ্রামকে নিঃস্বার্থভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা

করবে, তা আশা করেন কিভাবে! সময়ই আপনাদের বলে দেবে ভারতের শাসক শ্রেণী আপনাদের সংগ্রামে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য কি।" ভারতের মাটিতে প্রথমেই এ অভিজ্ঞতা আমাদেরকে আরেকটু সজাগ ও সচেতন করার ক্ষেত্রে বাস্তব ভূমিকা পালন করলো। কলকাতায় গিয়ে নেতাদের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে আসা আওয়ামী নেতাদের মন্তব্য, বক্তব্য ও আর্তচিৎকার শুনে হতচকিত হয়ে গেলাম। তাদের অনেকের বক্তব্য ছিল- 'ছাত্রদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ানো ও পাকিস্তানী পতাকা পোড়ানোর কারণেই আজকে আমাদের কলকাতায় আসতে হলো।'

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার সংগ্রাম গড়ে তোলার 'নিউক্লিয়াস' নামে যে অংশটি পরিচিত ছিল, যাঁর প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক, এর সাথে শেখ ফজলুল হক মনি ও তোফায়েল আহমদকে যুক্ত করা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে তোলা ও শেখ মুজিবর রহমানের কাছে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে। বিএলএফ উপরোক্ত নেতাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে প্রচলিত স্বাধীনতা যুদ্ধের বাহিনী অর্থাৎ এফএফ-এর পাশাপাশি একটি দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে ব্যাপক জনগণকে রাজনৈতিক, আদর্শিক ও সাংগঠনিকভাবে যুক্ত ক'রে পরিপূর্ণ মুক্তিসংগ্রামে পরিণত করার লক্ষ্যে। দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তুতির মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট ও তার আওতায় রাজনৈতিক দলসমূহ, সিপাহী, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, জনতাকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে শরীক করার কাজটি না হওয়ায় আধাখেঁচড়া অবস্থায় এফএফ-এর মাধ্যমে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন, তাঁদেরকে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ও নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত করা ও ব্যাপক জনগণকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে রাজনৈতিক, নৈতিক, আদর্শিক ও সাংগঠনিকভাবে যুক্ত ক'রে, প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত ক'রে জনগণের মুক্তির সংগ্রামকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার লক্ষ্যেই প্রধানত পরিপূরক ও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যভিত্তিক সংগঠন হিসেবে বিএলএফ-কে গড়ে তোলা হয়। '৭০-এর নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে আওয়ামী লীগের বৃহৎ ভারী শিল্প জাতীয়করণসহ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি থাকলেও আওয়ামী লীগ শ্রেণীগত দার্শনিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সমাজতন্ত্রী, এমনকি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সংগঠনও ছিল না। বাঙালী উঠতি বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের স্বার্থ রক্ষাকারী সংগঠন হিসেবেই আওয়ামী লীগের উৎপত্তি ও বিকাশ। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন রব-সিরাজ গ্রুপ 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার ধারায় শ্রমিক-কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীটি তাঁদের কাছে স্বচ্ছ ছিল না। এঁরা বাস্তব সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় প্রথমে র‍্যাডিক্যাল পেটিবুর্জোয়া চিন্তাধারা ও পরবর্তীতে ধাপে ধাপে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী তথা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ধারায় পরিবর্তিত ও তৎপরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী চিন্তাভাবনা দ্বারা সাধারণ ভাবে প্রভাবিত হলেও দার্শনিক রাজনৈতিক আদর্শিক সাংস্কৃতিক

ও সাংগঠনিকতাকে সব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের চিন্তাধারা দ্বারা পরিচালিত হতে পারেনি। উপরোক্ত দুটো ধারার সংমিশ্রণে বিএলএফ গঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক-দার্শনিক ভিত্তি একক ও স্পষ্টভাবে কখনও বিবৃত ও বিধৃত হয়নি। বিএলএফ-এর প্রথম ব্যাচ হিসেবে আমাদের সামনে বক্তব্য তুলে ধরা হলো — '৬২-এর চীন-ভারত যুদ্ধের পর্যুদস্ত অবস্থা থেকে উন্নীত হয়ে ভারত এই অঞ্চলের সামরিক শক্তি হিসেবে আস্থাযোগ্য অবস্থায় এসে পুনরায় দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিরোধী পরাশক্তিদের মোকাবেলা ক'রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করা ও তাকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া তার জন্য অসুবিধাজনক নয়। আমরা যারা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছি, তাদেরকে যেমন পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে, তেমনি কমিউনিষ্টদেরকেও মোকাবিলা করতে হবে।'

আমরা কমিউনিষ্ট মতাদর্শে তখনও পুরোপুরি পরিচালিত না হলেও কমিউনিষ্ট বিরোধী তো নইই। এমতাবস্থায় মতাদর্শগতভাবে বিএলএফ-এর ভারতীয় প্রশিক্ষকদের ঘোষিত অবস্থান জেনে তার বিরোধিতা করতে না পারলেও আমরা নিজেরা দৃঢ়ভাবে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলাম যে, সামরিক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের মতাদর্শনুযায়ী আমাদের দেশে আমরাই তো কাজ করবো, সুতরাং ভবিষ্যতে আমাদের স্বার্থে এ সংগঠনকে আমরাই পরিচালনা করবো। প্রথম ব্যাচের ট্রেনিং সমাপ্তির পর বিএলএফ-এর ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণের প্রশাসনিক দায়িত্ব হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়াসহ আমাদের হাতে এলো। আমরা 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলাম বিধায় চতুর্দশ-পঞ্চদশ ব্যাচ পর্যন্ত যারা ভারতীয় প্রশিক্ষক ও আমাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলো; তারা মূলত আমাদের মতাদর্শ দ্বারাই প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়েছিল।

আমাদের তখন পাঠ্য ছিল চে' গুয়েভারা, নগুয়েন গিয়াপ, মাও সেতুঙ-এর গেরিলা যুদ্ধের ওপর লিখিত বক্তব্যসমূহ। এসব গেরিলা মিলিটারী ষ্ট্রাটেজিষ্টদের বক্তব্যও আমাদের মতাদর্শের কাজকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছে। বিএলএফ-এর যে প্রধান চারটি সেক্টর ছিল তা নিম্নরূপ-

১. কেন্দ্রীয় সেক্টর। এলাকাঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ। সেক্টর প্রধান ঃ আবদুর রাজ্জাক, উপ-প্রধান ঃ সৈয়দ মাহমুদ।
২. পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টর। এলাকা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, বৃহত্তর চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, নোয়াখালী ও ঢাকার কিছু অংশ। সেক্টর প্রধান ঃ শেখ ফজলুল হক মনি। উপ-প্রধান ঃ আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন।
৩. দক্ষিণাঞ্চলীয় সেক্টর। এলাকা ঃ বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী। সেক্টর প্রধান ঃ তোফায়েল আহমদ, উপ-প্রধান ঃ কাজী আরেফ আহমদ।

৪. উত্তরাঞ্চলীয় সেক্টর। এলাকার বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর বগুড়া পাবনাও রাজশাহী। সেক্টর প্রধান ঃ সিরাজুল আলম খান। উপ-প্রধান ঃ মনিরুল ইসলাম।

বিভিন্ন সেক্টরে নেতৃত্বের বিন্যাস ও পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার প্রভাবের বৃদ্ধিও প্রমাণ করে বিএলএফ নেতৃত্বের বাস্তব অবস্থানের কারণেই সংগঠনটির প্রধান অংশ বলতে গেলে প্রায় পুরো অংশই প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ব্যাচ প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর যখন দেশে ফিরে যেতো তখন তাদের সামনে যে বক্তব্য, লক্ষ্য ও শ্লোগান তুলে ধরা হতো তাও ছিল দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-জনতাকে একাত্ম ক'রে দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধ তথা জনযুদ্ধ সম্পর্কিত। তখন শ্লোগান ছিল 'মুজিববাদ'; যার ব্যাখ্যা ছিল এ রকম-"শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে শ্রমিকরাজ-কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠাই হবে 'মুজিববাদ'।" এই বক্তব্যে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকলেও তখনকার বাস্তবতায় এই বক্তব্য যুক্তিযুক্ত ছিল। আমরা যারা বিএলএফ ক্যাম্পের প্রশাসনিক-রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলাম তারা শারীরিক-সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রাজনৈতিক আলোচনার সুযোগ পেলেই অংশ নিতাম এবং আমাদের দেশের মুক্তিসংগ্রামীদের সর্বদিক থেকে তৈরী ক'রে দেশে পাঠিয়ে মুক্তিসংগ্রামকে পরিপূর্ণ রূপের দিকে নিয়ে যেতে নিরলসভাবে চেষ্টা চালাতাম। একবার নারায়ণগঞ্জ জেলার এক গ্রুপ রাজনৈতিক আলোচনা শুনে সারা রাত কেঁদেই অস্থির। তাদের বক্তব্য-আমরা তো যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে এসেছি, কিন্তু রাজনৈতিক-আদর্শিক যে আলোচনা শুনছি সমাজতন্ত্র ও গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে, তা বাস্তবায়িত হলে আমাদের শিল্প, কলকারখানা,ব্যবসা-বাণিজ্য, দুর্নীতি, চুরি, লুটপাট, এসবের কি হবে? এই গ্রুপ পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় শেখ কামালের প্রাইভেট বাহিনীতে যুক্ত হয়ে যেসব অপকর্ম করেছিল,তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আমাদের রাজনৈতিক-আদর্শিক বিষয়বস্তু এক পর্যায়ে ভারতীয় সামরিক প্রশিক্ষকদের গোচরীভূত হয়। আমাদের প্রশিক্ষকদের সবাইকে ডেকে নিয়ে এসেম্বলী হলে একত্রিত করা হলো। জিজ্ঞেস করা হলো, বিএলএফ-এর যোদ্ধাদের নাকি কমিউনিষ্ট বানানো হচ্ছে যা কেন্দ্রীয় ভারতীয় সরকারের নীতিবিরুদ্ধ। সেই যাত্রায় মাও সেতুঙ-এর একটি উদ্ধৃতি ও ওখানকার প্রশিক্ষকদের একটা উদ্ধৃতি বলে রক্ষা পেলাম। মাও সেতুঙ-এর উদ্ধৃতিটি ছিল ঃ বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধে অস্ত্র যুদ্ধ করে না, অস্ত্রের পিছনে যে মানুষটি ও মানুষের পেছনে আদর্শটি তাই যুদ্ধ করে; সুতরাং আদর্শ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কায়েম করতে হলে রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়া বিকল্প নেই। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি ছিল ঃ একজন কনভেনশনাল যোদ্ধা হবে রাফ, টাফ ও ফুল এবং একজন গেরিলা যোদ্ধা রাফ, টাফ ও ইন্টেলিজেন্ট অর্থাৎ জনগণের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হওয়ার লক্ষ্যে তাকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামে তৎকালীন ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের যারা

অংশগ্রহণ করেছিলেন,তাদের যে অংশটি বিএলএফ-এর মাধ্যমে তান্দুয়া ও হাফলঙে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তারাও সবদেশে সবসময়ে প্রতিটি সংগ্রামের মধ্যে প্রধানত যে দুটো ধারা থাকে, তার থেকে কোনক্রমেই আলাদা ছিলো না। একটি অংশ সুবিধাভোগী সুবিধাবাদী ও আপোসকামী। আরেকটি অংশ নিঃস্বার্থ, আদর্শবাদী ও আপোসহীন। ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে রাজনৈতিক-ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করা গেলেও প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ার আগেই ভারতের কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী এবং বাংলাদেশের উঠতি ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী গোষ্ঠীর পারস্পরিক স্বার্থে তার দফারফা হয়ে যায়। মাও একবার চীনের বিপ্লবী যোদ্ধাদের ক্ষমতা দখলের অস্থিরতা দেখে বলেছিলেন, দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী যুদ্ধ জনগণের সাথে একাত্মতার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী যোদ্ধাদের প্রকৃতই বিপ্লবী করে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামও একটা দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হলে বিএলএফসহ প্রকৃত যোদ্ধাদের সংগঠনসমূহ জনগণকে সাথে নিয়ে একাত্ম হতো, সকল শোষণ-শাসন থেকে বাঙালী জাতি ও মেহনতী জনগণকে মুক্ত করার ঐতিহাসিক কাজটির সূচনা ঘটাতো। বিএলএফ সেই মুক্তিসংগ্রামে অবগাহন করে প্রকৃত শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের জন্ম দিতো। কিন্তু আধাখেঁচড়া স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রাম আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে অপূর্ণ করে রাখলো। সুবিধাবাদী, সুবিধাভোগী, আপোসকামী বিএলএফ-এর যে ক্ষুদ্র অংশটি ক্ষমতায় ও ক্ষমতার বাইরে থেকে যে প্রতিক্রিয়াশীল লুটেরা ভূমিকা পালন করেছে, তা-ই 'বিএলএফ' নয়। বি এল এফ-এর প্রায় পুরো অংশটাই এখনো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম তথা বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পতাকাতলে জাসদ-বাসদ নামে সক্রিয়ভাবে লাগাতার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে চলছে। জনগণের বিজয় অবশ্যম্ভাবীভাবে জনগণই ছিনিয়ে আনবে। তৎকালীন বিএলএফ ও পরবর্তীতে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীরা ইতিহাস নির্দিষ্ট সত্য ও ন্যায়ের পথে মেহনতী জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের ভূমিকা রেখে যাবেন।

তিন দাগে ঘেরা বাংলাদেশ

হাসানুল হক ইনু

এই উপমহাদেশে হাজার বছরে বহু যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, কিন্তু '৭১-এর বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের মতো এতো ভয়াবহ যুদ্ধ আর কখনো হয়নি। আর সবার মতো আমিও ২৫ মার্চের রাত থেকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কপাল গুণে ধরা পড়িনি বা গুলি খেয়ে মরিনি। আসলে তখন সময়টা সে রকমই ছিল। জীবনের চেয়ে দেশটাই বড় ছিল। দেশ কি দেবে তা নয়, বরং দেশকে কে কতো বেশী দেবে সেটাই সবার চিন্তা ছিল। সে প্রতিযোগিতায় যাঁরা সবচাইতে সামনে ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন আমাদের বীর শহীদ ভাইবোনেরা। সব শহীদরা মুক্তির, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন; আর একটার পর একটা বিজয়ের পর ক্ষমতাসীন শাসকরা সব শহীদদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এ দেশের যা কিছু গর্বের, যা কিছু সুন্দর তা সব সংগ্রামের জন্য, তা সবই শহীদদের দানে। যা কিছু অসুন্দর, বেদনার, লজ্জার তা সবই ক্ষমতালোভী শাসক গোষ্ঠীর জন্য।

স্বাধীনতার পঁচিশ বছরের মাথায় এসে এটা সবাই স্বীকার করবেন যে, সব মুক্তিযোদ্ধারা, সব রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী-কর্মীরা একই কায়দায় চিন্তা করে না, একই কাতারে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সুরক্ষার কাজ করে না। এটাই আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা। মুক্তিযুদ্ধ এক বিশাল ঘটনা প্রবাহের ছবি। এদেশে এখন সব কিছুকেই দলীয়করণ করে ফেলা হয়েছে। ফলে কার কি ভূমিকা তার চিত্রায়ণ সঠিকভাবে হয় না।

মুক্তিযুদ্ধের নেতা-নেতৃত্ব ছিল, দর্শন ছিল, যোদ্ধা ও সমর্থক ছিল। যুদ্ধের শত্রু-মিত্রও ছিল। নেতা ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। তিনিই ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। কিন্তু এটাও ঠিক যে, সেই মুক্তিযুদ্ধ কেবলই মুজিব বা আওয়ামী লীগের ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর অর্থনৈতিক মুক্তি। সেটাই ছিল কোটি কোটি মানুষের আকাঙ্খা। একটি শোষণমুক্ত স্বাধীন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বুকে নিয়ে বাঙ্গালীরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল।

হাসানুল হক ইনু ঃ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ ছিল। দেশের ভেতরে, দেশের বাইরে। পক্ষে ছিল বাঙ্গালীরা, বিপক্ষে ছিল পাকিস্তানীরা; পক্ষে ছিল ভারত, বিপক্ষে ছিল আমেরিকা; পক্ষে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিপক্ষে ছিল চীন। যারা বিপক্ষে ছিলেন, তারা চরম ভুল করেছিলেন। তারা মানবতার, গণতন্ত্রের, স্বাধীনতার, বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে আজ আমরা দুই পক্ষ হয়ে গেছি। শাষক-শোষিত; শোষক-বঞ্চিত; স্বৈরাচারী-গণতন্ত্রী। আমরা মিটমাট করতে পারিনি। আমরা নিজেরা শাসন করা, সরকার বদল করা, অধিকার সুরক্ষার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা দুই পক্ষ ছিলাম। যুদ্ধের আদর্শের প্রশ্নে, স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার প্রশ্নে, যুদ্ধের কৌশলের প্রশ্নে, সশস্ত্রবাহিনীর গঠনপ্রণালী প্রশ্নে, মিত্রদের ভূমিকার প্রশ্নে, প্রবাসী সরকারের ভূমিকা প্রশ্নে; তথা জীবন, জাতি, দেশ, রাষ্ট্র, সরকার, অর্থনীতিসহ সব প্রশ্নেই দুই পক্ষ হয়ে গিয়েছিলাম। সেজন্য প্রবাসী সরকার মাথার ওপরে থাকলেও যুদ্ধের সশস্ত্র প্রস্তুতি এক কায়দায় হয়নি। জেনারেল ওসমানির নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার পাশাপাশি গেরিলা যুদ্ধ, জনযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল সামনে নিয়েও যুদ্ধের জন্য ভিন্ন প্রস্তুতি চলেছে।

জনযুদ্ধ ও স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' বা বিএলএফ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করে ভারতে দেরাদুনের অদূরে সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচু তান্দুয়াতে। প্রথম প্রশিক্ষণ শিবির শেষে শরীফ নুরুল আম্বিয়া, আ ফ ম মাহবুবুল হক, মাসুদ আহমদ রুমি ও আমাকে সহ মোট ৮ জনকে প্রশিক্ষক হিসেবে মনোনীত করা হয়। আমাকে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের ক্যাম্প-প্রধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এটা একটা বিরাট দায়িত্ব ছিল, কারণ ঐ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে দেশের সামনের কাতারের রাজনৈতিক কর্মী-নেতারা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে এসেছিলেন। পরে ধারাবাহিকভাবে আরো প্রশিক্ষক তৈরী করে নেয়া হয় এবং মোট ৫২ জন প্রশিক্ষক কাজ করেন। তান্দুয়া প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে প্রায় ১০ হাজার উন্নত মানের দক্ষ গেরিলা যোদ্ধা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন। আমাদের সংগ্রহ-পদ্ধতি এমন ছিল যে, বাংলাদেশের প্রায় সব থানায় তান্দুয়ার মুক্তিযোদ্ধারা আছেন।

বাঙ্গালীদের অধিকারের ধরন ধারণ কি হবে সে বিতর্ক অনেক দিনের। প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে বাঙ্গালীদের মধ্যে তিন পক্ষ ছিল। পাকিস্তান এবং ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী; পাকিস্তানী কাঠামোর অধীনে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে বাঙ্গালীদের মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী এবং নীতিগতভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ও বাঙ্গালী জাতীয়তার ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী। তৎকালীন রাজনৈতিক অঙ্গনে এই তিন পক্ষই উপস্থিত ছিল। এমন কি আওয়ামী লীগেও তিনপক্ষ কমবেশী ছিল। সুতরাং ছিল বিরোধ ও দোদুল্যমানতা। পাকিস্তানপন্থী, মধ্যপন্থী এবং স্বাধীন বাংলাপন্থীর টানাপোড়েন বহু

রাজনৈতিক প্রস্তাবনাকে অস্পষ্ট করেছিল, সংগ্রামের পরিকল্পনাকে দূর্বল করেছিল এবং স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। কিন্তু নির্মম পাকিস্তানীরা এমনই আক্রমণ চালিয়েছিল ২৫ মার্চের রাতে, যার ফলে বহু পাকিস্তানপন্থী ও মধ্যপন্থী বাধ্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এবং ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সবাইকে নিয়েই ৯ মাসের যুদ্ধ চলে, যুদ্ধের পরে সরকার গঠন থেকে শুরু করে দেশ শাসনের কাজও শুরু হয়। বাছাই করার সুযোগ আর হয়নি। থেকে যায় জীবন্ত এক আদর্শগত-সংগঠনগত সমস্যা। যুদ্ধের, সরকার গঠনের নেতৃত্ব দেয়ার পরও সেই আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার জন্য, পতাকার জন্য, জাতীয় সঙ্গীতের জন্য কোন আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে পারেনি। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এক পা এগিয়ে 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' গঠনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবনা গ্রহণ করে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনাকে স্পষ্ট রাখতে সাহায্য করে; ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসেই 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে এক দুঃসাহসের কাজ করে। এ জন্য ফাঁসি হয়ে যেতে পারতো। 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'-এর নির্দেশে প্রকাশ্যে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করার সিদ্ধান্ত হয় প্রথমে ১৯৭০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। ঐদিন ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। নামকরণ করা হয় 'ফেব্রুয়ারি বাহিনী'। এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেন নগর ছাত্রলীগ সভাপতি মফিজুর রহমান খান। আমি সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করি। ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনীর কুচকাওয়াজ আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ঐ কুচকাওয়াজে শেখ হাসিনাও অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৭০ সনের ৭ জুনকে কেন্দ্র করে আরো বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। ঠিক করা হলো, যেভাবেই হোক শেখ মুজিবকে কুচকাওয়াজে হাজির করতে হবে। নামকরণ করা হলো 'জয়বাংলা বাহিনী', দেশবাসীকে স্বাধীনতার দিকে উদ্বুদ্ধ করতে এই চিন্তা করা হয় যে, 'জয়বাংলা বাহিনী'র পতাকা এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে স্বাধীনতার স্বপ্ন ফুটে ওঠে।

'৭০-এর ৬ জুন সন্ধ্যায় জহুরুল হক হলের ১১৬নং কক্ষে ছাত্রলীগ নেতা আ স ম রব, শাহজাহান সিরাজ,কাজী আরেফ আহমদ ও মার্শাল মনিরুল ইসলাম এক আলোচনায় মিলিত হন পতাকা কি রকম হবে তা ঠিক করার জন্য। '৭১-এর শহীদ ছাত্রলীগ নেতা স্বপন কুমার চৌধুরী, জগন্নাথ কলেজ ছাত্রলীগ নেতা নজরুল, কুমিল্লার ছাত্রলীগ নেতা শিব নারায়ণ দাস এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতা ইউসুফ সালাউদ্দিনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন পাশের কামরায়। এ বৈঠকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমিও সবার সাথে ছিলাম। কাজী আরেফের প্রাথমিক প্রস্তাবনার ওপর ভিত্তি করে সবার সঙ্গে আলোচনার পর সবুজ জমিনে লাল সূর্যের মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র দিয়ে 'জয়বাংলা বাহিনী'র পতাকা তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়। শিব নারায়ণ দাস ভাল আঁকতে পারতেন। শিবু ও ইউসুফ

সালাউদ্দিনকে সাথে নিয়ে শেরে বাংলা হলে আমার ৪০১ নং কক্ষে চলে আসি এবং রাত প্রায় ১১ টার দিকে পতাকার পুরো নকশা তৈরী করি। সেলাই হবে কোথায়? বলাকা বিল্ডিং-এর তিন তলায় ছাত্রলীগ অফিসের পাশে ছিল নিউ পাক ফ্যাসন টেইলার্স। ম্যানেজার নাসিরুল্লাহ। টেইলার মাষ্টার আবদুল খালেক মোহাম্মদী নক্শা বুঝে নেন। আমরা তখন কেউই জানতাম না যে, ঘটনাচক্রে 'জয়বাংলা বাহিনী'র পতাকাই স্বাধীন বাংলা পতাকা হয়ে যাবে। তবে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের মধ্যে এরকম একটা পতাকা তৈরী করার যথেষ্ট বিপদ ছিল। ভোর হওয়ার কিছু আগে পতাকা নিয়ে ফিরে আসি।

শেখ মুজিবর রহমান রাজি হয়েছিলেন কুচকাওয়াজে আসতে। এটা একটা বিরাট বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত। তখন এই ধারণা হয় যে, আওয়ামী লীগের অবস্থান যাই হোক না কেন, দেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবের আশির্বাদ আছে।

পল্টন ময়দানের মসজিদের সামনে মঞ্চ করা হয়। '৭০-এর ৭ জুন সকাল ১০টায় জয়বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ শুরু হয় হাজার হাজার দর্শকের সামনে। আ স ম রব বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং আমি সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পাই। তিন সারিতে সাদা প্যান্ট ও জুতা পায়ে সামরিক কায়দায় মার্চপাষ্ট শুরু হয়। জয়বাংলা বাহিনীর গুটানো পতাকা হাতে সামনে রব এবং তার ১০ কদম পেছনে ছাত্রলীগের পতাকা হাতে আমি অবস্থান গ্রহণ করে পুরো বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে মঞ্চে দন্ডায়মান শেখ মুজিবর রহমানের সামনে নিয়ে এসে বাহিনীকে দাঁড় করাই। রব গুটানো পতাকা মুজিবের হাতে তুলে দেন। সবার চোখের সামনে উনি হাসি মুখে পতাকা মেলে ধরেন। অবাক বিস্ময়ে সবাই নতুন পতাকা দেখলো। গুঞ্জন উঠলো পতাকা নিয়ে। বাংলাদেশের বুকে এ ধরনের কোন কর্মসূচী আর কখনো হয়নি। ঝুঁকি নেয়া হয়েছে; টিকেও গেছে। আন্দোলনে আরেকটা নতুন মাত্রা যোগ হলো। কিভাবে জয়বাংলা বাহিনীর পতাকা স্বাধীন বাংলার পতাকা হয়ে গেল? নিরাপত্তার কারণে ৭ জুনের কুচকাওয়াজের পর পতাকাটি আমি নিয়ে আসি। আরো নিরাপদে রাখার জন্য আমার পাশের ৪০৪ নং কক্ষে আমাদের সহপাঠী খবিরউজ্জামানকে (বর্তমানে পরিচালক টিএন্ডটি) আম্বিয়া পতাকাটি বাক্সবন্দী করে রাখতে বলেন। সেভাবেই ছিল দীর্ঘদিন। '৭১-এর প্রথম দিকে নগর ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ জাহিদ হোসেন একটা কুচকাওয়াজের জন্য এই বিশেষ পতাকাটি বহু কাকুতি-মিনতি করে নিয়ে যান এবং তার মালিবাগের বাসায় মায়ের কাছে রেখে দেন। সেই কুচকাওয়াজ হয়নি। দিচ্ছি দেবো করে করে আর জাহিদ ফেরত দেননি। আমরা [illegible]য়ই তাকে বকাঝকা করতাম এবং সাবধানও করতাম, কিন্তু পতাকাটা আমার কাছে আর ফেরত আসেনি।

১ মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বিশাল ছাত্র-জনসভার আয়োজন করা হয়।

গাড়ী বারান্দার ছাদকে মঞ্চ বানিয়ে চার নেতা রব, শাহজাহান সিরাজ, নুরে আলম সিদ্দিকী ও আবদুল কুদ্দুস মাখন পরপর বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। আমি গাড়ী বারান্দার ঠিক নীচে অন্যদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কি মনে করে শেখ জাহিদ হোসেন সেই জয়বাংলা বাহিনীর পতাকা লম্বা এক বাঁশের মাথায় বেঁধে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মিছিল নিয়ে রোকেয়া হলের দিক থেকে ধীরে ধীরে বটতলার দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। তখন বক্তৃতা করছিলেন রব। উপস্থিত ছাত্র-জনতা এক সাথে বলে উঠলো, ঐ আসছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। রবের বক্তৃতা থেমে গেল। পতাকা হাজার হাজার মানুষের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। আমি কিন্তু খুব বিরক্ত হয়েছিলাম জাহিদের ওপর। কাছে আসলে বকাঝকাও করেছিলাম কান্ডজ্ঞান না থাকার জন্য। এভাবে জয়বাংলা বাহিনীর একমাত্র পতাকা জনসমক্ষে নিয়ে আসার জন্য রাগও করেছিলাম। জাহিদ বাঁশে বাঁধা পতাকা গাড়ি বারান্দার ছাদের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড় করানোর পর জনতার অবস্থা বুঝে রব পতাকা-বাঁধা বাঁশটা টেনে তুলে হাতে ধরে নাড়তে লাগলেন। বটতলার জনতা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো- বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। যে পতাকা স্বাধীন বাংলার পতাকা হয়ে গেল '৭১-এর ২ মার্চ, সে পতাকা সেদিন ঐ বটতলায় আনার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। আমারই ভুলের জন্য, অসর্তকতার জন্য, গাফলতি করে জাহিদের কাছ থেকে পতাকা যথাসময়ে উদ্ধার না করার জন্য এবং শেখ জাহিদ হোসেনের নিজ বুদ্ধিতে পতাকা নিয়ে আসার জন্য ঐ পতাকা স্বাধীন বাংলার পতাকা হয়ে গেল। ভুল যে ভালোর জন্যও হয়, তার প্রমাণ স্বাধীন বাংলার পতাকা। এ ভুলের জন্য আজো আমি গর্ববোধ করি। রব আর সেদিন বক্তৃতা শেষ করেননি। ঐ পতাকা নিয়ে মিছিল করতে শুরু করেন হাজার হাজার ছাত্র-জনগণ চলতে শুরু করে পতাকার পেছনে পেছনে। এই হলো পতাকা উত্তোলনের ইতিহাস।

সন্ধ্যার মধ্যে ঢাকায় বহু লোক ঐ পতাকা বানিয়ে ফেললেন। দেশ একটা নতুন পতাকা পেলো, সেই পতাকা হাতে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করলো। এই পতাকা বহু বিভ্রান্তি দূর করলো। দেশকে স্বাধীন করার জন্য এতো বড় একটা ঘটনা, কিন্তু তার জন্য আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ বা তৎকালীন অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত দল, কোন রাজনৈতিক বা ছাত্রনেতা, এমনকি যে রব পতাকা উঠালেন, তিনিও কোন আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেননি। সিদ্ধান্ত নিয়েছে কতিপয় তরুণ, যারা দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবনকে বাজী ধরেছিল।

বাংলার ঘরে ঘরে তো সবাই পতাকা চিনলো, কিন্তু বাংলাদেশের পতাকা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে তা বরণ করে নেয়ার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। সুযোগ সামনে ছিল। ২৩ মার্চ হচ্ছে পাকিস্তান দিবস। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চ, ১৯৭১-কে 'পতাকা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। পাকিস্তানের পতাকার বদলে সেদিন সকল প্রতিষ্ঠানে ও বাসভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়াতে হবে। পল্টনে এবং সারা দেশের সব মহলে

সামরিক কায়দায় জয়বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ ও আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচীও ঘোষণা করা হয়।

২৩ মার্চ ১৯৭১ সকাল ৮ টায় পল্টন ময়দানে রাইফেল হাতে চার প্লাটুন জয়বাংলা বাহিনীর সদস্য সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু এভিন্যুর ষ্টেডিয়ামে ঢোকার গেটের দিকে অভিবাদন মঞ্চ তৈরী করা হয়। সামনে পতাকা উত্তোলনের ফ্লাগষ্ট্যান্ড। কে পতাকা তুলবে? স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা কেউই সেদিন সে দায়িত্ব পাননি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে। বাংলাদেশের মাটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম প্রকাশ্যে সবার চোখের সামনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। হাজার হাজার দর্শকের সামনে এক হাতে পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে ধীরে ধীরে জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলি। সেদিন এ অনুষ্ঠান শেষে জয়বাংলা বাহিনী মার্চ করে ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবের বাসভবনে যায় এবং সেখানে পতাকা তুলে দেয়া হয়। সেদিন ঢাকার সব সরকারী ভবনে পতাকা তোলা হয়েছিল। কেবলমাত্র ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া কোথাও পাকিস্তানের পতাকা ছিল না। আপোসকামীদের, পাকিস্তানপন্থীদের সেদিন পরাজয় হয়েছিল, স্বাধীনতা কামীদের সেদিন জয় হয়েছিল।

স্বাধীনতার প্রশ্নে গোটা জাতি এক কাতারে দাঁড়ালেও মুক্তিযুদ্ধের আরো যে দুটি লক্ষ্য- গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রশ্নে গোটা জাতি দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনি। তাই হয়ে যায় দুই পক্ষ। এজন্যই শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের পাশাপাশি গড়ে ওঠে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।' পল্টনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে সুরে কথা বলতো, ছাত্রদের বটতলা ঠিক সেই সুরে সেই ভাষায় কথা বলতো না। স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে সামনে তুলে আনার বিষয়ে বটতলা সেখানে ছিল স্পষ্ট, স্বচ্ছ, আপোসহীন, পল্টন সেখানে দোদুল্যমান ও ক্ষেত্র বিশেষে আপোসকামী। এজন্যই পল্টনে নয়, স্বাধীনতার পতাকা প্রথমে ওড়ে ছাত্রদের বটতলায়। শ্রমিক-গরীবদের বলিষ্ঠ নিজস্ব রাজনৈতিক মঞ্চের অনুপস্থিতিতে সেদিন ঠিক সেই মুহূর্তগুলোতে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' অনেকাংশে খেটে খাওয়া মানুষগুলোর আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতো, সমাজতন্ত্রের জন্য উচ্চকণ্ঠ হতো এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়তো। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে হারিয়েছি আমরা কয়েক লাখ মানুষ, বেশ কিছু মা-বোনের ইজ্জত। কিন্তু পেয়েছি একটা স্বাধীন দেশ। তবে যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবে পাইনি। দুর্ভাগ্য, জাতি পেলো এমন এক বাংলাদেশ যার সদরে আছে ঝলমলে গুলশান, ধানমন্ডি, বনানী; আর অন্দরমহল তার উবু হয়ে পড়া কুঁড়েঘর ও পঁচা ডোবায় ভরা। অবস্থা দেখে এদেশের মানুষ তাই হাসতে ভুলে গেছে, কিন্তু ঐ যারা সদরের বাসিন্দা,তারা হাসে সব সময়। হাসবে না কেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা তো কেবল উপরেই উঠেছে। কোন কিছুকেই তারা পরোয়া করে না। তাদের ঘরের বৌ-ঝিরা হাজার কয়েক টাকার শাড়ী পড়ে নির্লজ্জের মতো হেঁটে যায় ন্যাংটা মানুষগুলোর পাশ দিয়ে। কাজের

মেয়েটাকে লাথি দিয়ে মেরে ফেললে তাদের অপরাধ হয় না। কুকুরের জন্য প্রতিদিন তাদের কয়েকশ টাকা খরচ করতে বাধে না। টুপি মাথায় দিয়ে পিপে পিপে মদ গিললেও তাদের ধর্ম যায় না। সবকিছু করার অধিকার তাদের আছে, এমনকি মানুষ খুন করার স্বাধীনতাও।

এতোকিছু করার অধিকার তাদের কেউ দেয়নি, তারা তা আদায় করে নিয়েছে টাকার জোরে, অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে, স্বৈরাচারী হয়ে, ধর্মকে বিক্রি করে। এইসব গণবিরোধী মানুষের শত্রুরা বাংলাদেশের সদর দখল করে বসেছে, আর লক্ষ-কোটি মানুষের জায়গা হয়েছে পঁচা ডোবার ধারে। সদর আর অন্দরের এই জঘন্য বৈপরীত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজকের বাংলাদেশ। তাই চিন্তার বাসনার পার্থক্য আজ সারা দেশ জুড়ে। বাংলাদেশের সদরে আজ যতোই আলোর বন্যা বয়ে থাক না কেন, সে আলোতে স্বনির্ভরতার. শোষণ মুক্তির, গণতন্ত্রের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না; সে আলোতে বাংলাদেশের চলার পথ স্পষ্ট হয়ে উঠবে না, দূর হবে না পঁচা ডোবার কালো আঁধার। গরীবের ঘরগুলোতে ঠিকই বিদ্রোহের হারিকেন জ্বলবে। বাঙ্গালীর বুকে তাই আজ বাঙ্গালী গুলি চালাচ্ছে। সে জন্যই আজকের বাংলাদেশে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধ। হিন্দু - মুসলমানের যুদ্ধ নয়। দলের সাথে দলের যুদ্ধ নয়। আওয়ামী লীগের সঙ্গে মুসলিম লীগের যুদ্ধ নয়। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ নয়। '৭১- এ বাঙ্গালীর বিজয় হলো, সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানী সামরিক জান্তার পরাজয় হলো, কবর হলো দ্বিজাতি তত্ত্বের। স্বৈরতন্ত্রের ওপর গণতন্ত্রের বিজয় হলো। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওপর তৃতীয় বিশ্বের বিজয় হলো।

এদেশের মানুষ তিন তিনটা বড় মাপের রেখা টেনেছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ভাষার জন্য লড়েছে ' ৫২ সালে; স্বাধীনতার জন্য '৭১ সালে এবং গণতন্ত্রের জন্য লড়েছে '৯০-এ। তিন তিনবার বিজয় ছিনিয়ে এনেছে সংগ্রামী মানুষগুলো। বাংলাদেশকে আমরা গড়তে পারিনি '৫২, '৭১, '৯০ এই তিন দাগে ঘেরা বাংলাদেশকে আমরা গড়তে পারিনি '৫২, '৭১, '৯০- এর স্বপ্ন দিয়ে, বিজয় দিয়েও। শাসকদের ভুলের জন্য, ব্যর্থতার জন্য, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ও ক্ষমতালোভের জন্য আমরা আমাদের বিজয় ধরে রাখতে পারছি না। এদেশের মানুষগুলো বিজয় আনতে পারে, কিন্তু ধরে রাখতে জানে না; সরকার উৎখাত করতে পারে, কিন্তু দেশ চালাতে পারে না; ক্ষমতায় বসতে জানে, কিন্তু ক্ষমতা ত্যাগ করতে জানে না।

ব্যবধান পঁচিশ বছরের, '৭১ থেকে '৯৬। আমরা এগুতে পারিনি। গদি রক্ষার জন্য, গদি দখলের জন্য এদেশে জঘন্য আপোস করা হয়েছে। কেবলই ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য এদেশে আপোস করা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে, রাজাকারদের সঙ্গে, '৭১-এর ঘাতকদের সঙ্গে, অবৈধ দখলদার ও সামরিক শাসনের সঙ্গে, কালো টাকার সঙ্গে, খুনীদের সঙ্গে.

কালো আইনের সঙ্গে, আমলা শাসনের সঙ্গে এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। আপোসরফার রাজনীতি পঁচিশ বছর ধরে তিন দাগে ঘেরা বাংলাদেশের মর্মবস্তুকে প্রায় ধূলিসাৎ করে ফেলেছে।

এই আত্মঘাতী আপোস দেশকে স্থিতি দিতে পারেনি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি দেয়নি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেনি, অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়তে পারেনি, পারেনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সুরক্ষা করতে।

দেশবাসী দেখেছে নির্বাচিত- অনির্বাচিত সরকার, সামরিক- বেসামরিক সরকার, অবৈধ ও বৈধ শাসন। দেখেছে মার্কা দেখে ঢেলে ভোট দেয়ার ঘটনা। দেখেছে এক ব্যক্তির শাসন, দলের শাসন। দেখেছে কিভাবে নির্বাচিত সরকার জবাবদিহি করে না, কিভাবে চোখের সামনে স্বৈরাচারী হয়ে যায়। তিন দাগে ঘেরা বাংলাদেশে আজ তাই গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বন্দী সন্ত্রাসীদের বন্দুকের নলের মধ্যে, কালো আইনের বেড়াজালে, কালো টাকার থলির মধ্যে, আমলা শাসনে, '৭১-এর ঘাতকদের রক্তমাখা মুঠির মধ্যে ও ক্ষমতাসীনদের দুঃশাসনে। যে তিন দাগের ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ, সে দাগকে আর চেনা যায় না। সব মূল্যবোধগুলো ধ্বসে যাচ্ছে। এটা তো চলতে দেয়া যায় না। কোন একটা জায়গা থেকে আবার শুরু করতে হবে। দরকার নতুন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

তিন দাগে ঘেরা বাংলাদেশকে আবার সঠিকভাবে দাঁড় করাতে হলে দরকার জাতীয় ঐকমত্যের। ভোট চুরি বন্ধের জন্য, ক্ষমতা দখলের জন্য, সরকার উৎখাতের জন্য, আন্দোলনের জন্য জাতীয় ঐকমত্য হয়। তাহলে নির্বাচিত সরকার যাতে আর কোন দিন ক্ষমতাকে ব্যবহার ক'রে লুট, খুন, দলবাজী, দলীয়করণ, বিচার বিভাগ ও প্রচারমাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপ, ধর্মকে ব্যবহার করার লাইসেন্স না পায় তার জন্যও তো জাতীয় ঐকমত্য দরকার। নির্বাচনে ক্ষমতা বদলের জন্য যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার, তেমনি এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, হত্যা- খুনের প্রক্রিয়া বন্ধ, ধর্ম ব্যবসা বন্ধসহ মৌলিক কিছু বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য দরকার। সেজন্য ক্ষমতা বদলের সংগ্রামে কালো আইন বাতিল, বিচার বিভাগ ও প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা, আমলা কর্তৃত্বের বদলে নির্বাচিতদের শাসন, মুক্তিযুদ্ধ, তার নেতা - নেতৃত্ব, দর্শন, '৭১-এর ঘাতক ও ঋণ খেলাপীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা, স্থানীয় সংস্থাগুলোকে আমলা কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত ক'রে স্বশাসন কায়েম, সরকারের জবাবদিহিতা, বিশ্বব্যাংক-দাতা গোষ্ঠীর অন্যায় প্রস্তাব বাতিল, শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার ও তাদের ন্যূনতম মজুরী প্রথা, ফসলের ন্যায্য দাম ও কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, শিশুদের বিনা বেতনে একই কায়দায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, নারীর অধিকার - এ সকল বিষয়ে একটা ঐকমত্য হওয়া দরকার। এ সকল বিষয়ে পক্ষ-বিপক্ষ থাকতে পারে না। সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ থাকতে পারে না। সবারই এক পক্ষে থাকা দরকার। যারা এ সকল বিষয়ে ঐকমত হয় না, তারা গণতন্ত্র - মানবাধিকার-

স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। তারা স্বৈরাচার- রাজাকার - লুটেরা হতে বাধ্য। তারা ধর্ম ব্যবহার করতে চায়, লুট–খুন করতে চায়, দলীয়করণ করতে চায়, তারা আমলাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অত্যাচার– দুর্নীতি করতে চায়, তারা জবাবদিহি করতে চায় না। তারা মানুষের, গণতন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষ নয়। তারা ক্ষমতা, কালো টাকা, বিদেশের ষড়যন্ত্র, স্বৈরাচারের পক্ষ। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ক'রে তা বাস্তবায়ন করতে হলে এক ব্যক্তি বা এক দলের হাতে দেশ পরিচালনার ভার ছেড়ে দেয়া যায় না। দরকার জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে শাসন পদ্ধতি গড়ে তোলা। দরকার জাতীয় ঐকমত্যের সরকার; অন্তত ৫ থেকে ১০ বছরের জন্য। '৫২, '৭১, '৯০-এর সংগ্রাম-বিজয়ে ঘেরা বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে, বন্দী গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুক্ত করতে হলে দরকার জাতীয় ঐকমত্যের সরকার, জাতীয় ঐকমত্যের শাসন পদ্ধতি।

তিন দাগে ঘেরা বাংলাদেশে সবচাইতে সাড়া - জাগানো ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র, ক্ষমতা দখল, স্বাধীনতার, সুরক্ষা হতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পর্কে আর দর কষাকষি নয়, আর দলবাজী নয়। এবার দরকার জাতীয় ঐকমত্য মুক্তিযুদ্ধ ও তার চেতনা সম্পর্কে। মনে রাখতে হবে–

মুক্তিযুদ্ধ, কেবলই কোন এক মেজরের বেতার ভাষণ নয়, কোন এক বিদ্রোহী সৈনিকের পিস্তলের আওয়াজ নয়, কেবলই কোন এক নামী কবির কল্পনাবিলাস নয়। মুক্তিযুদ্ধ, কেবলই ছাত্রদের মাথায় বাঁধা লাল ফিতাও নয়, এমনকি কোন এক ছাত্রনেতার ওড়ানো পতাকাও নয়, কারো প্রধানমন্ত্রী না হতে পারার যাতনাও নয়, কোন এক বাঙ্গালী কর্ণেলের পাঁকানো সাদা গোঁফও নয়। মুক্তিযুদ্ধ, কখনই পাকিস্তানী নির্যাতনের জবাব নয়, ভাল মুসলমান না হতে পারার খেসারত নয়, ভাল হিন্দু হওয়ার স্বপ্নও নয়, কারো প্রতিহিংসার ফসলও নয়, কেবলই ভারতের কোলে দোল খাওয়া তুলতুলে শিশুও নয়, কোন এক নারীর কপালের লাল টিপ নয়, কোন এক নেতার বুকে আঁটা গোলাপ ফুল নয়।

মুক্তিযুদ্ধের এই নির্বাচিত চেতনাকে তিন দাগে ঘেরা বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আসুন আমরা যে মতের যে দলের হই না কেন, ঐক্যবদ্ধভাবে রাজাকারকে রাজাকার, স্বৈরাচারকে স্বৈরাচার ও খুনীকে খুনী বলার সৎ সাহস অর্জন করি। দরকার আজ আবার নতুন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের।

নির্ঘন্ট

ই

উ

ভ

ম

হ